শিকার ও শিকারী

শিকার ও শিকারী

[শিকার কাহিনী]

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

কলিকাতা

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩৩২

মূল্য দুই টাকা

ভূমিকা।

"শিকার ও শিকারী"র ভূমিকা লিখিবার ভার আমার উপর পড়েছে, কেননা আমি লেখকের বন্ধু এবং শিকারী। বন্ধুত্ব সূত্রে তাঁর সহবাসে গৃহে পল্লীতে নগরে আর শিকার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে মিলে জঙ্গলে পাহাড়ে মাঠে ঘাটে পথে অনেকদিন কাটিয়েছি। বলা বাহুল্য সে সব দিন আমার সুখেই গিয়েছে। সে সুখ শুধু ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের ছিল; তারি স্মৃতির আনন্দ তিনি আজ সর্ব্ব-সাধারণে বিতরণ করছেন, পাঠকগণ প্রীত ও তৃপ্ত হবেন এই আশা।

বাল্যাবধি আমার অনেক কাল স্কুল কলেজে, পরে জীবিকা অর্জ্জন-চেষ্টায় ব্যয় করতে হয়েছে; কাজেই মৃগয়া ক্ষেত্রে তিনি কতকগুলি যে বিশেষ সুযোগ লাভ করেছেন, আমার ভাগ্যে তা ঘটেনি। খেদায় হাতী ধরা যেমন বিপজ্জনক তেমনি আনন্দকর ব্যাপার। তিনি এ কাজ করেছেন। কেননা যথার্থ মৃগয়ানুরক্ত মানুষ বিপদকে ডরায় না বরং তার সঙ্গে লড়ে, আর তাকে হারিয়ে দিয়ে বিজয়ীর গৌরব অনুভব করে আনন্দ পায়। এ সব সময়ে আমি তাঁর সঙ্গী হতে পারি নি; কিন্তু তাঁর কাছ হতে এ সকল ঘটনার যে সব সরস ও কৌতুকবহুল বর্ণনা শুনেছি, তাতে কৌতূহল তৃপ্তি ও প্রীতি দুই সঞ্চয় হয়েছে।

হাওদা শিকারে শ্বাপদ জন্তু ও মহিষ গয়াল প্রভৃতির স্বভাব অভ্যাস, গতিবিধির সব সংবাদ রাখা, সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা তেমন সম্ভবপর নয়; কিন্তু বন্ধুবরের বিশেষত্ব এই যে, তিনি সে বিষয়েও কৃতিত্ব লাভ করেছেন।

মৃগয়া কিম্বা শিকার ব্যাধ-বৃত্তি নয়—পশুহত্যাই তার চরম কথা মনে করলে ভুল হবে। এই যে মধুগন্ধী বনে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটাতে হয়, তাতে পশু চরিত্রের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আমরা যেমন জ্ঞানবান হয়ে উঠি, তেমনি প্রকৃতিরাজ্ঞীর কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করবার সুবিধাও পাই। দেখি ওষধি, তৃণ, তরুলতা, ফুলফল পল্লব কিশলয়, কীট, পতঙ্গ, হিংস্র ও নিরীহ জীব জন্তু সকলেই তিলমাত্র ব্যতিক্রম না করে আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করছে, কেবল আমরা মানুষেরাই এ বিষয়ে অমনো-যোগী। ত্রুটির দুর্ভোগ কাজে কাজে আমাদেরই অধিক ঘটে। প্রকৃতি আমাদের মা, তিনি আমাদের ভরণ পোষণ করেন; তাই বলে তিনি কাউকে নন্দদুলাল করে তুলবার পক্ষপাতী নন।

আজকালের মত আমরা যখন অত্যধিক সভ্য হয়ে উঠিনি, সরল ও সহজ ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করতাম, তখন প্রয়োজন মত সকলকেই

কৃষক, ব্যাধ ও মৎসজীবীর কাজ করতে হতো—জীবন রক্ষা ও ক্ষুধা নিবারণের জন্যে। সাধারণের আর্থিক অবস্থার সাম্য ছিল, ধনী দরিদ্রের মধ্যে বিষম ব্যবধান ছিল না। একবার বিলাস উপকরণ যোগাতে কিম্বা বিপুল ধনাগমের সহায়তা করতে দশের প্রাণপাত করতে হত না। নিজ আবশ্যক মত প্রতিজনকেই পরিশ্রম করতে হ'ত। সেদিন গেছে—শিকার এখন ঐশ্বর্য্যবানেরি অধিকার, দরিদ্র এ সুখ-বঞ্চিত কিম্বা অপরের ভোজন-বিলাস সাধন করবার জন্যে সে পশুহত্যাজীবী।

লেখকের এই রোজনামচা ব্যাধের আত্মকাহিনী নয়, এ তাঁর স্বভাব-সৌন্দর্য্যমুগ্ধ হৃদয়ের আত্মপ্রকাশ, পাঠ করিলে শুধু শিকার কাহিনী নয়—তাঁর অন্তরের ইতিহাসও অজ্ঞাত থাকে না। এতে অনেক গল্পগুজব আছে যা হতে লেখকের সরসচিত্তবৃত্তির পরিচয় পাই; শিকার-কথা রূপকথার মতই মন ভুলায়।

আমাদের দলের অনেকেই আর নাই, তাই অবশিষ্ট কজনের বন্ধুত্ব আরো প্রগাঢ় সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বন্ধুর প্রতি পক্ষপাতীত্ব স্বাভাবিক, তবু সমালোচক রূপে আমি নিরপেক্ষ ভাবেই বল্‌তে পারি এ রচনা সকলেরি প্রীতিকর হবে।

প্রথম যেদিন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই, সেই স্থান কাল এখনও আমার মনে সুস্পষ্ট ছবির মত আঁকা রয়েছে। সেবার গারো পর্ব্বতের অধিত্যকা ভূমিতে শিকার ক্যাম্প পড়েছিল, সন্ধ্যা অতিক্রম হয়ে গিয়েছে আকাশে সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটা বিলীন হয়ে অন্ধকারের ঘন নীলিমার উপর অসংখ্য তারকা হীরকের মত উজ্জ্বল, অধিত্যকা প্রান্তর পর্ব্বতমালার ধূসর ছায়ায় অদৃশ্য, সেখানে এক শিবির হ'তে অন্য শিবিরে যাতায়াতে হস্তবাহিত চলন্ত আলোকের স্বর্ণদীপ্তি, চারিদিকে বিপুলকায় শিকারী হাতীর সুগম্ভীর গর্জ্জন ও শুণ্ড আস্ফালন শব্দ, হিংস্র জন্তুকে দূরে রাখ্‌বার জন্য মাঠের উপর মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড ধূনির আগুনের কোথাও বা জমাট আলো কোথাও বা চঞ্চল শিখা সাপের ফণার মত দোদুল, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহন করে যে বহু সংখ্যক গোশকট এসেছিল সমস্ত ক্যাম্পের চারিদিক ঘিরে তারি প্রাচীর, সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরকে মৃগয়া কেন যুদ্ধ ক্ষেত্রের মতই মনে হচ্ছিল। ইতি

শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী।

শিকারী--

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

শিকার ও শিকারী

কৈফিয়ৎ

সকলকেই সব কাযে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয় ; অন্ততঃ দেওয়া উচিত। সেই হিসাবে আমারও কৈফিয়ৎ এই—

আমার ছেলেবেলা হইতেই খুব শিকারের সখ। সেই সখের বহ্নি জীবনের এই মধ্যাহ্ন-শেষেও সমভাবে জ্বলিতেছে। ইহাকে কোন দিন নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করি নাই; বরাবরই ইন্ধন যোগাইয়া সমভাবে প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছি।

আজকাল সহরে, বন্দরে, হাটে বাজারে, এমন কি সুদূর পল্লীগ্রামের মাঠেও যেরূপ ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতির চর্চ্চা দেখিতে পাই, তাহাতে দেশের মধ্যে যে একটা জীবন্ত ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্কুল কলেজ এমন কি ইউনিভারসিটির কর্ত্তৃপক্ষেরা পর্য্যন্ত ইহার জন্য বিশেষ বিধান করিতে ক্ষান্ত হন নাই। এই শ্রেণীর খেলা (Sport) সর্ব্বসাধারণের পক্ষে প্রযোজ্য। এই সকল উদ্দীপক আনন্দদায়ক বীরোচিত খেলা মনুষ্যের কর্ম্মক্লিষ্ট জীবনের অবসর সময়ে যেমন শান্তি দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তেমনই জীবনীশক্তি ও মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি করে। এইগুলি যেমন

খেলা, শিকারও তেমনই খেলা। যত রকমের খেলা আছে, আমার বিশ্বাস শিকার সকলের রাজা। শিকার করিবার সুবিধাও সকলের সহজলভ্য নহে।

পশু হননই যদি শিকার হয়, তবে কসাইরা বা মিউনিসিপালিটির ডোমেরা বড় শিকারী। শিকারী হওয়া একটা শিক্ষা। এ শিক্ষা বিনা সাধনায় হয় না। ইহার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয়ও করিতে হয়। শুধু তাস পাশা খেলিয়া অবসর সময়ে দুই চারিটা চাঁদমারী করিলেই শিকারী হওয়া যায় না। ইহার জন্য অধ্যবসায়ের সহিত বিশেষ পরিশ্রম ও সাধনা করিতে হয়।

আমাদের দেশে দুই চারিজন বড়লোক আছেন, যাঁহারা যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া সময় সময় শিকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা কেবল নামের জন্য। প্রকৃত শিকারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের আছে কি না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বড় মানুষের একটা যোগ্যতা থাকা উচিত, সেই নাম জাহির করার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা শিকার করিয়া থাকেন।

আমার ছেলেবেলা হইতে অন্যান্য খেলার সখ তেমন বেশী না থাকিলেও, শিকারের বাতিক বরাবরই প্রবল। তাই মনে হয় ইহা আমি ওয়ারিশীসূত্রে পাইয়াছি। আমার স্বর্গগত পিতৃদেবও শিকারী ছিলেন। তিনি যথেষ্ট শিকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে আমাদের অঞ্চলে প্রচুর শিকার ছিল। আমাদের সময়ে তদপেক্ষা ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া এখন প্রায় লুপ্ত হইবার মত হইয়াছে; তথাপি আমার জীবনের প্রায় ত্রিশ বৎসরের সাধনায় যে সব শিকার করিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিব।

আমি সাহিত্যিক নহি। সাহিত্য-জগতে পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় ইহা লিখিতেছি না। বই লিখিয়া জগতে বড় শিকারী (Sportsman) হইবার দুরাশাও আমার নাই। তবে তিনটি কারণে

এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। প্রথমতঃ, এখন আমার যথেষ্ট অবসর আছে। দ্বিতীয়তঃ, কতিপয় বন্ধু বান্ধবের অনুরোধ। আর একটি উদ্দেশ্য এই যে, আমার এই সাধনার ফলদ্বারা আমার ন্যায় বাতিকগ্রস্ত নবীন শিকারীদের সময়োচিত যদি কোন উপকার হয়। ইহাই আমার লিখিবার কৈফিয়ৎ।

সূচনা

আমার এই শিকারের বিবরণ উপন্যাস পাঠের ন্যায় সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। ইহাতে ভাষার চাতুর্য্য ও কবিত্বের মাধুর্য্য নাই। যাহাদের শিকার সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে, বা যাঁহারা শিকার সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের উদ্দেশেই ইহা লিখিতেছি।

একবার কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় কোন বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে গিয়া কতিপয় বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে একটা বাঘ শিকারের উদ্দীপক গল্প বলিতেছিলাম। হঠাৎ কলিকাতাস্থ কোন ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "আপনি বাঘ শিকার করেন? জ্যান্ত বাঘ?" তদুত্তরে আমি সংক্ষেপে মাত্র বলিয়াছিলাম, "আজ্ঞে না, মরা বাঘ মারি।" বলা বাহুল্য ইহাতে উক্ত গৃহখানি হাস্য কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কলিকাতায় যাঁহারা ভোগবিলাসে বর্দ্ধিত, বৈদ্যুতিক পাখার বাতাসেও তৃপ্ত না হইয়া অনবরত বরফ জলে তৃষ্ণা নিবারণ করেন, মোটর ছাড়া যাঁহারা পঙ্গু, হাঁটিয়া বেড়ান যাঁহাদের কাছে কল্পনার জিনিষ, আমার এই নীরস কাহিনী তাঁহাদিগকে সরস করিতে পারিবে না। ইহাতে জঙ্গলের ভীষণ গম্ভীরতা, শিকারের জন্য ঐকান্তিক

আগ্রহ ও উত্তম এবং কঠোর ব্যাধবৃত্তি লিপিবদ্ধ হইবে। আমি এ পর্য্যন্ত যত স্থানে যে ভাবে যত শিকার করিয়াছি, তাহার কতক কতক ও জঙ্গলের বিবরণ এবং বধ্য পশু পক্ষীর স্বভাব ও আবাসভূমি এবং আগ্নেয় অস্ত্রের শ্রেণী বিভাগ অর্থাৎ যে জাতীয় বন্দুক দ্বারা যে শ্রেণীর শিকার করা সুবিধা, তৎসম্বন্ধে আমার যাহা জ্ঞান তাহাই লিপিবদ্ধ করিব।

বন্দুক ও তাহার ব্যবহার

শিকারী মাত্রেরই বন্দুক সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা উচিত। অনেকের ধারণা বন্দুক হইলেই বুঝি শিকার করা চলে। সচরাচর গ্রাম্য শিকারীরা একনলা গাদা বন্দুক (muzzle loading gnn) দিয়াই শিকার করিয়া থাকে। তাহার দুই কারণ—প্রথমতঃ তাহারা বেশী মূল্যের বন্দুক ও তাহার টোটা (Cartridge) অর্থাভাবে ক্রয় করিতে অসমর্থ। আর যদিই বা কেহ সমর্থ হয়, তাহাও আমাদের মত হীন পরাধীন জাতির অদৃষ্টের ফেরে সরকার অনেক সময়ই পাশ (license) মঞ্জুর করেন না, ইহাও অন্যতম কারণ। কাযেই তাহারা নিরুপায় হইয়া আত্মরক্ষা ও সখ নিবৃত্তি, গাদা বন্দুক দিয়াই করিয়া থাকে। এই সব বন্দুক সাধারণতঃ মুঙ্গেরের দেশী কারিকরের তৈয়ারী। এই সব বন্দুক কখন কখনও একনলা (single barrelled) কখন কখনও দোনলা (double barrelled) হয়। ইহার দ্বারাই তাহারা পাখী ও জানোয়ার উভয় শিকারই করিয়া থাকে। ইহাদের বারুদের পরিমাণ সম্বন্ধেও বিশেষ কোন জ্ঞান নাই। সে বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ বলিলেই হয়। সাধারণতঃ বারুদের কাতির মাথার চোঙ্গের তিনভাগ (¾) পাখী শিকারে ও ব্যাঘ্র, মহিষ, হরিণ প্রভৃতি

জানোয়ারে পূর্ণ এক চোঙ্গ বা কিছু বেশী ব্যবহার করে। কোন কোন সময় উহারা দোতালা করিয়াও বন্দুক ভরে। একবার বন্দুকে বারুদ ও গুলি ভরিয়া খড় কুটা বা কাগজ দিয়া গাদাইয়া, পুনরায় গুলি ও বারুদ দিয়া আর এক বার ভরে। এই ব্যবস্থা বিশেষ বিশেষ শিকারের সময় করিয়া থাকে। ইহাদের ধারণা এই প্রণালীতে ডবল করিয়া ভরিলে জোরও ডবল হয়। ইহাকেই দোতলা ভরা বলে।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে হইল, তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে আজ ২৬।২৭ বৎসর পূর্ব্বের কথা। একবার আমরা আমাদের দেশে ভবানীপুর নামক স্থানে শিকার করিতে যাই। একদিন বাঘের খবর পাইয়া শিকারে বাহির হইলাম, আমাদের সঙ্গে তথাকার একজন স্থানীয় মান্দাই (aboriginal race) শিকারী ছিল। উহাদিগকে 'মাটিয়া' পালোয়ান বলে। তাহাকে এক গাছে উঠাইয়া দেওয়া হইল। এইরূপে বনের মধ্যে আরও কতকগুলি লোককে বিভিন্ন গাছে উঠান হইল। উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের লাইনের বাহির দিয়া বাঘ পলাইয়া গেলে হুইশ্ল দিয়া সংবাদ দিবে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাহার বন্দুক দোতালা করিয়া ভরিয়াছিল। প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় বাঘের সন্ধান হইবার অল্প পরেই বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তিদের মধ্যে "ঐ যায়—ঐ যায়" করিয়া চিৎকার শুনা গেল। আমরা এই চীৎকারে ব্যস্ত না হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। একটু পরেই হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ ও সঙ্গে সঙ্গে বাঘের ডাক শুনিতে পাইলাম। তন্মুহূর্ত্তেই কতকগুলি লোককে "রামুকে খাইল, রামুকে খাইল" বলিয়া চেঁচাইতে শুনিলাম। এই গোলোযোগে আমরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম, লাইন নষ্ট হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া দেখি, রামু চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। নিকটে কিছু রক্তের দাগও দেখা গেল।

উহাকে ধরিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিতে দেখা গেল, সে অচেতন হইয়া গিয়াছে। তখন আর কি করা যায়? আমাদের হাওদার বোতলে (Flask) যে জল ছিল তাহাই উহার মাথায় দিয়া চৈতন্য সম্পাদন করা গেল। দেখা গেল তাহার ডান হাত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। গলার হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাহা হউক তাহাকে অতঃপর আমাদের শিকারের ডাক্তারের (camp doctor) অধীনে কিছুদিন রাখিতে হইয়াছিল। পরে জানিতে পারিলাম, রামু গাছের দুই ডালে দুই পা দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, আমাদের লাইনের তাড়ায় বাঘ তাহার গাছের তলা দিয়া যাইবার সময়, সে প্রলোভন সম্বরণ করিতে না পারিয়া নিচের দিকে ঝুঁকিয়া আওয়াজ করাতে, সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের ধাক্কায় (kick) গলার হাড় ভাঙ্গিয়া গাছ হইতে পড়িয়া যায়; পরে ঐ বাঘ আমরা শিকার করি, রামুর গুলিতে সেটা খুব জখম হইয়াছিল দেখিতে পাই। আনাড়ীর দোতালা বন্দুক ভরার ফল অনেক স্থলে এইরূপই হইয়া থাকে।

ইহারা অনেক সময় জালের কাঠি বা শিশার টুক্‌রা দা কি বুড়াল দিয়া কোন রকমে ঠুকিয়া একটু গোল করিয় নলের ভিতর দিতে পারিলেই গুলির মত কায হয় বলিয়া মনে করে। কোন কোন সময় ইহারা এই শ্রেণীর দুইটি গুলি বা পেরেকের চ্যাপ্টা মাথাও ব্যবহার করে। আর একস্থল এইরূপ দোতালা ভরা বন্দুকের নল আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেকটা উড়িয়া যাইতেও দেখিয়াছি।

এই শ্রেণীর শিকারীরাও বাঘ, হরিণ, মহিষ অনেক সময় মারিয়া থাকে। কিন্তু তাহা বলিয়া পাছে কাহারও বিশ্বাস হয় যে, যখন ইহাতেই কায চলে, তখন আর ভাল জিনিষের আবশ্যকতা কি? এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই উল্লিখিত গল্পটি লিখিলাম।

ইহারা অনেক সময় এই প্রণালীতে কৃতকার্য্য হইলেও, বহু

সময়ই বিফল হয়। পা টিপিয়া টিপিয়া জানোয়ারেরা অতি নিকটে গিয়া বা কোন সময় গাছের উপর হইতে আট দশ হাতের মধ্যেই গুলি করে। ইহারা সর্ব্বদাই জানোয়ারের মর্ম্মস্থলে (Vital part) গুলি করিতে চেষ্টা করে। সুবিধা না হইলে অনেক সময় বিপদের আশঙ্কায় গুলি না করিয়া ফিরিয়াও আইসে। এইভাবে সদা-সর্ব্বদা বনে বনে ঘুরিতে ঘুরিতে দশ পাঁচ দিনে এক একটা শিকার করে। কিন্তু সখের শিকারীদের পক্ষে এ জাতীয় আশঙ্কার (risk) যাওয়া সমীচীন নহে।

সাধারণতঃ শিকারের বন্দুক দুই রকম। ১। Smooth bore gun ইহা দ্বারা ছর্‌রা ও গুলি (shots and balls) উভয়ই ছোড়া যায়। তবে সাধারণতঃ ইহা ছর্‌রার জন্যই ব্যবহৃত হয়। ২। রাইফেল (rifle) ইহাতে গুলি ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার চলে না। ইহার ভিতরে পেঁচ কাটা (rilling) থাকে বলিয়া গুলির খুব জোর হয়। দড়িতে কোন জিনিষ বাঁধিয়া (sling) ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিলে যেরূপ বেগে চলিয়া যায়, বন্দুকের নলের ভিতর পেঁচ কাটা থাকায়, গুলি নলের পেঁচের মধ্য দিয়া খুব জোরে ঘুরিয়া বাহির হইয়া যায় বলিয়াই ইহার শক্তি অত্যন্ত অধিক।

রাইফেলকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। (ক) big bore rifle (খ) high velocity express rifle। 'বিগবোর' রাইফেলে সাধারণতঃ কালো বারুদই ব্যবহৃত হয়। বারুদের পরিমাণ যথেষ্ট হইলেও ইহার নলের ছিদ্র (bore) বড় হওয়ার দরুণ গুলিও বড় ও ভারি হয়। এই জন্য গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে লাইন একটু বাঁকা (traejctory) হয়। Express rifleএ তাহা খুব কম হয়। বারুদের পরিমাণে গুলির আকার অপেক্ষাকৃত ছোট বলিয়া লাইন সোজা যায়। এই শ্রেণীর বন্দুকের নলের ছিদ্র ছোট বলিয়া, গুলি ছোট হইলেও, আজ কাল নানা বৈজ্ঞানিক

উপায়ে তৈয়ারী বলিয়া গুলি অপেক্ষাকৃত অধিক কার্য্যকর (effective) হয়। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজকাল এই জাতীয় বন্দুক নানা শ্রেণীর বাহির হইয়াছে। ইহাদিগকে high velocity express rfle বলে। এই সব বন্দুকে ধূমশূন্য (smokeless) বারুদ বা Cordite নামক একরকম explosive ব্যবহার হয়। বারুদও আজকাল নানাশ্রেণীর বাহির হইয়াছে। তাহাতে একদিকে যেমন ধোঁয়া হয় না, অন্যদিকে তেমনি প্রচণ্ড শক্তি (energy) উৎপাদন করে।

যাঁহারা হাঁটিয়া শিকার করেন, এই বারুদ তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক ও সুবিধাজনক। হাঁটিয়া শিকারের অর্থই অনেক সময় স্বেচ্ছায় বিপদের সম্মুখীন হওয়া, কাযেই তাহাতে আমোদও বেশী। কোনও হিংস্র জন্তুর প্রতি আওয়াজ করিলে বন্দুকের সম্মুখে যে ধূম বাহির হয়, তাহা হাওয়া না থাকিলে অধিক হয় এবং ৮।১০ সেকেণ্ড স্থায়ী হয়, তাহাতে সম্মুখের আর কিছু দেখা যায় না। বন গভীর হইলে ধূম আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। আওয়াজ করিয়াই যদি আহত শিকারকে দেখিতে না পাওয়া যায়, তবে তাহার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য করা যায় না বলিয়া অনেক সময় শিকার (Game) হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক হয়। পক্ষান্তরে আহত জানোয়ার হিংস্র হইলে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কাও যথেষ্ট থাকে। ধূমশূন্য বারুদে সে সম্ভাবনা নাই। অতি অল্প কুয়াসার মত সাদা ধূম বাহির হয় মাত্র। কাযেই আওয়াজ করিয়াই নিজেও সতর্ক হওয়া যায়, জানোয়ারের গতিবিধিও লক্ষ্য করা যায়।

High velocity rifleএর আর এক সুবিধা এই যে, এইগুলি সহজে বহন করা যায়। যাঁহারা বনে বনে হাঁটিয়া শিকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বড় কম সুবিধার কথা নহে। এই সব বন্দুক বাহির হওয়ার পর শিকারে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে ঘোড়াওয়ালা বন্দুক (hammer gun) ব্যবহৃত হইত। এখন ঘোড়াশূন্য (hammerless) বন্দুক বাহির হইবার পর, যাঁহারা একবার ইহা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা আর ঘোড়া-ওয়ালা বন্দুক ব্যবহার করিতে চাহেন না। ইহার সুবিধা অনেক। ঘোড়াওয়ালা বন্দুকের অর্দ্ধেক সময়েই ইহা ছোড়া যায়। এই স্থলে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যাঁহারা ঘোড়াওয়ালা বন্দুক ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহদের সব বন্দুকই এক জাতীয় হওয়া উচিত; নচেৎ অনেক সময় তাড়া-তাড়িতে কোন শ্রেণীর বন্দুক হাতে আছে তাহা ভুলিয়া গিয়া গোল হইয়া যায়। ইহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে—বিশেষ হাঁটা-শিকারীদের পক্ষে।

বন্দুকের ব্যালেন্স আর একটি মস্ত কথা। মূল্যবান বন্দুকের ব্যালেন্স ভালই হয়; যে বন্দুকের ব্যালেন্স যত ভাল হয়, তাহাদ্বারা নিশানাও (aim) তত ভাল ও তাড়াতাড়ি হয়। কাযেই বন্দুকও খুব ভাল হয়। কিন্তু বন্দুক যতই ভাল হউক না কেন, শিকারীর নাচিতে জানা উচিত, নচেৎ পরে উঠানের দোষ হইয়া পড়ে। শিকারীর নিজের উপর একটা আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত। মাত্র এই টুকুর জন্যই যথেষ্ট সাধনা ও গুলি বারুদ খরচ করিতে হয়। বন্দুক কিনিয়া দুই চারিটা ফাঁকা আওয়াজ করিয়া বা দৈবাৎ কোন শিকার করিয়া যদি কোন ভ্রান্ত গরিমা মনে আইসে, তবে তাহা ভুল; ইহার ফল পরে বিষময়ও হইতে পারে।

যাহাদের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আছে, বা যাহারা পানাসক্ত, তাহারা কখনও ভাল শিকারী হইতে পারে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে বলিয়াই দৃঢ়তার সহিত লিখিতে সাহসী হইয়াছি। এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না।

আমার আরও ধারণা এই যে, যাঁহারা চশমা ব্যবহার করেন, শিকারে তাঁহাদের প্রতিবন্ধকতা জন্মে। তবে শিকার করিতে পরিপক্ক হইয়া হাত দুরস্ত হইয়া গেলে, তখন চশমাতে আর বড় বেশী আটকায় না।

যাঁহারা পাখী শিকারে তৃপ্ত, বা যাঁহাদের বড় জানোয়ার শিকারের সুবিধা বা সুযোগ বড় একটা নাই, তাঁহারা ছর্‌রার বন্দুক ব্যবহার করিবেন। এই বন্দুকও দুই প্রকার—১। Cylinder অর্থাৎ যাহাদ্বারা গুলি ও ছর্‌রা দুই চলে। ২ Choke ইহাতে শুধু ছর্‌রাই ব্যবহার করা হয়। কোন কোন বন্দুকের ডান নল সিলিণ্ডার হইয়া বাম নল চোক হয়। সর্ব্বসাধারণ শিকারীর পক্ষে ১২নং Cylinder shot gun ভাল।

পাখী শিকারের মধ্যে কাদা খোঁচা (Snipe) শিকারই সব চেয়ে আনন্দদায়ক। শ্রমসাধ্য হইলেও ইহাই শ্রেষ্ঠ শিকার। যাঁহারা Snipe শিকার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের বন্দুক খুব ভাল 'ব্যালেন্স' এর হওয়া দরকার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বন্দুকের ব্যালেন্সের সহিত শিকারের সাফল্যের বিশেষ সম্বন্ধ। Snipe শিকারীদের ধূমশূন্য বারুদ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, নচেৎ Snipe শিকার এক প্রকার অসম্ভব ; কারণ একে এই পাখী খুব ছোট, তাহাতে আবার মাটিতে ঘাসের উপর বসিয়া থাকে, সব সময় দেখা যায় না। উড়িবার সময় flying shot মারিতে হয় ও এ পাখী শিকারে ইহাই নিয়ম। আর একটি কারণ ইহাদিগকে প্রখর রৌদ্রের সময় শিকার করিতে হয়, এবং ইহারা খুব জোরে এবং বক্রগতিতে উড়ে, কাযেই ধোঁয়া হইলে এই পাখী শিকার করা চলে না। অন্যান্য সমুদয় পাখী কালো বারুদে শিকার করা চলে। Smooth bore বন্দুক সম্বন্ধে আর অধিক লিখিব না, কারণ এই জাতীয় বন্দুক বাঙ্গালার বহুস্থানে অল্প বিস্তর দেখা যায় ; সুতরাং ইহার সম্বন্ধে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে।

আমোদ

এখানে আর একটি কথা বলিয়াই এই বিষয় শেষ করিব। যাঁহারা এই বন্দুক ব্যবহার করেন তাঁহারা সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন যে, ইহার গুলি ৪০।৫০ গজের বাহিরে কার্য্যকর হয় না এবং বন্দুকের যে নল choke হয়, তাহাতে যেন গুলি ভরা না হয়। ইহাতে নল ফাটিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। সিলিণ্ডার নলেই গুলি ব্যবহার হইয়া থাকে। অধিক দূরে ইহার গুলির শক্তি না থাকিবার কারণ, এই বন্দুকের নম্বর অপেক্ষা গুলি এক নম্বর ছোট হয়, বারুদও খুব বেশী দেওয়া চলে না। কাযেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে গুলি ঢিলের মত ধপ করিয়া পড়ে। এই জন্যই ৪০।৫০ গজের বাহিরে শক্তি কমিয়া যায়। কোনও পুরু চামড়ার জানোয়ারের উপর ইহা ব্যবহার করা উচিত নয়। বাঘ, চিতা প্রভৃতির পক্ষে ৩০।৪০ গজের মধ্যে rifle অপেক্ষা ইহা বড় হীন বলিয়া মনে হয় না।

ইহাতে যদি সম নম্বরের গুলি ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে গুলি আঁট (tight) হয় বলিয়া নল ফাটিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। ঠিক এই কারণে Choke নলে গুলি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

ইহা ছাড়া Paradox নামক আর এক রকম Semi rifle বন্দুক বাহির হইয়াছে। ইহার নলের মাথায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ পেঁচ কাটা (rifling) থাকে, এই জন্যই ইহা প্রায় rifle এর মত শক্তিশালী হয়।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা ও বন্ধু শিকারীদের অভিমত হইতে বুঝিয়াছি, ইহার গুলিও ৬০।৭০ গজের বাহিরে খুব কার্য্যকর হয় না; কিন্তু এই ব্যবধানে rifle এর মত কায করে। খুব ঘন জঙ্গলে যেখানে সাধারণতঃ দূরে জানোয়ার প্রায় দেখাই যায় না, আর দেখা গেলেও হঠাৎ চকিতে, দেখা যায়, সেই সব স্থানে এই বন্দুক বড় ফলদায়ক। ইহা rifle অপেক্ষা পাতলা হওয়াতে

Snap shot মারিবার পক্ষে বড় উপযোগী। অনেক সময় এরূপ ভাবে গুলি মারিতে হয় যে, চোখ বুজিবার ও বন্দুক বুকে লাগাইবার সময়ও পাওয়া যায় না। সেই সব সময়ে এই বন্দুক খুব ফলপ্রদ। এই বন্দুকের আর একটি সুবিধা এই যে, ইহাতে ছর্‌রা ব্যবহার করাও চলে এবং তাহা রীতিমত কার্য্যকর হয়। কিন্তু সাধারণ ছর্‌রার বন্দুক অপেক্ষা ইহা ভারি হয়। পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল, বাঘ হরিণ ছাড়া পুরু চামড়ার জানোয়ারে ইহা মোটেই কার্য্যকর হয় না। সম্প্রতি আমার কোনও বন্ধু ১২নং প্যারাডক্সে এক প্রকাণ্ড Bison মারিয়া আনিয়াছেন। তাহার মাথা আমি নিজে দেখিয়াছি। অবশ্য অত্যন্ত নিকটে ১০।১৫ গজের মধ্যেই উহার বুকে মারিয়াছিলেন; তাঁহার হাতে ঐ বন্দুকই ছিল, উহা রাখিয়া rifle লইবার আর সময় পান নাই। বাধ্য হইয়া উহাদ্বারাই মারিতে হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি এক গুলিতে একটি Bison নিহত করা এই বন্দুকের পক্ষে কম বাহাদুরী নয়।

শিকারের পোষাক

এবার শিকারের পরিচ্ছদাদির সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। ধুতি পরিয়া কোঁচা ঝুলাইয়া শিকার করা চলে না। শিকারীদের পোষাক খুব আঁটাসাটা হওয়া উচিত। তা ছাড়া পরিচ্ছদের বর্ণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পোষাক ব্যবহার করা উচিত। কোট, ব্রিচেস্, বুট ও হ্যাটই শিকারের উপযুক্ত পোষাক। ব্রিচেস্ অভাবে হাফ্‌প্যাণ্ট বা নিকার-বোকারও ব্যবহার করা চলে। বুটের নীচে রবার সোল লাগাইয়া লইলে ভাল হয়। জঙ্গলে ঘাস বা পাতার মধ্যে এবং পাহাড়ে রবার সোল বড় উপকারী। ইহাতে দুই

প্রকার সুবিধা হয়। প্রথমতঃ, শুক্‌না ঘাস বা পাতার মধ্যে শব্দ কম হয়। দ্বিতীয়তঃ, পা পিছ্‌লাইবার আশঙ্কাও কম। আমি নিজে হাওদায় এবং গ্রাম্য বাঁশবনে ও অন্যান্য জঙ্গলে ইহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ সুবিধা বোধ করিয়াছি। কিন্তু আবার বৃষ্টি হইয়া পিছল হইলে পা পিছ্‌লাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী; তখন চামড়ার সোল বা তলায় পেরেক দেওয়া জুতাই সুবিধাজনক। নূতন জুতা যাহা মচ্‌মচ্‌ করে তাহা ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ।

শিকারের সময় শিকারীর গতিবিধি শিকারকে জানিতে দেওয়া উচিত নয়। তাহাতে নিজেরও যেরূপ বিপদের আশঙ্কা শিকার না পাওয়ারও সম্ভাবনা তদ্রূপ।

ধুতি পরিয়া শিকার করিতে গেলে ধুতির অর্দ্ধেকটা বনেই রাখিয়া আসিতে হয়। তারপর আবার মধ্যে মধ্যে ধুতি খুলিয়া গিয়া বড়ই বিব্রত করে।

আঁটাসাটা পোষাক পরিতে হইবে বলিয়া বেশী টাইট পোষাক ব্যবহার করাও উচিত নয়। ইহাতে তাড়াতাড়ি চলাফেরা করা যায় না ও আবশ্যকমত খুব তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া ফিরিয়া বন্দুক চালনা করাও অসুবিধা হয়। পোষাক easy fitting হওয়াই উচিত।

আর একটী বিশেষ কথা এই যে, পরিচ্ছদের বর্ণ লাল, সাদা ইত্যাদি হওয়া উচিত নয়। ইহাতে দূর হইতে জানোয়ারের দৃষ্টি সহজে আকর্ষণ করে। সবুজ বা খাকী রংই প্রশস্ত। এই দুই রং সব স্থানে জঙ্গলের রং-এর সহিত প্রায় মিশিয়া যায় বলিয়া, জানোয়ারের দৃষ্টি সহজে এড়াইতে পারে। সাদা টুপি ব্যবহারও অকর্ত্তব্য। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এই নিয়ম হাঁটা শিকারীদের পক্ষে বিশেষ ভাবে পালনীয়।

হাওদা শিকারে এ সব নিয়ম রক্ষা না করিলেও তত দোষ হয় না; কারণ হাওদায় শিকারের অর্থই জানোয়ারকে তাড়াইয়া

শিকার করা। এ অবস্থায় তাহারা শিকারীকে দেখুক বা নাই দেখুক তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু ধুতি পরিয়া শিকার করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে।

এখানে আর একটী কথা বলিয়া রাখি। যাঁহারা হাঁটিয়া বা মাচায় বসিয়া শিকার করেন, তাঁহাদের শিকারের সময় সিগার বা সিগারেট খাওয়া অত্যন্ত দোষাবহ। ইহার গন্ধ অনেক দূর পর্য্যন্ত যায় ও জানোয়ারকে সতর্ক করিয়া দেয়। তবে যদি খুব জোর ও প্রতিকূল বাতাস থাকে তবে অবস্থা বুঝিয়া সময় সময় দুই একটা ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু না করাই ভাল। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সতর্ক না হইলে কিরূপে বিপদ হইতে পারে তাহার দুইটী ঘটনা উল্লেখ করিলাম।

আমাদের দেশে গারো পাহাড় অঞ্চলে মহিষখোলা নামক স্থানে কোন জঙ্গলে একজন স্থানীয় হাজং শিকারী রাত্রে হরিণ শিকার করিতে ধান ক্ষেতের পাশে জঙ্গলের কিনারে 'ঘুপি' করিয়া বসিয়া ছিল। বনের মধ্যে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়া লইয়া তথায় বসিয়া শিকারকেই 'ঘুপি' শিকার বলে। এই ক্ষেতখানির চতুর্দ্দিকেই বন ছিল। গভীর রাত্রে ধানক্ষেতের আইল বাহিয়া হরিণের পরিবর্ত্তে এক প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া উপস্থিত। শিকারী পুঙ্গবের তামাক টীকা ও হুঁকা কল্‌কে বাঁধা একটী সাদা নেকড়ার পুঁটলী তাহার সম্মুখেই ছিল। বাঘ দেখিয়া ভয়ে তাহার মারিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বোধ হয় বাঘের দৃষ্টি হঠাৎ ঐ সাদা পুটলিটির উপর পড়াতে, কোনও কারণ না থাকা সত্বেও খানিকদূর হইতে সে charge করিয়া আসিয়া উহা কামড়াইয়া ধরে। প্রায় ঘাড়ে আসিয়া পড়িল মনে করিয়া, উক্ত শিকারী গুরুর নাম স্মরণ করিয়া বাঘের দিকে বন্দুকের নল সোজা করিয়া ঘোড়া টিপিয়া দেয়। গুরু বিমুখ ছিলেন না, তাই সেবারে সে রক্ষা পাইয়া গেল।

বাঘটী আহত হইয়া আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া বনে গিয়া পড়িল। রাত্রে সে বাঘের আর কোনও সন্ধান করিল না। বাঘও আর তাহাকে আক্রমণের কোন চেষ্টা করে নাই। সমস্ত রাত্রি অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় ঘুপিতে থাকিয়া পরদিন প্রাতে গ্রামে গিয়া লোকজন লইয়া ফিরিয়া আসে, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া বাঘের আর কোনও খোঁজ পায় নাই। স্থানে স্থানে রক্তের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল মাত্র। বাঘটা বোধ হয় গুরুতররূপে জখম হয় নাই।

এইরূপ সিলেটের লাউরগড় নামক এক বনে তথাকার এক স্থানীয় মুসলমান শিকারী হরিণ মারিবার জন্য রাত্রে মাচা করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার সঙ্গে একখানা সাদা গাম্‌ছা ছিল; উহা উড়িয়া গিয়া মাচার সহিত আট্‌কিয়া যায় এবং নিশানের মত উড়িতে থাকে, কিন্তু ইহা সে টের পায় নাই। কতক্ষণ পরে দুই একটি হরিণকে অতি সন্ত্রস্ত ভাবে একটু দূর দিয়া ছুটিয়া পলাইতে দেখিতে পায়, কিন্তু সুযোগ না পাওয়ায় গুলি করে নাই।

ইহার একটু পরেই হঠাৎ এক প্রকাণ্ড বাঘ তাহার মাচার নীচে আসিয়া উপস্থিত হয়। নিশানের মত একটি সাদা কাপড় উড়িতে দেখিয়াই ভয়ানক ডাক দিয়া লাফাইয়া উহা কাম্‌ড়াইয়া ধরে এবং মাটিতে পড়িয়া জড়াজড়ি করিতে থাকে। শিকারীও আর দ্বিধা না করিয়া তৎক্ষণাৎ গুলি করে। গুলির সঙ্গে সঙ্গেই বাঘের ডাক শোনা গেল মাত্র। সে রাত্রে শিকারীটী আর নামিতে সাহস করে নাই। পরদিন প্রাতে খানিক দূরেই বাঘটীকে মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পায়। এই ঘটনার দুই তিন দিন পরেই আমরা ঐ বনে উহার সদ্য পতি-বিয়োগ-বিধুরা পত্নীকে বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছিলাম। ঐ শিকারীপুঙ্গব তাহার বাঘের চাম্‌ড়াখানি আমাকে নজর দিয়াছিল। চামড়া দুইখানি একত্রে রাখায়

সর্ব্বদাই আমার মনে হইত যে, ইহারা মরিয়াও বিচ্ছিন্ন হইতে চায় না। মরণের পরপারেও ইহাদের মিলন অক্ষুণ্ণ ছিল কি না কে জানে!

এই দুইটি ঘটনা হইতেই বুঝা যায়, শাদা কাপড়ের কত বিপদ। বিপদ সর্ব্বদা হয় না, কিন্তু তথাপি সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হয়। মহিষাদি জানোয়ার শিকারে ধূমপান বা সাদা কাপড় ব্যবহার আরও বিপজ্জনক।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া একটী বিদেশী গল্প সংক্ষেপে লিখিতেছি। কোনও সময় ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মান্ সম্রাট্, সম্রাজ্ঞীসহ তাঁহার কোন রক্ষিত জঙ্গলে (Reserved forest) শিকার করিতে গিয়া সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়া অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু রাজকীয় বনরক্ষক সম্রাটের সাদা পোষাকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া দিলে তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারেন।

জান্তব-জগৎ রাজকীয় আইন কানুন বা খামখেয়ালীর বশবর্ত্তী নয়। তাহারা স্বাধীনতার ক্রোড়ে পালিত, এবং প্রকৃতির আইনে চালিত। পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ জাতির মত রাজকীয় আইন স্বেচ্ছাচারে অবনত মস্তকে সহ্য করে না।

বাস্তবিক যাঁহারা নিপুণ শিকারী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের শিকার সংক্রান্ত নিয়মের খুটিনাটি বিষয়টুকু পর্য্যন্তও অবহেলা করা উচিত নয়, এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ শিকার নির্ব্বিশেষে সমজ্ঞানে মনোযোগী থাকা উচিত। কোনও সময় কোন ছোট শিকার করিতে গেলেও, তাহার ক্ষুদ্রত্ব মনে করিয়া তাহাকে তাচ্ছিল্যের ভাবে দেখা উচিত নয়; সে শিকার যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন।

বড় শিকার ও ছোট শিকার

(BIG GAME AND SMALL GAME)

আমাদের দেশে—আমাদের দেশে কেন, প্রায় সকল দেশেই —যে সকল শিকার পাওয়া যায় তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়। Big game ও Small game—অর্থাৎ বড় শিকার ও ছোট শিকার। বড় শিকারের অন্তর্গত কতকগুলি জানোয়ার পুরু চামড়া বিশিষ্ট, ও কতকগুলি পাত্‌লা চামড়া বিশিষ্ট।

টাইগার, লেপার্ড, প্যান্থার, ভালুক প্রভৃতি মাংসাশী হিংস্র জন্তু এবং গণ্ডার, বাইসন, মহিষ, বিবিধ শ্রেণীর হরিণ, নীল গাই প্রভৃতি, বড় জাতীয় অ্যান্টিলোপ ও শূকারাদি নিরামিষভোজী জন্তুকে বড় শিকারের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ছোট শ্রেণীর অ্যান্টিলোপ অর্থাৎ সচরাচর যাহাকে কৃষ্ণসার বলে, চিকারা, খরগোস এবং বিবিধ শ্রেণীর পক্ষীকে ছোট শিকারের অন্তর্ভুক্ত করা যায়; wolf, hyena প্রভৃতি শৃগাল জাতীয় জন্তুকে কেহ কেহ বড় শিকারের অন্তর্গত এবং কেহ কেহ ছোট শিকারের অন্তর্গত মনে করেন; কিন্তু বাস্তবিক ধরিতে গেলে, এইগুলি ও হরিণের মধ্যে হগ্‌ডিয়ার, বারকিং ডিয়ার প্রভৃতি ছোট জাতীয় হরিণ, ছোট শিকারেরই অন্তর্গত হওয়া উচিত। এই সব জানোয়ারের মধ্যে আবার বাঘ, ভালুক, হরিণ ও শূকরকে পাত্‌লা চামড়া বিশিষ্ট এবং মহিষ, বাইসন, গণ্ডার ও হস্তী প্রভৃতি অতিকায় নিরামিষভোজী জানোয়ারকে পুরু চামড়া বিশিষ্ট শ্রেণীতে ধরা হয়।

যে শিকার যত দুষ্প্রাপ্য ও কষ্টসাধ্য, তাহাই তত আনন্দদায়ক। এই দুই শ্রেণীর শিকারের মধ্যে বাঘ, হরিণ, মহিষ প্রভৃতি আয়াস-সাধ্য হইলেও অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য; কারণ এই সব শিকার

বাঙ্গালা ও বিভিন্ন প্রদেশের নানা স্থানে পাওয়া যায়। বাইসন, গণ্ডার প্রভৃতি জানোয়ার সহজলভ্য নহে। ইহারা বিভিন্ন প্রদেশের বিশেষ জঙ্গলের দুর্গমস্থানে বাস করে।

ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণীর শিকার আছে, তাহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। ইহা কোনও বাঙ্গালী শিকার করিয়াছেন কি না, তাহা আমার জানা নাই। ইহারা ছাগল ও ভেড়া জাতীয় জানোয়ার। ইহাদিগকে থার ও ওভিস (Thar and ovis) বলে। ইহারা হিমালয়ের বার তের হাজার হইতে সতের আঠার হাজার ফিট উচ্চে, বৃক্ষাদির চিহ্নবর্জ্জিত চিরতুষারাবৃত দুর্গম শৃঙ্গে বরফের শেওলা (moss) খাইয়া জীবনধারণ করে। এই সমস্ত শিকার অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও কষ্টসাধ্য বলিয়াই খুব সম্মান-জনক।

কোন্ শিকার কোথায় পাওয়া যায়

পূর্ব্বে যে সকল শিকারের উল্লেখ করিলাম, ইহাদের অধিকাংশ বাঙ্গালার অনেক স্থানে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ছাড়া আসাম, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানেও দেখা যায়।

বাইসন, এণ্টিলোপ, নেকড়ে বাঘ (wolf) প্রভৃতি কতকগুলি জানোয়ার বাঙ্গালায় প্রায়ই দেখা যায় না। তবে বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রদেশের সংলগ্ন কতক কতক স্থানে ইহাদের কোন কোন শ্রেণী দেখা যায়। ঠিক তেমনই মহিষ, গণ্ডার, বারশিঙ্গা (swamp deer) প্রভৃতি জাতীয় হরিণ বাঙ্গালা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে কম পাওয়া যায়; কিন্তু চিতল (spotted deer), টাইগার, লেপার্ড, প্যান্থার প্রভৃতি বাঙ্গলা ও অন্যান্য প্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। তবে

দেশভেদে ইহাদের বিভিন্ন নাম। খরগোস ও পাখী প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষুদ্র শিকার ভারতের সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে দেখা যায়; কিন্তু প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর শিকারই আসামের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; কেবল এণ্টিলোপ শ্রেণী কদাচিৎ কোন স্থানে দেখা যায়।

সমস্ত জানোয়ারেরই এক একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। ইহারা সচরাচর পাহাড়েই জন্মগ্রহণ করে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া, সময় উত্তীর্ণ হইলেই আবার যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া যায়।

বিভিন্নজাতীয় কতকগুলি হাঁস (duck), টিল, স্নাইপ প্রভৃতি পাখী সুদূর সাইবেরিয়া ও কামস্কাট্কা হইতে শীতের প্রারম্ভে এদেশে আসিয়া, পুনরায় শীতান্তে ফিরিয়া যায়। কেবল স্নাইপ বর্ষান্তে আসিয়া শীত পড়িতেই চলিয়া যায়। রাজহাঁস ও আরও কয়েক জাতীয় হাঁস হিমালয়ের অপর পারে মানস সরোবর ও তিব্বৎ প্রভৃতি স্থান হইতে আসে। শীত অন্তে বর্ষার প্রারম্ভে ইহাদের প্রসবের সময়। তাহার বহু পূর্ব্বেই ইহারা, যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া যায়। ইহারা বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে পুনরায় চলিয়া যায় বলিয়া, ইহাদিগকে migratory bird অর্থাৎ যাযাবর পাখী বলে।

ইহাদের মধ্যে অনেকেই চলিয়া আসিবার ও ফিরিয়া যাইবার সময়, পথে শিকারী কর্ত্তৃক নিহত হয়। কিন্তু ইহাদের এমন স্বভাব যে, যাহারা প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যায়, তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব বৎসরের নির্দ্দিষ্ট স্থান আবার আসিয়া অধিকার করে। ইহারা ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থান প্রিয় মনে করে বলিয়া, বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও চিনিয়া আসিতে কোন কষ্ট বোধ করে না।

কলিকাতার 'জু' গার্ডেনের ঝিলে সময় সময় বুনো হাঁস পড়িত।

বহু চেষ্টায় একবার কতকগুলিকে জাল দিয়া ধরিয়া পায়ে আংটী পরাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী দুই তিন বৎসরও উহাদিগকে ঐ ঝিলে আসিয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু প্রতি বৎসরই সংখ্যার হ্রাস হইতেছিল। আরও দুই এক স্থানে পরীক্ষায় ইহাদের এইরূপ স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

ইহারা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে এদেশে আসিতে আরম্ভ করে, তখন দশ পনের দিনের ভিতরেই ঝিল বিল ভরিয়া ফেলে। আবার যাইবার সময়ও এইরূপে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় নিঃশেষ হইয়া চলিয়া যায়। ইহাদ্বারা অনুমান হয় যে, ইহাদের অতি দূরদেশ হইতে আসিতে বা ফিরিয়া যাইতে পথে বিশ্রাম সহকারে দশ পনের দিনের অধিক সময় লাগে না। ঝাঁকশুদ্ধ উড়িলেও, ইহাদের উড়িবার পদ্ধতি অন্য রকম। সূত্রাকারে আকাশের অতি উচ্চে উড়িয়া যায়। উড়িবার সময় অগ্রপশ্চাৎ হইলেও সূত্রাকারেই যাইতে থাকে। এই জন্য বোধ হয় কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে সারসের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা হংসাদিতেও সেইরূপ দেখিতে পাই।

> "শ্রেণীবন্ধাদ্বিতন্বদ্ভিরস্তম্ভাং তোরণস্রজং।
> সারসৈঃ কলনির্হ্রাদৈঃ ক্বচিদুন্নমিতাননৈ।"

ইহাদের উড়িবার শক্তিও অসাধারণ, উড়েও খুব জোরে। স্নাইপকে কদাচিৎ দিনে আসিতে দেখা যায়, ইহারা সচরাচর রাত্রেই চলাফেরা করিয়া থাকে। যে মাঠে দুই একদিন পূর্ব্বে পাখী নাই দেখা গিয়াছে, সেই মাঠ দুই একদিন পরেই পূর্ণ হইয়া যাইতে দেখা যায়। এই জন্যই চলাফেরা করিবার সময় ইহারা ঝাঁক ধরিয়া চলে বলিয়া মনে হয়। চরিবার স্থানে, হাঁসের মত ইহারা দল বাঁধিয়া বসে না। বিভিন্ন স্থানে পৃথক হইয়া বসে। এই জন্য ইহাদিগকে

এক একটি করিয়া স্বীকার করিতে হয়। এতদ্দেশে চারি শ্রেণীর স্নাইপ দেখিতে পাওয়া যায়—১ Pintail, ২ Fantail, ৩ Painted, ৪ Jack। Pintail ও fantail দেখিতে একই রকম, কিন্তু পুচ্ছে কিছু পার্থক্য আছে বলিয়া ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। Jack ছোট জাতীয় স্নাইপ, ইহার সংখ্যাও কম। Painted, জ্যাকের ন্যায় ছোট নয়, ময়ূরের ন্যায় নীলবর্ণে চিত্রিত। Fantail স্নাইপ, প্রথম এদেশে আসে এবং দীর্ঘ দিন থাকিয়া অন্যান্য স্নাইপের পরে ফিরিয়া যায়। এই জন্যই আমার মনে হয় যে অন্যান্য জাতীয় স্নাইপের ন্যায় ইহাদের বাসস্থান তত সুদূর উত্তর প্রদেশে নহে। ইহারা সমস্ত রাত্রি ও সকাল বেলা আহার অন্বেষণে চরিয়া বেড়ায়। প্রখর রৌদ্রের সময় এক একটী, এক এক স্থানে বসিয়া ঝিমাইতে থাকে। সেই জন্যই ইহাদিগকে একটু বেলা না হইলে শিকার করা অসুবিধাজনক। প্রখর রৌদ্রের সময়েই ইহাদিগকে শিকার করা প্রশস্ত। ইহারা ক্ষুদ্রকায় এবং জোরে ও বক্রগতিতে উড়ে বলিয়া সকালবেলা জাগরিত অবস্থায় ইহাদিগকে নিকটে পাওয়া কঠিন।

স্নাইপকে এক একটি করিয়া মারিতে হয় বলিয়া, ইংরাজীতেও যুদ্ধের সময় যাহারা দূর হইতে এক একটি সৈন্য গুলি করিয়া মারে, তাহাদিগকে ‘স্নাইপার’ ও এক একটি করিয়া মারার নাম ‘স্নাইপিং’ বলে। অনেকে snipid নামক এক প্রকার পাখীকে snipe বলিয়া ভ্রম করেন। বাস্তবিক snipe যখন মাটিতে বসিয়া থাকে, তখন ইহাকে প্রায়ই দেখা যায় না। কাদা ও ঘাসের রঙের সহিত যেন মিশিয়া থাকে, নিকটে গেলেই অতি জোরে ‘চ্যাঁক’ শব্দ করিয়া উড়িয়া যায়; ইহাদিগকে কদাচিৎ নিঃশব্দে উড়িতে দেখা যায়। ইহারা জলা জমি ও ধানক্ষেতে প্রায় থাকে এবং পোকা মাকড়, কেঁচো প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য।

উড্ কক্ (wood cock) নামক আর এক শ্রেণীর পাখী আছে, ইহারাও দেখিতে ঠিক স্নাইপের মত, কিন্তু আকারে অনেক বড়। আমরা একবার সিলেটের কোন স্থানে শিকার করিতে করিতে একস্থানে মাত্র দুইটি দেখিয়াছিলাম। একটিকে বহু কষ্টে মারা হয়। উহার আকার শালিকের মত ছিল। শিকারের পরে উহার চামড়াটি, পালক সমেত stuff করিবার জন্য রাখিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কুকুরে উহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। শোনা যায়, ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে, উড্ কক্ (wood cock) ইহা অপেক্ষা বড় আঁকারের হয়।

হরিণ, ব্যাঘ্রাদি জানোয়ার, বর্ষা অন্তে পাহাড় হইতে নীচে নামিয়া আসে এবং জল শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে আরও দূর সমতল ভূমিতে (plain) চলিয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকের পাহাড় হইতে নামিবার নির্দ্দিষ্ট পথ আছে। সেই সকল পথকে 'ঠৌর' বা 'দোয়াল' (animal track) বলে। যখন বনে স্বাধীন ভাবে ইহারা চলা ফেরা করে, তখন 'ঠৌর' ছাড়া চলে না ; তবে হঠাৎ কোন সময় তাড়া পাইলে বা কোন কারণে ভীত হইলে, বনের মধ্য দিয়া বিপথে খানিক দূর যাইয়া পরে পুনরায় রাস্তা ধরে।

আমি হাওদা শিকারে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, যখনই কোনও জানোয়ার আহত বা ভীত হইয়া পলায়, তখন প্রথমতঃ খানিক দূর পর্য্যন্ত দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া, বন ঠেলিয়া যাইয়া একটু পরেই আবার 'ঠোর' বা 'দোয়াল' ধরিয়া চলিতে থাকে। এই জন্যই হাওদা শিকারে সর্ব্বদাই দেখা যায়, জানোয়ার প্রথমতঃ খুব হড় মড় করিয়া বাহির হইয়া, পরে নিঃশব্দে চলিয়া যায়। এই সকল 'ঠোর' সাধারণতঃ বক্রগতি হয়।

পাখীর মত জানোয়ারেরও এক একটা প্রিয় জঙ্গল আছে। ইহারা পাহাড় হইতে নামিয়া যে, যাহার প্রিয় জঙ্গলে চলিয়া যায়।

এমনও দেখা গিয়াছে যে, নিকটে খুব গভীর জঙ্গল থাকিতেও নিতান্ত ক্ষুদ্র পাত্‌লা জঙ্গলে প্রতিবৎসরই আসিয়া বাসা করে। সেই সব জঙ্গলে যদি ইহারা মারা পড়ে, তবে কিছুদিন পরেই আবার ঐ স্থান জানোয়ার দ্বারা পূরণ হয়। ইহাতে এই মনে হয় কোন একটি নির্দ্দিষ্ট জানোয়ারই যে সেই জঙ্গলে আইসে তাহা নহে। স্বাভাবিক জ্ঞানেই (instinct) ইহারা এইরূপ স্থান নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। ইহারা পাহাড় হইতে ৭।৮ বা ১০ মাইল দূরবর্ত্তী জঙ্গলে আসিয়া বেশ 'পাকা পোক্ত' হইয়া কিছু দিনের জন্য বাস করিয়া থাকে। আরও একটু মজা এই যে, পাহাড় হইতে সেই জঙ্গলে পৌঁছিতে ও পুনরায় ফিরিতে রাস্তায় যে সব জঙ্গলে ইহারা বাস করে, প্রতিবারই সেই সব স্থানে অযাচিত ভাবে অতিথি হইয়া আইসে ও ফিরিয়া যায়। তবে কেহ মারা পড়িলে, সে স্বতন্ত্র কথা। পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহারা অনেক সময় শিকারের জন্য নীচে নামিয়া আসে এবং শিকারান্তে পুনরায় পাহাড়ে উঠিয়া যায়। আবার কোন কোন সময় নীচে শিকার করিয়া উহার 'মড়ি' (Kill) উচ্চ পাহাড়ে টানিয়া লইয়া যায়। যে সব স্থানে পাহাড়ের নীচেই সমভূমি আছে, সেই সব স্থানে ইহারা নীচেই বসবাস করে। ঐশ্বরিক বিধানে বাঘ ও হরিণ ইত্যাদির মধ্যে পরস্পর খাদ্য খাদক সম্বন্ধ থাকিলেও এক জঙ্গলে বাস করিতে ইহারা কিছুমাত্র ভীত হয় না। স্বাভাবিক শক্তিতেই ইহারা আত্মরক্ষা করিয়া থাকে।

সব শ্রেণীর জানোয়ার এক জাতীয় জঙ্গল ভালবাসে না, সাধারণতঃ মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি স্থূলচর্ম্মী জানোয়ার গভীর ও ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষ সমাকুল জঙ্গল ভালবাসে। ইহারা গরম সহ্য করিতে পারে না বলিয়া, স্যাঁৎসেঁতে ও জলা জায়গা ইহাদের প্রিয়। ইহারা সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর হইবার পূর্ব্বেই জলে বা কাদায় গড়াগড়ি দেয়। যে স্থানে ইহারা গড়াগড়ি দেয়, সেই স্থানকে 'গারী' বলে; অনেক

সময় জলে গা ডুবাইয়া পড়িয়া থাকে। মহিষের এই স্বভাব দেখিয়া কালিদাসের এই শ্লোকাংশ মনে পড়ে—

"গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতম্"।

কাযেই এই শ্রেণীর জানোয়ার, প্রখর রৌদ্রের সময় শিকার করাই সুবিধা। তখন অনেক সময় ইহারা ঘুমাইয়া কাটায়। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা চরিবার জন্য বাহির হইয়া সমস্ত রাত্রি বনে এবং তন্নিকটবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রে বিচরণ করে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ইহারা স্বস্থানে ফিরিয়া যায়। এই জন্য বনের নিকটবর্ত্তী বহু শস্য ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রস্বামী 'টং' (night watch) করিয়া রাত্রে পাহারা দেয়। কোন জন্তুর 'সাড়া' পাইলেই টিন বাজাইয়া উহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ক্ষেত্রস্বামীর বাড়ী ক্ষেত্র হইতে দূরে হইলে খড় দিয়া মানুষের আকৃতি গড়িয়া চূণ কালী দিয়া চিত্রিত করে ও ছেড়া কাপড় পরাইয়া হাতে ধনুক দেয়। এই উপায়ে তাহারা ক্ষেত্র রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহাতে ফল কমই হয়, কারণ প্রথম প্রথম কয়েক দিন জানোয়ারেরা এই অদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইলেও কিছুদিনেই অভ্যস্ত হইয়া যায়; যাহা হউক দূরবর্ত্তী ক্ষেত্রে ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

শূকর প্রভৃতি জানোয়ারও মহিষাদির ন্যায় স্যাঁৎসেঁতে স্থানে থাকিতে ভালবাসে। তবে ইহারা, ঘন ও পাত্‌লা উভয় শ্রেণীর জঙ্গলেই বাস করে।

হস্তীর যে প্রকার 'মস্তি' হয়, (must মদক্ষরণ) মহিষাদি জানোয়ারেরও সেইরূপ হইয়া থাকে। তখন ইহারা অধিকতর হিংস্র হইয়া উঠে। 'মস্তি' হইলে ইহারা বাথানে (পালিত মহিষ রক্ষণের স্থানে) আসিয়া পোষা মাদি মহিষের সহিত মিশিয়া, সন্তান উৎপাদন করে। কোন কোন সময় এইরূপ বাথানে একাধিক বন্য মহিষও আসিয়া, অধিকার করে। কখনও ইহারা মহিষ-রক্ষক ও পোষা

মহিষের উপর অত্যাচার করে। এই সময় মহিষরক্ষক অর্থাৎ মহিষাল-দিগকে অত্যন্ত সাবধানে থাকিতে হয়। কিছুদিন পরে ঠাণ্ডা হইয়া গেলে, আর ইহারা অত্যাচার করে না। সাধারণতঃ ইহাদের 'মস্তি' বা গরম হইবার সময়, কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত। পালিত অধি-কাংশ মাদি মহিষ এই সময় ঋতুমতী হয়। পালিত মহিষ দ্বারা ভাল সন্তান উৎপাদন হয় না বলিয়া, মহিষালগণ পালে বন্য মহিষের আগমন কামনা করে। অনেক সময় এই সমস্ত বন্য মহিষ, বাথানে 'আনা-গোনা' করিতে করিতে পালিত পশুর মত হইয়া পড়ে। রক্ষকেরা ইহাদিগকে ধরিতে পারে না, ইহাই মাত্র পার্থক্য। ইহারা সমস্ত রাত্রি এমন কি অনেক সময় দিনের বেলাও পালের সঙ্গে বাথানে থাকে। আমরা অনেক সময় মহিষ শিকারের উদ্দেশ্যে বাথানে গিয়া মহিষালদিগকে জঙ্গলী বয়ারের (Bull buffallo) কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা অস্বীকার করে। প্রথমতঃ পুরস্কারের প্রলোভন, পরে ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি নানা উপায়েও অনেকবার অকৃতকার্য্য হইয়াছি, কিন্তু আবার অনেক সময় দৌরাত্ম্যকারী মহিষ পালে আসিয়া জুটিলে উহারা স্বেচ্ছায় সংবাদ দেয়। বাথানস্থিত জঙ্গলী মহিষ একটি হত হইলে, দশ পনেরো দিনের মধ্যেই আর একটি আসিয়া সেই স্থান পূরণ করিয়া লয়। এক এক বাথানে ২।৩ শত অনেক সময় ৪।৫ শত পর্য্যন্ত মহিষ থাকে। গ্রামের মধ্যে স্থান সঙ্কুলান হয় না বলিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিলের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাথান করে। মহিষগণ চরিবার সময়, জঙ্গলের মধ্যে বহুদূর চলিয়া যায়। এই জন্যই, বাথানের কোন একটী জঙ্গলী মহিষ হত হইলে, আর একটী আসিয়া, সহজে মিলিত হয়।

পালিত মহিষ দুই শ্রেণীর—কাছর ও বাঙ্গর। কাছরগুলি সাধারণতঃ বিশাল বপুঃ, দীর্ঘশৃঙ্গ ও অনেকটা বন্য প্রকৃতির হয়।

বন্য মহিষের সহযোগে এই জাতীয়া মাদি মহিষের 'বাচ্চা' হয়। ইহারা অধিক দুগ্ধবতী হইয়া থাকে।

বাঙ্গর জাতীয় মহিষ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় ও হ্রস্ব-শৃঙ্গ হয়। ইহারা নিরীহ স্বভাবের, দুগ্ধও অপেক্ষাকৃত কম দেয়। পালিত মহিষেই ইহাদের সন্তান উৎপাদন করে। জঙ্গলী বয়ার ইহাদের সহিত মেশে না। কাছর ও বাঙ্গরের পৃথক পৃথক বাথান হয়। সাধারণতঃ ইহাদের এক জাতি অন্য জাতির সহিত মেশে না। কিন্তু আবার কখন কখনও কাছরের সহযোগে বাঙ্গরের 'বাচ্চা' হয়। তাহাদিগকে দো আঁস্‌লা বলে।

এই উভয় শ্রেণীর পালিত মহিষের মধ্যে 'নাথার' (Riding buffallo) নামক এক শ্রেণীর মহিষ আছে। ইহাদের নাকে ছিদ্র করিয়া রজ্জু সহযোগে পিঠে চড়িয়া মহিষালগণ অন্যান্য মহিষ চরায় এবং সময় সময় হারাণো মহিষও খুঁজিয়া আনে। ঘোড়ার মত ইহাদের পিঠে চড়িয়া গভীর জঙ্গলের মধ্যে যাতায়াত করিতে, এমন কি সময় সময় দৌড়াইয়া যাইতেও মহিষালগণ কষ্ট বোধ করে না। সাধারণতঃ বন্ধ্যা মহিষ নাথার হইয়া থাকে! ইহারা অত্যন্ত বলশালিনী হয়। পালের অন্যান্য মহিষ ইহাদিগকে বড় ভয় করে।

সাধারণতঃ জঙ্গলী মহিষ তিন প্রকার।

১। জঙ্গলী পাল অর্থাৎ অনেকগুলি একদলে থাকে। ইহাদের মধ্যে বয়ার একটী, কদাচিত ২।৩টীও থাকে। অন্যগুলি 'কাকিনী (Cow buffallo)। কিন্তু পালের প্রধান একটীই।

২। Solitary bull অর্থাৎ 'ফেটো' মহিষ। ইহারা একাই থাকে। কোন পালের সহিত মিশিতে ভালবাসে না। কাযেই এই শ্রেণীর মহিষ অধিকতর হিংস্র হয়। শোনা যায় ইহারা প্রথমতঃ পালেই থাকে, পরে পালের প্রধানের সঙ্গে ঝগড়ায় পরাস্ত হইয়া তাড়িত হইলে, স্বভাব বদলাইয়া এরূপ হয়।

৩। 'খুট অরণ'—ইহারা প্রথমতঃ পোষাই থাকে, পরে কোন কারণে পাল হইতে দুই একটী ছুটিয়া জঙ্গলে চলিয়া গেলে বহু চেষ্টাতেও মহিষালগণ ইহাদিগকে ধরিতে পারে না, তবে কালক্রমে ইহারা বন্যভাবাপন্ন হইয়া পড়ে এবং জঙ্গলী মহিষের সহযোগে সন্তান উৎপাদন করিয়া, এক বৃহৎ পালের সৃষ্টি করে। কোন কোন সময় এক দলে ৩০।৪০টাও থাকে। কিন্তু প্রকৃত জঙ্গলা মহিষ অপেক্ষা, ইহারা অধিকতর ধূর্ত্ত হয়।

মহিষাদি জন্তুর ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। হাওদা শিকার ব্যতীত, অন্য কোন উপায়ে মহিষ শিকারের সময় সিগারেট বা তামাক খাওয়া ঠিক নহে। অত্যন্ত সতর্ক হইয়া ইহাদিগকে শিকার করিতে হয়। একটু 'টু' শব্দ বা গন্ধ পাইলেই, দূর হইতেই চম্পট দেয়। একবার পলাইতে আরম্ভ করিলে, বহুদূর না গিয়া আর বড় থামে না। ইহাতে অনেক সময় ইহারা বৃহৎ জঙ্গল হইতে পালাইয়া, পাত্‌লা ও ছোট জঙ্গলে যেস্থানে ইহাদের গা ঢাকে না, এমন স্থানেও আশ্রয় লয়। কিন্তু সাধারণতঃ গভীর ও গাছড়া জঙ্গলের দিকেই যাইতে চেষ্টা করে। আবার কোন কোন সময় গন্ধ পাইলে মাথা উচু করিয়া, শুঁকিতে শুকিতে, আস্তে আস্তে সেই দিকে আইসে। যদি হঠাৎ সেই সময় শিকারীকে দেখিতে পায়, তবে বিনা কারণেই আক্রমণ করে। ইহাদের আক্রমণ (Charge) বড় ভীষণ। যাহাকে ধরে তাহার প্রাণান্ত না করিয়া ছাড়ে না। বাঘের তাড়ায় রক্ষা পাইলেও ইহাদের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া কঠিন।

খুব বৃহৎ ও শক্ত চামড়ার জানোয়ার বলিয়া, ইহাদিগকে Chargeএর মুখে ফিরানো খুব মুস্কিল। বহু হাঁটা শিকারী, যাহারা Big bore rifle ব্যবহার করেন না, তাঁহাদের পক্ষে আরও বিপদ। Big bore rifle হইলে ১০ কি ১২ bore এবং High velocity

express rifle হইলে 577 কিংবা নং ১০ Nitro paradox ইহাদের ব্রহ্মাস্ত্র।

ব্যাঘ্রাদি পশুর স্বভাব মহিষাদি অপেক্ষা বিভিন্ন প্রকারের দেখা যায়। অনেক সময়েই, ইহারা, মহিষ প্রভৃতির মত, ঘন জঙ্গল পছন্দ করে না। অপেক্ষাকৃত পাত্‌লা জঙ্গলে ও শুষ্ক স্থানে, জলের নিকটে ইহারা থাকিতে ভালবাসে। কিন্তু অত্যন্ত গরমের সময়, ইহারা লতা গুল্মাদি-বেষ্টিত গাছড়া জঙ্গল পছন্দ করে। যে সব জঙ্গলে জল নাই, নিতান্ত নিরুপায় না হইলে, সেই সব স্থানে ইহারা প্রায়ই থাকে না।

বাঘকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। (১) Cattle-lifter (যাহারা গবাদি পশু শিকার করিয়া খায়—গো-বাঘা) (২) Game-killer (যাহারা বন্য জন্তুর উপর নির্ভর করিয়া জীবন-ধারণ করে), (৩) Man-eater (নরভুক্)। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে Cattle -lifterই সচরাচর দেখা যায়। ইহারা পাহাড় হইতে নামিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত লোকালয়ের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে চলিয়া যায়। গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে, গো-মহিষাদি পায় বলিয়াই, ইহারা সেই সব স্থান পছন্দ করে। হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারীরা যেমন লোটা কম্বল সম্বল করিয়া, তাহাদের কষ্টোপার্জ্জনের দেশ হইতে, অস্থি-কঙ্কাল-সার অবস্থায়, আমাদের সোণার বাঙ্গালায় আসিয়া, কিছু দিনেই বেশ 'নাদুস নুদুস' হইয়া, মোহরের মালা গলায় পরে; ইহারাও তেমনই পার্ব্বত্য ভূমি ত্যাগ করিয়া লোকালয়ের নিকটবর্ত্তী জীবিকা-সুলভ স্থানে আসিয়া, কিছু দিনেই নধর-দেহ ও চাক্‌-চিক্যশালী হয়। লোকালয়ের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে থাকিয়া অল্পায়াসে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে বলিয়া, ইহারা অন্য দুই শ্রেণীর বাঘ অপেক্ষা আয়তনে ও উচ্চতায় কিছু বড় হয়। কিন্তু Game-killerএর মত অত তৎপরতা (agility) দেখাইতে পারে না। Catte-lifter

গণ দিবারাত্রি সমভাবেই শিকার করে। বাঘ অপেক্ষা বাঘিনী অধিক-তর শিকারপটু হয়। অধিকাংশ সময়ই বাঘিনা শিকার করে, পরে বাঘ আসিয়া তাহাতে ভাগ বসায়। এই কারণে বাঘ অপেক্ষা বাঘিনী অধিকতর কার্য্যতৎপর ও ধূর্ত্ত হয়।

ইহারা কোন সময়ে মহিষকে পালের ভিতর ধরিতে সাহস করে না। যখন কোন মহিষ বা তাহার বাচ্ছা (Calf) দল ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তখনই ইহারা তাহাকে শিকার করে। খুব বড় মহিষ হইলে প্রথমে বাঘিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, পরে বাঘের হাতে উহার ভব-লীলা শেষ হয়।

রাত্রিতে গবাদি পশু, গোয়ালে বাঁধা থাকে বলিয়া, ইহারা গোয়াল হইতে বা কোন কোন সময় লোকের বাড়ীর উঠান হইতেও গরু বাছুর ধরিয়া লইয়া যায়। কিন্তু বাঘ প্রায়ই ছোট বাছুর ধরে না, বোধ হয় বলাভিমানই ইহার কারণ। জঙ্গলা জায়গায় এক এক গৃহস্থের অনেক গরু থাকে। অনেক সময় দুই একটী গরু চরিয়া বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব করে বা কদাচিৎ একেবারেই রাত্রিকালে ফিরিয়া আসে না। সেই সময় ইহারা জঙ্গলেই নিধনপ্রাপ্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে গো-জাতির একটী বিশেষত্ব ও বর্ণবৈচিত্র্যের কথা বলিব। আমাদের এতদ্দেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিলকে হাওর বলে। এই সকল বিলের কোন কোনটী ১০।১৫ মাইল বিস্তৃতও হয়। বর্ষাকালে পরিপূর্ণ অবস্থায়, সাধারণ বাতাসেও বড় বড় ঢেউ সৃষ্টি করিয়া, পদ্মা নদী অপেক্ষাও ভীষণ হইয়া থাকে। তখন নৌকা চলাচল এক দুরূহ ব্যাপার। ধরিতে গেলে ইহারা এক একটি ছোট হ্রদ (lake) বিশেষ। এই হাওর অঞ্চলে এক এক গৃহস্থের ২০।৩০টী বা তদধিক গরু থাকে। কোন কোন বড় গৃহস্থের শতাধিকও দেখা যায়। অনেক সময় গৃহস্থেরাও ২।৪ জনে মিলিয়া জঙ্গলের নিকট গোয়াল বাঁধিয়া গরু রাখে। আবশ্যকমত ১০।৫টী বাড়ী লইয়া যায়।

প্রাতে কয়েক জন রাখাল মিলিত হইয়া, এই সব গরু নিকটবর্ত্তী মাঠে বা বিলে চরায়। আবার সন্ধ্যা হইলেই ইহাদিগকে তাড়াইয়া, গোয়ালে লইয়া আসে। গোয়ালে স্থানাভাব প্রযুক্ত, অনেক সময় কতক গরু বাহিরেও বাঁধা থাকে। Reed jungle (নল-খাগড়ার জঙ্গল) ইহারা ভালবাসে বলিয়া, সেই সব জঙ্গলে 'চরাই' করিবার সময়, ক্রমাগত চক্ষুতে নলের খোঁচা খাইয়া জল পড়িতে পড়িতে কাহারও এক চক্ষুতে, কাহারও বা দুই চক্ষুতে ছানি পড়িয়া যায়। এই জন্য হাওয়রের অধিকাংশ গরুকে কানা দেখা যায়।

হাওয়রের এই সব ছুটা গরু প্রায় সবই লাল, কালো বা পাকড়া হয়। শতকরা ৫।৭টার অধিক প্রায়ই সাদা গরু দেখা যায় না। গ্রামে বা সহরে যে সব স্থানে গরুকে বাঁধিয়া 'চাড়ি' দেয়, সেই সব স্থানে ঠিক ইহার বিপরীত। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, ইহাই মনে হয় যে, গরু যতই গৃহপালিত হয়, ততই ইহাদের স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া সাদা হইতে থাকে। এই সব স্থানের গরু সহরের মত পোষমানা নয়। কিছু কিছু বন্যভাবাচ্ছন্ন দেখা যায়।

Cattle-lifter বাঘেরা ২।৩টি কি অনেক সময় স্ত্রী-পুত্রাদি সহ ৫।৬টী এক পরিবারে বাস করে। শিকার করিয়া গুরুভোজনের পর ঘন ঘন জল খাইতে হয় বলিয়া ইহারা জলের নিকটবর্ত্তী জঙ্গল এত পছন্দ করে।

বহু স্থানেই দেখা যায়, ৪।৫টা গরু, আবশ্যকের অধিক সত্ত্বেও, হত্যা করে। পরে, ক্রমে ধীরে ধীরে পচাইয়া বেশ আয়েস করিয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত খায়। আবার অনেক সময় ইহাও দেখা যায়, বিনা কারণে ৫।৭টা শিকার করিয়া, স্পর্শমাত্র না করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ এরূপ চলতি মুখে করে। গন্তব্য পথে যাইবার সময় যাহা পায় মারিয়া চলিয়া যায়। অনেক সময়, বাঘিনীর শিক্ষা-

নবীশ 'বাচ্চা' সঙ্গে থাকিলে তাহাদের দীক্ষা দিবার জন্য শিক্ষয়িত্রী-রূপে পাঠ দেয়।

কোন স্থানে বাঘ আসিয়াছে সাড়া পাওয়া গেলে, গৃহস্থেরা তাহাদের পালিত পশু সম্বন্ধে খুব সাবধান হয়। সেই সময় একাদিক্রমে এই সব বাঘেদের একাদশী চলিতে থাকে। ভগবান ইহাদের সে শক্তিও যথেষ্ট দিয়াছেন। যদি কখনও উপবাসের পালা খুব বাড়িয়া যায়, ইহারা তখন অগত্যা জঙ্গলে শূকর বা হরিণ শিকার করে। ইহারা বনে সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া নিঃশব্দে গা ঢাকা দিয়া এত সহজে যাইতে পারে যে, সেরূপ দক্ষতা আর কোনও জানোয়ারে দেখাইতে পারে না। আরও বৈশিষ্ট্য এই যে, ভগবান্ ইহাদিগকে কতকগুলি গোঁফ দিয়াছেন, সেগুলির অন্য কার্য্য থাকিলেও প্রধানতঃ পথ প্রদর্শক যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। যে-কোন সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া চলিয়া যাইবার সময়, ইহাদের গোঁফ পথের উভয় পার্শ্ব স্পর্শ করিলে সেই সকল স্থান দিয়া ইহারা স্বাভাবিক অবস্থায় চলে না; কারণ ইহারা মনে করে, ঐ পথে ইহাদের শরীর আট্‌কাইয়া যাইবে। বাস্তবিক, মাপ করিয়া দেখিলেও ইহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। বিড়ালেরও এইরূপ স্বভাব দেখা যায়। ইচ্ছা করিলে কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

বাঘেরা শিকার করিবার সময়, সাধারণতঃ পিছন দিক হইতে কোনও জানোয়ারের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া কামড়াইয়া ধরে। ঘাড়ে ধরিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের গুরুভারে শিকারের ঘাড় ভাঙ্গিয়া যায়। খানিকক্ষণ মাটিতে পড়িয়া 'ঝটাপটি' করিতে করিতেই সব শেষ হইয়া যায়। Leopard, panther প্রভৃতির চরিত্র ইহার ঠিক বিপরীত। তাহারা পিছন হইতে লাফাইয়া মুখ নীচু করিয়া একেবার টুঁটি চাপিয়া ধরে ও ঝুলিয়া পড়ে। ইহারা সকলেই শিকার একেবারে মরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, কামড়াইয়া ধরিয়া গোঁগ্‌রাইতে থাকে।

ইহাতেই লোকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, ইহারা শিকার করিয়া প্রথমেই রক্ত চুষিয়া খায়। বাস্তবিক তাহা ভুল। ইহারা চাটিয়া খাওয়া ছাড়া চুষিয়া খাইতে পারে না। কেবল শিশু শাবকেরাই চুষিয়াই মাতৃস্তন্য পান করে।

অধিকাংশ স্থলেই বাঘেরা যোড়ায় যোড়ায় বাস করে। কিন্তু পরস্পর নিকটবর্ত্তী দুইটি জঙ্গল থাকিলে যোড়া দুইটিকে দুই জঙ্গলে থাকিতেও দেখা যায়। ইচ্ছানুসারে একত্র মিলিত হয়।

যোড়ার একটা নিহত হইলে, দশ পনের দিন কি মাসখানেকের মধ্যে আর একটী আসিয়া মিলিয়া যায়। সাধারণতঃ বাঘ মারা পড়িলে বাঘিনী কিছুদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া ক্রমাগত ডাকিতে থাকে; তাহাতেই আর একটী বাঘ আসিয়া মিলিত হয়। এইরূপে অল্লায়াসেই বিধবা-বিবাহ সংঘটিত হয়। কিন্তু বাঘিনী হত হইলে অত শীঘ্র সেরূপ ঘটে না। তবে পরবর্ত্তী বৎসরে বাঘ 'দোজবর' হইয়া নব যুবতী সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে।

বাঘিনীরা প্রসবের কিছু পূর্ব্বেই বাঘের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। প্রসবান্তে শাবক কিছু বড় হইলে স্বামীর সহিত পুনর্মিলিত হয়। বিড়াল যেমন দুগ্ধপোষ্য শাবককে খাইয়া ফেলে, ইহাদেরও সেইরূপ প্রকৃতি বলিয়া শিশু শাবককে রক্ষা করিবার জন্য, বাঘিনী প্রসবের পূর্ব্বে পৃথক হইয়া পড়ে। পশ্বাদি মাত্রেরই স্ত্রীগণ স্বাভাবিক নিয়মে ঋতুমতী হইলে পুরুষের সম্ভোগের সময় উপস্থিত হয়। ব্যাঘ্রাদিরা নিজ শাবককে নষ্ট করিয়া ফেলিলেই, পুনরায় সম্ভোগ করিতে পারিবে বলিয়া, শাবককে নষ্ট করে। এই জন্যই শাবক কিছু বড় না হওয়া পর্য্যন্ত বাঘিনী, বাঘ হইতে পৃথক থাকে। Cattle-lifter বাঘের সম্বন্ধে আর যাহা কিছু বাকী রহিল, 'হাওদা' শিকার প্রবন্ধে তাহা বলা যাইবে।

Game-killer বাঘ লোকালয়ের নিকটে বড় আইসে না। ইহারা

প্রায়ই পাহাড়ে বা তন্নিম্নস্থ জনবিরল জঙ্গলে বাস করে। বন্য পশু শিকারই ইহাদের জীবিকা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একই জঙ্গলে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ সত্ত্বেও বাঘ ও হরিণ প্রভৃতি অন্যান্য জানোয়ার বাস করে। বিশ্বস্রষ্টা বাঘকে যেমন শিকার করিবার উপযোগী করিয়া গড়িয়াছেন, হরিণাদি জন্তুকে তেমনই প্রখর ঘ্রাণ ও শ্রুতি শক্তি দিয়া একত্র বসবাসের উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। তাই ইহারা একত্র বস-বাস করিতে অভ্যস্ত ও আত্মরক্ষা করিয়া থাকিতে সমর্থ। এই কারণেই Game-killer বাঘদের বহু কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া শিকার সংগ্রহ করিতে হয়। সেই জন্য প্রতিদিন ইহাদের অদৃষ্টে আহার 'জোটে' না। অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া সর্ব্বদাই পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় বলিয়া, Cattle lifter বাঘ অপেক্ষা Game killer খর্ব্ব ও কৃশ হয়। অন্য বাঘ অপেক্ষা ইহাদের স্ফূর্ত্তি অধিক। এই শ্রেণীর বাঘ মানুষ দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পায়। কিন্তু গো-বাঘা (cattle-lifter) শ্রেণী সর্ব্বদা লোক দেখে বলিয়া, তত ভয় পায় না। Game-killer শ্রেণীর বাঘই পরে গোবাঘায় পরিণত হয়। Game-killer বাঘেরা অধিক সময় একক বা যোড়া থাকে। শাবকগণ আত্মনির্ভরক্ষম হইলেই পৃথক্ হইয়া পড়ে। ইহারা পাশ্চাত্য জাতির মত, পরিজনাদির দায়িত্বের গুরু ভার লইতে নারাজ। শাবকগণ প্রথম প্রথম ভাল করিয়া শিকার করিতে পারে না বলিয়া, গির্‌গিটি, গো সাপ, বেজী প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তু ধরিয়া খায়।

Man-eater Tiger বলিয়া কোন বিশেষ শ্রেণীর বাঘ নাই। পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর বাঘের বার্দ্ধক্যে কষ্টসাধ্য শিকার ধরিবার শক্তি কমিলে, যদি হঠাৎ কেহ কোন সময়ে ২।১ জন মানুষ হত্যা করিয়া খাইতে পারে, তবেই Man-eater হইয়া দাঁড়ায়। অনেক সময় বাঘিনী Man-eater হইলে, তাহার শিশু-সন্তানগণও ক্রমে মাতার

নিকট শিক্ষালাভ করিয়া Man-eater হইয়া পড়ে। একবার Man-eater হইলে, পরে আর এমন শ্রেষ্ঠ, সুখাদ্য নরম মাংস ত্যাগ করিয়া সহজে আর অন্য মাংস খাইতে চায় না। মানুষ মারিতে যেমন ইহাদের পরিশ্রম করিতে হয় না, অন্যদিকে তেমনই ইহারা অত্যন্ত ধূর্ত্ত না হইলে মানুষ মরিতেও পারে না। মানুষের বুদ্ধির উপর ইহাদের কৌশল খাটাইতে পারিলে, তবে মানুষ শিকার করিতে পারে, দৈবাৎ আক্রান্ত হইয়া কোন সময় কোন বাঘ মানুষকে জখম করিলে, সে Man-eater হয় না। সাধারণতঃ ১০।১৫ জন লোক হত্যা করিবার পরই ইহারা নিহত হয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে একবার এক Man-eater ৭০০ শত লোক হত্যা করিয়া সে অঞ্চলে ত্রাস (panic) উৎপাদন করিয়াছিল।

বাঘ Man-eater হওয়ার সংবাদ পাইবামাত্রই, ইহাদিগকে শিকার করিবার জন্য, সরকার হইতে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। অনেক সময় অর্থলোভে 'বেচারা' শিকারীরা নিজের প্রাণ বলি দিয়াও অর্থাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করে। খুব সুচতুর ও সতর্ক শিকারী না হইলে ইহাদিগকে শিকার করিতে পারে না। ইহাদিগের চলাফেরা করার সময় কোন শব্দ হয় না। এমন কি বন নড়াও প্রায় অনুভূত হয় না। কাঠুরিয়াগণ দলবদ্ধ হইয়া কাঠ কাটিবার বা কাটা গাছ আনিবার জন্য যখন যাতায়াত করে, তখন বহু গাড়ী ও লোক থাকা সত্ত্বেও ইহারা অতি সন্তর্পণে আসিয়া পিছনের গাড়োয়ান বা লোকটিকে ধরিয়া লইয়া যায়। এই কার্য্যটি এত তৎপরতার সহিত ও সুকৌশলে সম্পন্ন করে যে, অগ্রবর্ত্তী লোকেরা অনেক সময় মোটে 'টেরই' পায় না। ইহারা সুবিধামত স্থানে মানুষ ধরার মতলবে, বহুদূর হইতে এই সব লোকের পাছু লইয়া থাকে। সম্মুখের লোক ধরিলে বিপদের আশঙ্কা আছে মনে করিয়া পাছের লোককে ধরে। অনেক সময় এমনও দেখা গিয়াছে, এক স্থানে একটি লোক হত্যা

করিয়া, তাহার ২।১ দিন পরেই ৫।৭ কি দশ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া আর একটিকে হত্যা করিয়াছে। এইরূপ ক্রমাগতই দূরে দূরে শিকার করিয়া, মানুষের চক্ষে ধূলি দিয়া ধূর্ত্ততার প্রকৃত পরিচয় দেয়। পাছে লোকে ইহাদের নির্দ্দিষ্টস্থান 'টের' পায়, এই জন্যই এত সতর্ক হয়। এক কথায় ইহাদের মত ধূর্ত্ত ও চালাক বাঘ অন্য কোন শ্রেণীতে হয় না। Man-eater Tiger এর সংখ্যা অতি অল্প।

Man-eater Tiger কিরূপ ধূর্ত্ত হয়, তাহা নিম্নের দুইটির বিবরণ হইতে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। বিখ্যাত শিকারী স্যার স্যামওয়েল বেকারের এদেশে শিকার করার সময় আসামের কোন স্থানে Man-eater এর উপদ্রবে ত্রাস উৎপন্ন হইয়াছিল। আসাম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই ব্যাঘ্র শিকারের জন্য প্রচুর পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। প্রথম প্রথম কিছুদিন স্যার স্যামুয়েল বেকার, বাঘটীকে মারিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যেখান হইতেই তিনি মানুষ মারার খবর পাইতেন, সেখানেই যাইয়া তিনি নিহত লোকটিকে দেখিয়া তন্নিকটস্থ কোন গাছে বা অন্যস্থানে লুকাইয়া থাকিতেন। কিন্তু তিনি ঐ নিহত লোকটীকে দেখিলে পর ব্যাঘ্র আর উহার ত্রিসীমানায় ঘেঁসিত না। বাঘ বেচারার শিকার করা, মাত্র সার হইত—উহা আর তাহার ভোগে আসিত না; কারণ সে বুঝিত যে, মানুষ তাহার পাছু নিয়াছে। ইহার কয়েকদিন পরেই আর একদিন একটি নর-হত্যার সংবাদ পাইয়া শিকারী বেকার ১০।১১ জন লোক সঙ্গে লইয়া, যে ঝোপের মধ্যে অর্দ্ধভুক্তাবস্থায় মৃতদেহটী পড়িয়াছিল, সেখানে ঢুকিয়া একটু পরেই মাত্র নিজে তথায় থাকিয়া, অপর লোকদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। উদ্দেশ্য—বাঘটিকে বুঝিতে দেওয়া যে, কতকগুলি লোক মৃতদেহটী খুঁজিতে গিয়াছিল এবং

তাহারাই ফিরিয়া গেল; একজন যে ভিতরে রহিয়া গেল, ইহা 'বাঘটি বুঝিতে না পারে। বাস্তবিক, তাহাই ঘটিয়াছিল। খানিক পরেই, বাঘটির ঐ ঝোপের দিকে, অতি সন্তর্পণে গা ঢাকিয়া আসিবার সময়, দূর হইতেই তিনি উহাকে শিকার করেন। ব্যাঘ্র মহাশয়ের অঙ্কশাস্ত্রে কিছুমাত্র জ্ঞান থাকিলে, ইহার উপর মানুষের এই চালাকি আর খাটিত না।

এইরূপ ছোটনাগপুরের কোন স্থানে, আর একটী বাঘ নর-ভুক্ (Man-eater) হইয়া ডাকবিভাগের ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিল। যে বনের মধ্য দিয়া ডাকের 'রাণার'গণ চলাচল করিত, বাঘটি প্রায়ই সেখানে 'ওৎ পাতিয়া থাকিয়া—কেবল রাণারকেই ধরিয়া নিত। ডাকের রাণারকে তাহার ঝুনঝুনি শব্দ শুনিয়াই ধরিত, কিন্তু অন্য লোক চলাচল করিবার সময় কিছুই বলিত না। ইহার জন্যও প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। ঐ রাস্তা দিয়া ডাক চলাচল বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। স্যার স্যামওয়েল বেকার বাঘটিকে মারিবার জন্য কয়েকদিন ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইবার পর, কোমরে ঘুঙ্গুর বাঁধিয়া রাণার সাজিয়া বহুচেষ্টায় বাঘটিকে মারিতে সমর্থ হন।

Leopard Panther এর মধ্যেও সময় সময় Man-eater দেখা যায়। ইহারা Tiger অপেক্ষা আরও ধূর্ত্ত হইয়া উঠে। লোকের বাড়ীর 'আনাচে কানাচে' অনেক সময় ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া, ইহাদের মানুষ ধরিবার সুযোগ বেশী। শিশু সন্তানও অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়েরা সন্ধ্যার পর হাত মুখ ধুইতে বাহিরে আসে বা মল মূত্রাদি ত্যাগের জন্য বাড়ীর পিছনের জঙ্গলে যায়; সেই সুযোগে ইহারা কার্য্যোদ্ধার করিয়া থাকে; কোন কোন সময়ে ছোট শিশু-সন্তানকে ঘরের বারান্দায় শোয়াইয়া রাখিয়া জননী গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে, ইহারা সুযোগ বুঝিয়া লইয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি

এইরূপ একটি শিকার করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসি, ছেলেটিকে যে কোথায় লইয়া গেল, তাহার আর কোন সন্ধানই করিতে পারিলাম না। কেবল একস্থানে একটু ন্যাকড়া ও রক্তের চিহ্ন পাইয়াছিলাম মাত্র। বাঘ না পাইয়া থাকিলেও আমার যাওয়াতে এই উপকার হইয়াছিল যে, ঐ গ্রামেও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে পরে আর বাঘের উপদ্রবের কথা শোনা যায় নাই।

অন্য স্থানে একটী Man-eater leopard মারিয়াছিলাম; এই প্রসঙ্গে গল্পটি বলিতেছি।

১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে মুক্তাগাছার ৫।৬ মাইল পশ্চিমে বড়গ্রাম নামক একস্থানে, একটি leopard, man-eater হইয়া অনেকগুলি শিশু ও বালক হত্যা করে। যথা সময় খবর পাইলেও, হাতী আনাইয়া যাইতে আমাদের কয়েকদিন বিলম্ব হইয়া পড়িল। ইহার ফলে হত্যার মাত্রাও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাস্তবিক এই জন্য আমরা নিজেরাও অনুতপ্ত। কিন্তু কি করিব—যাওয়ার কোনই উপায় ছিল না; তখনও আমি হাঁটিয়া শিকার আরম্ভ করি নাই, কাযেই উহাতে অভ্যস্ত ছিলাম না। কিন্তু আমার হাঁটিয়া শিকার করার অভিজ্ঞতা লাভের পরে, এরূপ ঘটিলে তিলার্দ্ধও দেরী করিতাম না।

যাহা হউক, পিলখানা হইতে হাতী আসিয়া পৌঁছান-মাত্রই, আমি ও শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় দুই হাওদায়, আরও কয়েকটা জঙ্গলভাঙ্গা হাতী (Beater elephants) সহ শিকার করিতে যাই। গ্রামে পৌঁছিয়াই শুনিলাম, সেই দিনও প্রাতে ঐ গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী একটী খাল দিয়া, এক বৈরাগী বালক তাহার জননীকে লইয়া, নৌকা বাহিয়া যাইতেছিল, খালের পার্শ্ববর্ত্তী ঝোপ হইতে বাঘটি নৌকার উপর লাফাইয়া পড়িয়া, ছেলেটিকে

ধরিয়া নিয়া গিয়াছে। এত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত এই কার্য্য করিয়াছিল যে, বালকটী 'টু' শব্দও করিতে পারে নাই। ছেলেটিকে ধরিয়া ঝপ্ করিয়া জলে পড়ার শব্দে, তাহার মা টের পায়। এখনও তাহার মাতার তখনকার সেই মর্ম্মস্পর্শী করুণ আর্ত্তনাদের কথা স্মরণ হইলে, অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। আমরা বহু চেষ্টায় হাতী দিয়া বাঘটিকে বাহির করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া, গ্রামস্থ লোকদিগকে বহু উত্তেজনায় জঙ্গলে ঢুকাইয়া, তবে শিকার করিতে পারি। যদি ঐ সমস্ত লোক সংগ্রহ করিতে না পারিতাম, তবে আর বাঘটিকে শিকার করিতে পারিতাম না। কারণ উহা একটি বটগাছের শিকড়ের নিম্নস্থ গর্ত্তে লুকাইয়াছিল। আমরা হাতী লইয়া, ঐ স্থান দিয়া বারম্বার যাতায়াতেও সাড়া দেয় নাই।

পূর্ব্বে man eater tiger প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, উহারা পিছনের লোক ধরিয়া নেয়; বৈরাগী-বালককেও পিছন হইতে নেওয়াতে তাহাই উপলব্ধি হয়। কাযেই সকল শ্রেণীর বাঘই, man-eater হইলে, তাহাদের প্রকৃতিও প্রায় অভিন্ন হয়।

অনেক সময়, ক্রমাগত কয়েক দিন আহার না জুটিলে টাইগার (Tiger) ও লেপার্ড (Leopard) মরা গরুর শুক্না হাড়ও চিবাইয়া খায়। কুকুর যেরূপ দুই পায় চাপিয়া ধরিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া হাড় কামড়াইতে থাকে, একটি লেপার্ডকে আমি সেই অবস্থায় হাড় চিবাইবার সময় শিকার করিয়াছিলাম। জঙ্গলে ঢুকিয়া, দূর হইতেই বনের মধ্যে 'কড়মড়' শব্দ শুনিয়া, নিকটে গিয়া দেখিলাম, একটী লেপার্ড হাড় কামড়াইতেছে। ক্ষুধার তাড়নায়ই হউক, অথবা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত চিবাইতেছিল বলিয়াই হউক, আমি যে এত নিকটে গিয়া পড়িয়াছি, তাহা সে একেবারেই টের পায় নাই। বলা বাহুল্য, অতঃপর তাহার মুখের হাড় মুখেই রহিয়া গেল।

অনেকের ধারণা, বাঘ উহাদের শিকার পিঠের উপর ফেলিয়া লইয়া যায়, ইহা অত্যন্ত ভুল।

বিড়াল যেরূপ ইঁদুর ধরিয়া লয়, ইহারাও তদ্রূপ শিকার ধরিয়া, শূন্যে উঠাইয়া, লইয়া যায়। এই জন্যই শিকার লইয়া গেলে, তাহার কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। কোন কোন সময় শিকার অত্যন্ত ভারী হইলে, কামড়াইয়া ধরিয়া, ক্রমাগত 'ছেঁচড়াইয়া' টানিয়া লইয়া যায়; সেই সব স্থানে বনের মধ্যে চিহ্ন পাওয়া যায়। অনেক স্থানে, বনের মধ্যে এক দেড় মাইল দূরেও লইয়া যায়; ঐ সময় রাস্তায় যে সব খাল, নালা ও তাহাদের উঁচু পাড় সম্মুখে পড়ে, তাহা শিকার সমেত অনায়াসে পার হয়। অনেক স্থলে, শিকার করিয়া নিকটে কোন ভাল জঙ্গল পাইলে, সেইখানে উহা রাখিয়া দেয়। শিকার রক্ষা (preserve) করিবার পদ্ধতি ইহাদের অতি সুন্দর। বনের মধ্যে লতা পাতা ও ঘাস দিয়া ভুক্তাবশিষ্ট আহার্য্য সামগ্রী সময়ান্তরে খাইবে বলিয়া, ঢাকিয়া রাখে। কাক বা শকুনি দ্বারা অপচয় না হয়, ইহাই উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশে পাথরঘাটা নামক স্থানের শালবনে (আমাদের দেশে শালবনকে 'গজারী গড়া' বলে) শিকার করিতে বাহির হইয়া, এক স্থানে সাত আট্‌টা মরি (kill) ঢাকা অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। তখনও একটী মরির গলার ছিদ্র দিয়া অল্প অল্প চোঁয়াইয়া রক্ত পড়িতেছিল। কিন্তু সবগুলি মরিই শালপাতা ও বন জঙ্গল দিয়া ভালরূপে ঢাকা ছিল। আমরা ঐ সব মরির নিকটবর্ত্তী বহু স্থান সন্ধান করিয়াও, বাঘ না পাইয়া, আমাদের গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলাম। সেদিন আমরা অন্য স্থানে যাইবার জন্যই বাহির হইয়া ছিলাম। অপরাহ্ণে পুনরায় ঐ স্থান দিয়া ফিরিবার সময় দেখা গেল, প্রত্যেকটী মরিই, স্থানান্তরিত হইয়া আবার ঢাকা অবস্থায় রহিয়াছে। ইহাদ্বারা, তখন এই বুঝিয়াছিলাম যে, প্রাতে আমাদের

সাড়া পাইয়াই, বাঘটা অনেকদূর চলিয়া গিয়াছিল; অথবা সে এমন কোন ছোট জঙ্গলে ছিল যেখানে আমরা তাহার অস্তিত্ব সন্দেহই করিতে পারি নাই। তখন অসময় বলিয়া আর না ঘাটাইয়া তাঁবুতে ফিরিয়া গেলাম।

পরদিন প্রত্যূষে, পুনরায় লোক পাঠাইয়া দেখা গেল, মরিগুলিকে আবার সরাইয়া রাখিয়াছে। সেদিন আসিয়াও বাঘের সন্ধান পাই নাই। কিন্তু তাঁবুতে ফিরিবার সময়, আমার সুচতুর ভৃত্য রবি ও হাতীর দারোগা আস্রাবালী খাঁকে ২টী বন্দুক দিয়া, দুই গাছে উঠাইয়া, রাখিয়া যাই। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে না আসিতেই, শুষ্ক পত্রের উপর মচ্‌মচ্‌ শব্দে বাঘ আসিতেছে মনে করিয়া, দূর হইতেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া, আস্রবালী বন্দুক আওয়াজ করিয়া দেয়। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, আওয়াজের প্রতিধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতেই, হড়মড় করিয়া বাঘের পলাইবার শব্দও তাহারা শুনিতে পায়। খানিক পরে চারিদিক নিস্তব্ধ হইলে, তাহারা ক্যাম্পে ফিরিয়া আইসে। নিকটেই গ্রাম, তাহাদের জন্য একটী হাতী রাখা হইয়াছিল। ইহারা যদি সাহস করিয়া আর কিছুকাল থাকিতে পারিত, তবে নিশ্চয়ই বিফল হইত না। পরদিন আবার লোক পাঠাইয়া অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, 'মরি' গুলিতে শকুন পড়িয়াছে। বোধ হয় ক্রমাগত উত্যক্ত (disturbed) হওয়াতে বাঘ ঐ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিল।

বাঘ কোন কারণে, তাড়া পাইয়া মরির নিকট হইতে সরিয়া গেলেই, মরিতে শকুন পড়ে; তখন আর উহা বাঘ স্পর্শ করে না। কিন্তু বাঘ মরির নিকটে থাকিলে, কাক বা শকুন কিছুই পড়িতে দেয় না; দুই একটা পড়িতে চেষ্টা করিলেও, উহাদের তাড়াইয়া দেয়। কোন কোন সময় দুই একটা মৃত শকুনও মরির নিকট দেখা যায়।

মুচিরা অত্যন্ত লোভী ও দুর্দ্ধর্ষ লোক। কোন স্থানে মরির সংবাদ পাওয়া মাত্রই, ইহারা সেই স্থান যতই দুর্গম হউক না কেন, ঠিক যাইয়া হাজির হয়। দূর হইতে ঢিল ছুড়িয়া বা 'হো হা' করিয়া চেঁচাইয়া, যে কোন উপায়েই হউক, বাঘ তাড়াইয়া মরির চামড়া খুলিয়া আনিবেই। চামড়া খুলিয়া আনিলে পর, বাঘ আর সে মরি স্পর্শ করে না; তখন কাক শকুনের ফলার জোটে।

মুচিদের যন্ত্রণায়, অনেক সময়, শিকার করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। দুই এক স্থলে এই সব মুচিদের খুব শাসন করিয়া, তবে শিকার করিতে পারিয়াছি।

অনেকেরই ধারণা বাঘ ১০।১২ হাত লম্বা হয়। কেহ কেহ ১৩ হাত লম্বা বাঘ দেখিয়াছেন বলিয়া, গল্প করিতেও ছাড়েন না। তখন প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিলে, অত্যন্ত বিরক্তও হন দেখিতে পাই; বলা বাহুল্য, ইহা একেবারে মিথ্যা কথা। জানি না, যে যুগে হাতীর পরিবর্ত্তে ম্যামথ্ (mammoth) ছিল, সেই যুগের বাঘ বার তের হাত হইলে হইতে পারে। সাধারণতঃ বাঘ (Tiger) ৯ কি ৯॥• ফিটের মধ্যেই দেখা যায়, ইহাই বেশ বড় আকারের (full grown) বাঘ। ১০ ফিট কি তদূর্দ্ধ বাঘ, শিকারীর গৌরব বর্দ্ধন করে সত্য, কিন্তু তাহার সংখ্যা খুব কম। আমি নিজে ১০ ফিট ২ ইঞ্চি বাঘ মারিয়াছি। আমাদের শিকার পার্টিতে, এই আকারের বাঘ আরও মারা পড়িয়াছে। ১০ ফিট ৪ ইঞ্চির ঊর্দ্ধে বাঘ বড় একটা দেখা যায় না। শুনিয়াছি, কুচবিহারের শিকার তালিকায় (calendar) ইহা অপেক্ষা বড় ২।১টী বাঘের উল্লেখ (record) আছে।

শিকার হইয়া গেলে, তখন তখনই মাপ লওয়ার নিয়ম। ২।৪ ঘণ্টা পরে শক্ত (Stiff) হইয়া গেলে, মাপ লইলে ঠিক হয় না। অনেকে ছাল ছাড়াইয়া লইয়াও, মাপ নিয়া থাকেন, তাহাও বিশুদ্ধ হয় না। বাঘটীকে লম্বা করিয়া শোয়াইয়া, নাকের ডগা (অগ্রভাগ)

হইতে, মাথা ও পিঠের উপর দিয়া ফিতা ঘুরাইয়া লেজের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত (from the tip of the nose to the end of the tail) মাপ লওয়াই নিয়ম। বাঘ শিকার করিয়া ওজন করাও নিয়ম। কিন্তু সর্ব্বদা সে সুবিধা হয় না বলিয়া, অনেক স্থানেই ইহা লওয়ার চেষ্টা করা হয় না। ওজন সম্বন্ধে, আমার অনেক শিকারীর সহিত মতদ্বৈধ আছে। কারণ সচরাচর বাঘ একটি মরিকে ৩।৪ দিন ধরিয়া আস্তে আস্তে আয়েস করিয়া খায়। উরু বা বুক হইতে, ইহারা প্রথম খাওয়া সুরু করে। 'মরি' বৃহদাকার ষণ্ড বা গাভী হইলে, তাহার ককুদ (haunch) বা স্তন (ওলন—udder) হইতে খাইতে আরম্ভ করে। কোন কোন সময় বাঘ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইলে, একটি প্রকাণ্ড ষাঁড়ের কেবল খুর ও মস্তক ব্যতীত, একদিনে সমস্ত নিঃশেষ করিয়া ফেলে। এই অবস্থায় মারা পড়িলে, যে ওজন হইবে, তাহা প্রকৃত বলিয়া আমার ধারণা নয়। কিন্তু অনেকে একথা স্বীকার করিতে চান না। ২।৩ দিন রীতিমত আহার করিবার পর, শিকার করিলে যে ওজন হইবে, তাহা কতকটা ঠিক বলিয়া ধরিলেও ধরা যায়।

কোন কোন বিষয়ে লেপার্ড (Leopard) ও প্যান্থার (Panther) এর সহিত, টাইগার (Tiger) এর চরিত্রগত সাদৃশ্য থাকিলেও, কোন কোন বিষয়ে পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়।

আকারের পার্থক্য দিয়া লেপার্ড ও প্যান্থারের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। পান্থ্যার, লেপার্ড অপেক্ষা আকারে কিছু বড়, গুলেও (spot) সাধারণতঃ কিছু পার্থক্য থাকে। লেপার্ডের গুল, ঘন সন্নিবিষ্ট ও ভিতরের দিকে অপেক্ষাকৃত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ; প্যান্থারের গুল তত ঘন হয় না। ইহা ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য আছে কি না তাহা প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের বিচারের বিষয়। ইহাদের কিন্তু উভয়েরই লেজ, টাইগার অপেক্ষা শরীরের তুলনায় অনেক বড়। ইহাদিগকে

াঙ্গলার বহুস্থানে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও অল্প বিস্তর দেখা ায়। দেশভেদে ইহারা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। আকারে াইগার অপেক্ষা ছোট হইলেও, ইহারা সৌন্দর্য্যেও পরিচ্ছন্নতায় :শ্রেষ্ঠ। কোন সময়ই গায়ে কাদা বা মাটি থাকিতে দেয় না। লেপার্ড দৈর্ঘ্যে ৭ ফিট ৪।৫ ইঞ্চি, কি বড় জোর ৭৷৷৹ ফিটের অধিক কদাচিৎ ড় হয়।

ইহারা বড় জঙ্গলে প্রায়ই থাকে না, সচরাচর গ্রাম্য জঙ্গলে াকিতে ভালবাসে। বড় গরু ইহারা ধরে না, ছোট বাছুর ও গ্রাম্য কুকুরই ইহাদের প্রিয় খাদ্য। কদাচিৎ প্রকাণ্ড গাভী ষা াঁড়ও শিকার করিয়া ফেলে। বোধ হয় ইহারা নিজেদের সামর্থ্য ুঝিয়াই শিকার করিবার চেষ্টা করে। ক্ষুধার জ্বালায় নিতান্ত অস্থির না হইলে, বোধ হয় বড় গরু ধরে না। গ্রামের মধ্যে অনেক সময় ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া, মানুষকে বড় ভয় করে না। াইগারের সহিত ইহাদের ডাকেরও পার্থক্য আছে। টাইগার হালুম' 'হালুম' করিয়া ডাকে। শব্দও খুব গম্ভীর এবং বহুদূর হইতে শোনা যায়। কিন্তু লেপার্ডগুলি 'হ্যাক্‌র হ্যাঁক্‌র' করিয়া ডাকে; এই জন্যই আমাদের অঞ্চলে টাইগারকে 'হালুম' বাঘ ও লেপার্ডকে 'হ্যাঁকা' বাঘ বলে। লেপার্ডের ডাকের শব্দ কতকটা করাত দিয়া কাঠ চেরার শব্দের মত। অনেক সময় ঘটিতে মুখ দিয়া ছেলেপিলেরা লেপার্ডের 'হ্যাঁক্‌র হ্যাঁক্‌র' ডাকের অনুকরণ করে।

অত্যন্ত বর্ষার সময় বা নীচে অপ্রচুর জঙ্গল থাকিলে, লেপার্ডকে কখনও কখনও গাছে চড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। টাইগার অপেক্ষা ইহারা বৃক্ষারোহণে অধিকতর পটু। সাধারণতঃ ইহারা বেত ও কাঁটা জঙ্গল পছন্দ করে। ইহারাও যোড়ায় যোড়ায় থাকে এবং অনেক সময় গ্রাম্য জঙ্গলেই প্রসব করে। টাইগার ও লেপার্ড সাধারণতঃ ২টী

বাচ্ছা প্রসব করে ; কোন কোন সময় ৩।৪টীও প্রসব করিতে দেখা যায়। শাবক স্তন্যপান ত্যাগ করিলে, কিছুদিন মাতা, ভুক্ত খাদ্য বমন করিয়া শাবকদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। তারপর শাবকগুলি মাংস খাইতে অভ্যাস করে। প্রথম প্রথম ইহাদিগকে মাতা লেজ নাড়িয়া 'খাপ' ধরা শিক্ষা দেয়। গৃহপালিত বিড়ালের মধ্যে ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায়। ইহার পরই ব্যাং, গোসাপ ইত্যাদি ধরিয়াই, ইহাদের শিকারের 'বর্ণপরিচয়' হয় ; এইরূপে বাল্যশিক্ষা শেষ করিয়া, ক্রমে উচ্চশ্রেণীতে প্রোমোশন পাইতে থাকে।

. লেপার্ড ও টাইগার, সন্তরণেও বেশ পটু। ইহাদের সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে যে, কোন খরস্রোতা নদী পার হইবার সময়, স্রোতের টানে ভাসিয়া গেলে, পুনরায় পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া, সোজাসুজি পার হইবার চেষ্টা করে। ইহাও ভুল, কারণ অনেক স্থলে নদীর এক পারে জলে নামিবার ও ভাটিতে অপর পারে জল হইতে উঠিবার চিহ্নও দেখা যায়।

কোন কোন সময় শিকার না জুটিলে, লেপার্ড মাছও খায়। আমাদের অঞ্চলে, বর্ষার সময় নদী বিল প্রভৃতিতে বাঁধ দিয়া, গৃহস্থেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 'চাই' বা 'বাইর' পাতিয়া মাছ ধরে। এই সব 'বাইর' বাঁশের মোটা মোটা চটা দিয়া তৈয়ারী হইয়া থাকে। ইহাতে বড় বড় মাছ ধরা পড়ে। ব্রহ্মপুত্রের এক খালে একবার ঐরূপ এক 'বাইরে' মাছের লোভে এক লেপার্ড প্রবেশ করিয়া, আর বাহির হইতে পারে নাই। প্রাতে বাঁধের মালিক আসিয়া মাছের পরিবর্ত্তে ব্যাঘ্র মহাশয়কে আট্‌কিয়া থাকিতে দেখিয়া, গ্রাম হইতে কোঁচ, টেটা সহ লোকজন আনিয়া বাইরের মধ্যেই উহার মাছখাওয়ার সখ মিটাইয়া দেয়।

ব্রহ্মপুত্র নদে ইহা অপেক্ষা আরও অদ্ভুত একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। ই, বি, রেলওয়ের বিদ্যাগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট কুষ্ঠিয়া গ্রামে,

ব্রহ্মপুত্রে মাছধরার জন্য এক ব্যক্তি প্রায় একটি বাঁশের মত কঞ্চির ছিপে, খুব বড় বঁড়শীতে জিওল মাছ গাঁথিয়া রাখিয়াছিল। সর্ব্বত্রই বর্ষাকালে বড় বড় চাইন, বোয়াল ইত্যাদি মাছ ধরার জন্য এইরূপ বঁড়শী ফেলিয়া রাখিতে দেখা যায়। প্রাতে বঁড়শী তুলিবার জন্য, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি আসিয়া দেখে যে, মাছের পরিবর্ত্তে একটি বাঘ বঁড়শীতে আট্‌কিয়া আছে। ব্যাঘ্রটি বঁড়শী সমেত জিওল মাছ একেবারে গিলিয়া ফেলায়, এই অবস্থা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে ঐ ব্যক্তি অতঃপর লোকজন সংগ্রহ করিয়া উহার ব্যাঘ্রলীলা শেষ করিয়া দেয়।

লেপার্ডের মত ছোট আকারের আর এক রকম জীব আছে; উহাদিগকে fishing cat বলে। অনভিজ্ঞেরা অনেক সময় উহাদিগকে ছোটজাতীয় লেপার্ড বলিয়া ভ্রম করে। উহাদের গায়ের রং একটু কাল্‌চে এবং গুল (spot) অপেক্ষাকৃত ছোট ও সম্পূর্ণ কালো হয়। লেপার্ড ও প্যান্থারের গুলের সহিত ইহাদের পার্থক্য এই যে, ইহাদের গুল সম্পূর্ণ কাল, লেপার্ড ও প্যান্থারের গুল পীতবর্ণ চামড়ার উপর কাল আংটীর মত (ring-shaped) দেখায়।

লেপার্ড ও প্যান্থার ব্যতীত 'চিতা' নামক আর একপ্রকার বাঘ আছে; উহাদিগকে 'হাণ্টিং' লেপার্ড বলে। উহারা দৈর্ঘ্যে একটু ছোট হইলেও, উচ্চতায় সাধারণ লেপার্ড অপেক্ষা কিছু বড়। ইহাদের গুল ও 'ফিশিং ক্যাট'এর গুলের মত। ইহাদের পায়ে থাবা নাই, শৃগাল-কুকুরের মত নখ বাহির করা। ইহারা বেশ পোষ মানে। কুকুরের মত শিকল দিয়া বাঁধিয়া লইয়া পালকেরা সর্ব্বত্র বেড়ায়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইহাদ্বারা শিকার করার পদ্ধতি এখনও প্রচলিত আছে। মাঠে, যেখানে কাল হরিণ (Black Bucks) দেখা যায়, তাহার খানিক দূর হইতে উহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে, উহারা একবার ভাল করিয়া দেখিয়াই, মাটীর সঙ্গে 'লুটি মারিয়া' এমনভাবে যাইতে থাকে

যে, দূর হইতে হরিণগুলি কিছুই টের পায় না। কাছাকাছি আয়ত্তের মধ্যে গিয়াই ভয়ানক জোরে লাফ দিয়া শিকারের উপর পড়ে, তখন পালকেরা যাইয়া বহু কষ্টে ঐ হরিণের কোন স্থান হইতে এক টুকরা মাংস কাটিয়া উহাকে দিয়া ছাড়াইয়া লয়। সাধারণতঃ ইহাদিগকে লইয়া চলিবার সময় চক্ষে ঠুলি পরাইয়া দেওয়া হয়।

লোকালয়ে থাকে বলিয়া, অনেক সময় লেপার্ড গৃহস্থের বেড়া ভাঙ্গিয়া, গোয়াল হইতে ছোট ছোট বাছুরও ধরিয়া লয়, এই সব কারণে ইহাদের সাহসও অত্যন্ত বেশী। এই জন্য ইহাদের খোঁয়াড বানাইয়া ধরা সহজ। আমি মুক্তাগাছার নিকটবর্ত্তী ঘোষবাড়ী গ্রামে দুইবার দুইটীকে এই ভাবে ধরিয়াছিলাম। হাত চারেক লম্বা ও হাত দুই আন্দাজ প্রস্থ করিয়া, মোটা বাঁশ চিরিয়া 'ফাল্‌টা' বানাইয়া তাহা বেশ ঘন করিয়া পুতিয়া যাহাতে উহাদের হাত প্রবেশ না করে, এই-রূপ মজবুত করিয়া খোয়াড় প্রস্তুত করিতে হয়। উপরে টিন বা তক্তা দিয়া বন্ধ করিয়া, জঙ্গল ঢাকা দিয়া রাখা হয়। ভিতরে ছাগল রাখিবার জন্য ছোট করিয়া পার্টিসন দিয়া একটী কুঠুরী তৈয়ার হয় এবং ইন্দুরের কলের দরজার মত তক্তা দিয়া একটি দরজাও করিতে হয়।

দুই একদিন উহার ভিতর ছাগল কি ভেড়া রাখিয়া দিলেই খাওয়ার লোভে বাঘ উহাতে গিয়া পড়ে। গোয়াল ইত্যাদি হইতে অনেক সময় বাছুর লয় বলিয়া, ইহাদের সাহসের মাত্রাও বাড়িয়া যায়, কাযেই খোঁয়াড়ে ঢুকিতে ইহারা দ্বিধা বোধ করে না।

এইরূপে ধৃত একটি মাদী লেপার্ড আমি বাড়ী আনিয়া অনেকদিন পুষিয়াছিলাম। কিছুদিন পরে এমন পোষ মানিয়াছিল যে, বাহির হইতে তাহাকে 'সুন্দরী' বলিয়া ডাক দিলে, খাচার শিকের নিকট মুখ বাড়াইয়া দিত, তখন বাহির হইতে উহার মুখে হাত দেওয়া যাইত। কিছুদিন পরে আমি উহাকে কলিকাতার বিখ্যাত ধনী Ezra

সাহেবকে দিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ীর প্রায় সকলেই উহার মুখে হাত দিতে পারিত। কিন্তু ৺গঙ্গাচরণ লাহিড়া নামক এক ভদ্রলোক আমাদের বাড়ী থাকিতেন; তাঁহার সঙ্গে উহার কেমন আড়ি ছিল যে তিনি নিকটে গিয়া 'সুন্দরী' বলিয়া ডাক দিয়া তাঁহার দীর্ঘ শ্মশ্রু নাড়া দিলেই ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিত; তখন আর আমাদের কাহাকেও মানিত না। ইহার কারণ আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

ইহাদিগের শিকার করিয়া খাইবার পদ্ধতি অতি চমৎকার। মধ্যে মধ্যে আমরা খাঁচায় ছাগল দিয়া দেখিয়াছি যে ঐ স্বল্পায়তন স্থানেই রীতিমত 'খাপ' পাতিয়া ছাগলের টুটি কামড়াইয়া ধরিত। একেবারে মারিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত আর তাহাকে ছাড়িত না। প্রথম উহার রক্ত চাটিয়া খাইয়া ফেলিত, পরে উহার পেটের ১০।১২ আঙ্গুল পরিমিত স্থানের লোম, কামড়াইয়া কামাড়াইয়া এমনভাবে তুলিয়া পরিষ্কার করিত যে স্থানটী দেখিতে ঠিক আজকালকার বাবুদের ক্লিপ দিয়া ছাটা মস্তকের চামড়া দেখা যাওয়ার মত হইত। উহার মুখের ভিতর যে লোম প্রবেশ করিত, তাহা জিভ দিয়া এমন ভাবে পরিষ্কার করিত যে, একটী লোমও মুখে থাকিত না। পরে মুখ কাত করিয়া পরিষ্কৃত স্থানটি এমন ভাবে কামড়াইয়া, চামড়া কাটিয়া ফেলিত যে ঠিক ছুরি দিয়া কাটার মত (incision) হইত। ঐ incision এর উভয় পার্শ্বে পা দিয়া এমন ভাবে চাপা দিত যে, উহার নাড়িভুড়িগুলি বাহির হইয়া পড়িত। কোন কোন সময় ঐ কাটা স্থান দিয়া মুখ প্রবেশ করাইয়া, প্লীহা যকৃতও খাইত। তাহাতে মুখে যে রক্ত লাগিত, উহা জিভ্ দিয়া চাটিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া ফেলিত।

একটা প্রচলিত কথা আছে যে ক্ষুধার চোটে বাঘে ধান খায়। বাস্তবিক বাঘে ধান খাক্ আর নাই খাক্, আমার জানিত কোন স্থানে

একটী খোঁয়াড়ে এক যোড়া লেপার্ড পোষা হইত। প্রথম প্রথম উহাদের আহারের বেশ সুব্যবস্থা ছিল। পরে পালকের অমনোযোগে কিছুদিন উহাদিগকে আহার দেওয়া হয় নাই। ফলে একদিন দেখা গেল ক্ষুধার জ্বালায় বাঘিনীকে বাঘে মারিয়া খাইতেছে।

আর একটী হাস্যোদ্দীপক গল্প এখানে বলিতেছি। কোন বিশিষ্ট স্থানে, তত্রত্য বড় লোকের একটী পোষা টাইগার ছিল। তাঁহার 'লড়াইয়ে' ভেড়ারও খুব সখ ছিল। হঠাৎ একদিন একটি ভেড়া ছুটিয়া, তাঁহার সুয়োরাণীর প্রিয় দাসীর হাঁটুতে ঢুঁ দিয়া জখম করিয়া ফেলে। রাজার নিকট সেই অভিযোগ পৌঁছিলে, তিনি বিচার করিয়া এই গুরুতর অপরাধের জন্য ঐ ভেড়ার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া, উহাকে বাঘের মুখে সমর্পণের ব্যবস্থা করিলেন। রাজাদেশ পালিত হইলে, ভেড়া বেচারার মনের ভাব যে কি হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করা ছাড়া বুঝিবার উপায় নাই। বাঘটি ভেড়াকে পাইয়াই যখন উহাকে ধরিবার জন্য, এক কোণে 'খাপ' পাতে, তখন বেচারা ভেড়া, নিরুপায় হইয়া আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া, ক্রমাগত পিছু হটিতে থাকে। যে মুহূর্ত্তে দেওয়ালে উহার পিছন ঠেকিল, ভয়ঙ্কর বেগে ধাবিত হইয়া, শেষ চেষ্টা করিবার জন্য, বাঘের মাথায় এমন প্রচণ্ড বেগে ঢুঁ মারে যে, তাহাতে উহাকে একেবারে সরিষার ফুল দেখাইয়া দেয়। ইহার পরই বাঘের লাফালাফিতে, ঐ গৃহের চতুর্দ্দিক বিষম আলোড়িত হইয়া উঠিল। ভেড়া যে দিকে যায়, বাঘও তাহার বিপরীত দিকে পলায়; সে আর কিছুতেই ভেড়াটীকে ধরিতে সাহস করে না। দুনিয়াই শক্তের ভক্ত। কিন্তু মহারাজের ন্যায় বিচারে, ইহার প্রাণদণ্ডের আদেশ লঙ্ঘন হইতে পারে না বলিয়া, পরদিন পুনরায় উহার চারি পা বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

সর্ব্বত্রই দেখা যায় আত্মশক্তি ছাড়া আত্মরক্ষা হয় না। সব যুগেই সর্ব্বত্র, দুর্ব্বলে সবলে এই সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। যেখানে

বানর ধরিয়া খাইবার জন্য বাঘ নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া আছে

আত্মশক্তির বিকাশ হয়, সেইখানেই রক্ষা পাওয়া যায়, অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য্য।

এইরূপে একটী ঘোড়ার দ্বারা একটী বাঘিনী (tigress) কিরূপে জব্দ হইয়াছিল, তাহা স্থানান্তরে বলিব।

বানরগুলি সাধারণতঃ অত্যন্ত দুষ্ট জীব। লেপার্ডগুলি কিন্তু, ধূর্ত্ততায় ইহাদিগকেও অনেক সময় পরাস্ত করে। বানরের স্বভাবই এই যে, বাঘ দেখিলেই তাহার পিছু নেয়। বাঘ চলিবার সময় বানরগুলিও উপরে উপরে গাছের ডালে ডালে লাফাইতে লাফাইতে অব্যক্ত শব্দ করিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে যায়। লেপার্ডগুলিও এমনি ধূর্ত্ত যে কখন কখনও ঘুমাইবার ভান করিয়া, মাথা গুজিয়া পড়িয়া থাকে; বানরগুলি তখন দূর হইতে উঁকি ঝুঁকি দিয়া আস্তে আস্তে নিকটে আসিতে থাকে। কোন কোনটী বা সত্যই ঘুমাইয়া আছে কি না তাহা পরীক্ষার্থ, খুব নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। এদিকেও ধূর্ত্ত বাঘ চোখ মিট্ মিট্ করিয়া উহাদের কার্য্য কলাপ দেখিতে থাকে। যখনই তাহার আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে মনে করে, তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া খপ্ করিয়া এইটিকে ধরিয়া ফেলে।

আমাদের জমিদারীর অন্তর্গত জয়পুর গ্রামে, হনুমান শ্রেণীর আর এক প্রকার বানর আছে; উহাদিগকে 'আঙ্গুল' বলে। ইহাদিগকে সময় সময় এই প্রকারে, লেপার্ড কর্ত্তৃক হত হইতে দেখা যায়।

লেপার্ড ও টাইগারের মাঝামাঝি আর এক শ্রেণীর বাঘ আছে, তাহাদিগকে জাগুয়ার (jaguar) বলে; উহাদিগকে আমেরিকায় পাওয়া যায়। টাইগার অপেক্ষা ইহারা বড় না হইলেও, প্রতিযোগীতায় ২।১ ধাক্কা সামলাইতে পারে। এই জন্যই এই গুলিকে অনেকে 'আমেরিকান টাইগার' বলিয়া অভিহিত করে। কলিকাতা

পশুপালায় অনেক সময় ইহাদিগকে দেখা যায়। লেপার্ডের সঙ্গে ইহাদের মুখের ও গুলের পার্থক্য আছে। লেপার্ডের মুখ ও মাথা একটু লম্বা, কিন্তু জাগুয়ারের মুখ, মাথা একটু গোল ছাঁচের হয়; আর গুলও লেপার্ডের গুল অপেক্ষা, যেন একটু বড় বলিয়াই মনে হয়।

এতদ্দেশে কোন কোন স্থানে, 'ব্ল্যাক লেপার্ড' নামক আর এক রকম বাঘ আছে। তাহারা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও একটু ছিপ্‌ছিপে রকমের হয়। ইহাদের চক্‌চকে কাল চামড়ার মধ্যে, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ গুল থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে পাবনা অঞ্চলে এইরূপ একটি বাঘ খোঁয়াড়ে ধরিয়া, পাবনা টাউনে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। পশুশালায় এগুলি সর্ব্বদা দেখা যায়।

আমাদের দেশে আর এক রকম ছোট জাতীয় বাঘ আছে তাহাদিগকে 'ফুলেশ্বরী' বাঘ বলে। উহারা অনেক সময় গাছে চড়িয়া থাকিতে ভালবাসে। বাস্তবিক 'ফুলেশ্বরী'রা যে নামেই অভিহিত হউক, উহারাও ছোট জাতীয় লেপার্ড।

সাধারণতঃ ভল্লুককে, নানা স্থানে নানা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ইহাকে ভালুক এবং পশ্চিম ও অন্যান্য প্রদেশে, কোথাও 'ভাল্' কোথাও বা 'ভালু' বলে।

ভালুক সাধারণতঃ পাহাড়ীয়া স্থানই ভালবাসে। ইহাদিগকে বাঙ্গলার কোন কোনও স্থানে, এবং আসাম উড়িষ্যা এবং ছোট নাগপুরের পর্ব্বত সমাকুল স্থানে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার ভালুক সচরাচর একটু ছোট আকারের এবং নাগপুর ও অন্যান্য কোন কোনও প্রদেশের ভালুক অপেক্ষাকৃত বড় আকারের হয়। কোন কোনও প্রদেশে ইহাদের সংখ্যা এত প্রচুর যে, প্রায় যেখানে সেখানেই দেখা যায়।

দিনের বেলায় ইহারা পাহাড়ের গহ্বরে, বা গভীর জঙ্গলে, প্রায়ই

ঘুমাইয়া কাটায়। দিনে চলা ফেরা ইহাদের স্বভাব নয়; তবে সময় সময় আকস্মিক কারণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, দিনেও চলা ফেরা করিতে বাধ্য হয়।

দিন রাত্রির মধ্যে বহুবার ইহারা এক এক স্থানে নির্জ্জীবের মত পড়িয়া থাকিয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া কোঁকাইতে থাকে; তাই ইহাদের জ্বর হয় বলিয়া, সাধারণ লোকের ধারণা। আমাদের দেশে যে সব ম্যালেরিয়া জ্বর খুব কম্প দিয়া হইয়া অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়, উহাদের ঐ জ্বরের সহিত লোকে উপমা দিয়া 'ভাল্‌কা জ্বর' বলে। এখানকার সাধারণ লোকের অন্ধ বিশ্বাস আছে যে, ঐসব জ্বরো রোগীর গলায় ভালুকের লোমের মাদুলি পরাইয়া দিলে জ্বর আরাম হয়। আমার বাড়ীতে কতকগুলি 'মাউণ্ট' করা ভালুকের মাথা দেওয়ালে লাগান আছে। এই সব অন্ধবিশ্বাসী লোকের দৌরাত্ম্যে, উহাদের একটিরও ঘাড়ের লোম নাই।

পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল ভালুক মাংসাশী জন্তু নয়, সাধারণতঃ ইহারা কন্দ ও ফল মূল খাইয়া জীবন ধারণ করে। কিন্তু আমাদের আসামে শিকারে যাওয়ার পর হইতে, সে ধারণা দূর হইয়াছে।

আমরা ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছি, ভালুক মৃত দেহ স্পর্শ করে না। কোন কোন পুস্তকেও এরূপ পড়িয়াছি। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। সুবিধা পাইলে ইহারা মরা জানোয়ার ও পঁচা মাংসও খাইয়া থাকে। আমরা আসামে শিকার করিবার সময়, আমাদের গরুর গাড়ীর একটি বলদ মৃতপ্রায় হওয়ায়, উহাকে পরিত্যাগ করিয়া গাড়োয়ানগণ চলিয়া আসে। এজন্য অবশ্য আমারা, উহাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলাম। পরদিন প্রাতে গাড়ী ও গরুটিকে আনিতে লোক যাইয়া দেখে, বলদটি মরিয়া গিয়াছে এবং দুইটি ভালুক উহাকে খাইতেছে। পরে আমরা শিকার করিতে যাইয়া, ভালুক পাই নাই।

ইহারা যে মাংস খায়, তাহা "নর নাসিকা লোলুপস্য জীর্ণ ঋক্ষস্য মুখে পতিষ্যসি" (শকুন্তলা) এবং "ভল্লুকা মনুষ্যানাং না সকাং গৃহ্নন্তি" (দশকুমার চরিত) এই সকল বাক্যেও প্রতিপন্ন হয়।

উই ঢিপি খুঁড়িয়া উই খাইতে ভালুক বড়ই মজ্‌বুত। ইহারা মধু পান করিতেও অত্যন্ত ভালবাসে বলিয়া, বৃক্ষস্থ মৌচাকে মুখ প্রবেশ করাইয়া মধুপান করিয়া থাকে; তখন মৌমাছি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও নিবৃত্তি হয় না। মৌমাছির আক্রমণের সময়, ইহারা লম্বা লম্বা লোম গুলি ফুলাইয়া আত্মরক্ষা করে। ভালুক এমন কৌশলী যে, অনেক সময় মধুপান করিবার মতলব থাকিলে মক্ষিকাদংশন হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কাদায় গড়াগড়ি দিয়া তাহা শুকাইয়া দেহটি যেন বর্ম্মাবৃত করিয়া লয়।

বসন্ত ঋতুতে মহুয়া, গজহর, ডুমুর ও বটফল প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য। শীতকালে জঙ্গলী কুল ও আমলকী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে খাইয়া থাকে।

ছোটনাগপুর প্রভৃতি পাহাড়ীয়া দেশে বিস্তর মহুয়াবৃক্ষ দেখা যায়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সেগুলি পুষ্পিত হইলে, ভালুকেরা বৃক্ষের নীচে ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেক স্থলে গ্রামের ভিতরও চলিয়া আসিয়া সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া ফিরিয়া রাত্রিশেষে আপন আপন বাসস্থান পাহাড়ে চলিয়া যায়।

হাজারিবাগ ও ছোটনাগপুরের অন্যান্য কতক স্থানে, বিস্তর ভালুক দেখা যায়। সাধারণতঃ পাহাড় বা জঙ্গল তাড়াইয়া শিকারীকে মাচায় বা কোনও নিরাপদ স্থানে থাকিয়া, শিকার করিতে হয়। যাঁহারা লোক দিয়া "ড্রাইভ্" করাইয়া শিকার করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা, জ্যোৎস্নারাত্রে মহুয়া বা অন্য বৃক্ষের তলে, যে সব স্থানে ভালুকেরা প্রায়ই আহার অন্বেষণে আইসে, সেই সব বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন সুবিধাজনক বৃক্ষে মাচা করিয়া, অথবা কোনও স্থানে গর্ত্ত

করিয়া, তাহা হইতে শিকার করে। অন্ধকার রাত্রে এই উপায়ে শিকার করা চলে না। আমি নিজে যে প্রণালীতে বিভিন্নস্থানে ভালুক শিকার করিয়াছি, তাহা পরে বর্ণনা করিব।

ভালুকীরা, তাহাদের ছোট ছোট শাবকদের পিঠে করিয়া লইয়া চলে। অন্য জানোয়ারের মত শিশুশাবকগুলি বেশ একটু বড় না হওয়া পর্য্যন্ত মায়ের সহিত হাঁটিয়া হাঁটিয়া চলে না।

ভল্লুক-চরিত্রের একটা অত্যাশ্চর্য্য গল্প নিম্নে লিখিতেছি। ঘটনাটীর একাংশ আমি প্রত্যক্ষও করিয়াছি। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে, বোধ হয় ইংরেজী ১৮৯২ সনে যখন আমি কলিকাতায় ছিলাম, তখন আমার পিতৃবন্ধু...মিত্রজা মহাশয়, একদিন আসিয়া আমাকে জানাইলেন যে, সার্কুলার রোডের এক অনাথ-আশ্রমে একটি ভালুক-পোষা মানুষ আছে; ইচ্ছা করিলে আপনি দেখিয়া আসিতে পারেন। এই আজগুবি গল্প শুনিয়া, তৎপরদিন আমরা সেখানে যাইয়া, সত্যই একটি কোঠার মধ্যে একখানা তক্তার উপর একটি ৮।৯ বৎসরের মেয়েকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দেখিতে পাই। আশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া উহাকে দেখাইয়াছিলেন। তিনি জানালা খুলিয়া, গরাদের ফাঁক দিয়া উহাকে ডাকিবামাত্র মেয়েটি ২।১ বার তাকাইয়া, ঠিক চতুষ্পদ জন্তুর মত লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া, গরাদে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া, শিক চাপিয়া ধরিল। আমরা বাজার হইতে কিছু 'জিলিপী' আনাইয়া ঠোঙ্গাসমেত উহার হাতে দিলে, সে উহা বেশ হাত পাতিয়া নিয়া খানিক হাসিয়া, বানর যেমন কোনও জিনিষ এক হাতে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া লাফাইতে লাফাইতে যায়, সেইরূপ লাফাইতে লাফাইতে গিয়া তক্তায় বসিয়া ঠোঙ্গার জিনিষগুলি খাইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মলমূত্রও ত্যাগ করিল।

এই মেয়েটীর চেহারা অত্যন্ত কদাকার, দাঁতগুলিও অত্যন্ত বিশ্রী

ও অসমান, মুখখানা চ্যাপ্‌টা। অধিকাংশ সময়ই হাত ও পায়ে ভর দিয়া চলাফেরা করার দরুণ হাত পায়ের তলা স্বাভাবিক অবস্থা হইতে যেন কিছু লম্বা ও কর্কশ হইয়া গিয়াছিল। নখগুলিও লম্বা ছিল। সে তখন পর্য্যন্তও কথা বলিতে পারিত না; অস্বাভাবিক রকমের ২।১টা চীৎকার করিত মাত্র। এইত গেল ইহার মোটামুটি চেহারা ও অবস্থা। ইহাকে পাওয়ার গল্পটি যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা আরও বিস্ময়কর।

আমাদের দেখার ৬।৭ মাস পূর্ব্বে, দার্জ্জিলিংএর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে, একব্যক্তি, এক ভালুক শিকার করার সময় দেখিতে পান যে, বন্যজন্তুর শাবক যেমন মাতার পাছে পাছে যায়, এটাও সেইরূপ পাছে পাছে যাইতেছে। তখন ইহা যে কি জানোয়ার, তিনি তাহা বুঝিতেই পারেন নাই। কিন্তু ভালুকটাকে গুলি করিয়া মারার সময়, উহার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে এইটাও যাইয়া, আহত ভালুকটাকে জড়াইয়া ধরে। ইহার পর নিকটে গিয়া মানুষ বলিয়া চিনিতে পারিয়া তিনি উহাকে লইয়া আইসেন। ইহাও প্রকাশ পায় যে, বহুদিন পূর্ব্বে একটি ভুটীয়া স্ত্রীলোক, এক শিশু সন্তান সহ কাঠ কাটিতে গিয়া বনে ভালুক কর্ত্তৃক নিহত হয়। তদবধি তাহার সেই সন্তানটিকেও আর পাওয়া যায় নাই। ইহাতেই লোকে অনুমান করে যে, এই সেই অপহৃত শিশু; বহুদিন ভল্লুক কর্ত্তৃক লালিত পালিত হওয়াতে বন্য ভাবাপন্ন হইয়াছিল। এই ঘটনা অবগত হইয়া অনাথ-আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ মেয়েটিকে আনিয়া প্রতিপালন করিতে-ছিলেন।

ঈশ্বর জানেন গল্পটি সত্য কি রচিত। আমি কিন্তু যাহা দেখিয়াছি তাহাতে মেয়েটির অবস্থা দৃষ্টে ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়। আমি আসিবার সময় অনাথ-আশ্রমে ২৫৲টি টাকাও দিয়া আসিয়াছিলাম।

কখনও কখনও ভালুক ও বাঘ, শৃগাল, কুকুরের মত ক্ষিপ্ত (Rabid) হয়। তখন উহারা জঙ্গল হইতে বহুদূরবর্ত্তী স্থানে চলিয়া গিয়া নামমাত্র জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া বিনা কারণে বহু লোককে জখম করে। সেই সময় ইহারা ভয়ানক হইয়া উঠে। নিম্নে একটি ক্ষ্যাপা ভালুক এবং ক্ষ্যাপা বাঘের গল্প লিখিতেছি।

ঘটনাটি ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালা ১৩০৪ কি ১৩০৫ সালে আমাদের বাড়ী মুক্তাগাছার মাইল খানেক দূরে তারাটি গ্রামে, এক ভালুক আসিয়া অনেক লোককে জখম করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ঐ সংবাদ মিথ্যা বলিয়াই মনে করি; কারণ ঐ স্থানে বা উহার ২।৪ মাইলের মধ্যেও ভালুক থাকিবার মত কোন জঙ্গল আছে বলিয়া আমাদের জানা ছিল না। মুক্তাগাছার ৮।৯ মাইল দূরে মধুপুরের জঙ্গলে সময় সময় ভালুক দেখা যায়। তথা হইতে হয়ত কোন রকমে চলিয়া আসিয়াছে মনে করিয়া, আমার জ্ঞাতিভ্রাতা স্বর্গীয় মহেশকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও জ্ঞাতি দাদা প্রবীণ শিকারী শ্রীযুক্ত বরদাকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়দিগকে দুইটি হাতী সহ পাঠাই। সেদিন বিশেষ কোন কাযে আমাকে ময়মনসিংহ টাউনে যাইতে হইয়াছিল বলিয়া—বিশেষতঃ সত্যকথা বলিতে কি, আমি এই সংবাদে বড় বেশী আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই বলিয়াও,—নিজে যাই নাই। শিকারান্তে বরদা বাবুর মুখে যে গল্প ও তাঁহার শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিয়াছিলাম, তাঁহার ভাষাতেই অবিকল লিখিতেছি :—

"তুমি হাতী পাঠাইয়া দিলে, আমি 'ফতেমা'তে ও মহেশ 'ঘাগট পিয়ারী'তে চড়িয়া, ১৫।২০ মিনিট মধ্যেই গন্তব্য স্থানে পঁহুছিলাম। তারাটির বিলের নিকটে গিয়া দেখি, ২।৩ শত লোক মাঠে একত্র হইয়া জটলা করিতেছে। সেখানে কোনও জঙ্গল নাই দেখিলাম; তখন মাঠে কোন ফসল ছিল না। লোকগুলির নিকটে

গিয়া ভালুকের কথা জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা শতাধিক গজ দূরবর্ত্তী একটা ঝোপ দেখাইয়া দিল। ঝোপটী আর কিছুই নহে, ক্ষেতের আইলের উপর কতকগুলি লতাগুল্ম-বেষ্টিত একটী শেওড়া গাছ। ঝোপটীর ব্যাস ৫।৬ গজের অধিক নহে। এই অবিশ্বাস্য কথায় বৃথা পরিশ্রম করিয়া আসিলাম, মনে করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, পরে ঝোপের দুই পার্শ্বে আমাদের দুইটী হাতী লইয়া গেলাম। ঝোপের ভিতর একটু গাঢ় জঙ্গল থাকাতে কিছু দেখা যাইতেছিল না। মহেশ ঝোপের অপর পার হইতে খানিক উঁকিঝুঁকি দিয়া, আমাকে কিছুই না বলিয়া, দম্ করিয়া এক আওয়াজ করিয়া দেয়। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই ভালুক বিকট চীৎকার করিয়া (ভালুকের এই জাতীয় চীৎকারকে আমাদের দেশে 'ঠাঁটা' বলে) আমাকে চার্জ্জ করিয়া বাহির হয়। বোধ হয় উহার মুখ আমার দিকেই ছিল। বলা বাহুল্য আমাদের উভয় হাতীই ভাগড়া ছিল; ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই দুই হাতী দুইদিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। আমার অসতর্ক অবস্থায় হাতী দৌড় দেওয়ায় আমি পড়িতে পড়িতে কোন রকমে বাঁচিয়া যাই। পরে ঠিক হইয়া বসিয়া পিছন ফিরিয়া দেখি যে, ভালুক আমার হাতীর পাছে দৌড়াইয়া আসিতেছে; হাতী এক একবার পেছন ফিরিয়া ভালুক দেখে, আর ক্রমাগত দৌড়ায়। তখন ভালুক হাতীর অনেক পেছনে পড়িয়া যায়। আবার একটু পরেই ভালুক খুব জোরে দৌড়াইয়া হাতীর পায়ের কাছে আসিয়া পড়ে। এই ভাবে মাইল দেড়েক আন্দাজ হাতী ও ভালুকের দৌড় হইবার পর, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বাঁশ বাগানে হাতী ঢুকিয়া পড়ায় হাতীর উপরে বসিয়া থাকা, আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল। বাঁশ গলায় বাঁধিয়া হাতী হইতে পড়িয়া যাইবার সময় সৌভাগ্যক্রমে আমি একেবারে না পড়িয়া, হাতীর গদার রশি ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলাম। গদির দড়ি বাম হাতে ধরাতে, হাতী হইতে পড়িয়া যাই নাই। সৌভাগ্য

যে, ডান হাতে তখন বন্দুক ধরাই ছিল। ঝুলিয়া পড়াতে আমার পা মাটী হইতে হাত খানিক মাত্র উপরে ছিল। হাতী ও ভালুক কিন্তু তখনও সমভাবেই দৌড়াইতেছিল। এই অবস্থায় নীচের দিকে তাকাইয়া দেখি, ভালুক এক একবার আমার পা কামড়াইয়া ধরিবার জন্য দৌড়াইতে দৌড়াইতে মুখ উঁচু করিয়া লাফ দিবার চেষ্টা করিতেছে, আমিও তখন পা একটু উঁচু করি।

"এই অবস্থা বোধ হয় বড় জোর মিনিট দুইয়ের বেশী স্থায়ী ছিল না। একটু পরেই আমার বাম হাত অবশ হইয়া গেল; কাযেই আমি পড়িয়া গেলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি পড়িয়াও দাঁড়ান অবস্থায় ছিলাম। ভালুক কিন্তু আর হাতীর পাছে পাছে না গিয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে আমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াই, ভীষণ গর্জ্জন করিয়া দুইপায়ে দাঁড়াইল। ভালুকটা উঁচুতে প্রায় আমার সমানই হইয়াছিল। নিমিষের মধ্যে এত নিকটে আসিয়া পড়িল যে, আমি আর গুলি করিবার অবকাশ পাইলাম না; কাযেই নিরুপায় হইয়া বন্দুকটী দুই হাতে আড় করিয়া ঠেলিয়া ধরিলাম। তখন ভালুকও বন্দুকের নলের উপর দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া আমার হাত কামড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময় ভালুকটা ক্রমাগত এত জোরে ফোঁৎ ফোঁৎ করিতেছিল যে, উহার মুখের থুথু, লালা প্রভৃতি আমার চোখে মুখে আসিয়া পড়িতেছিল। সেই সময় 'কর্ত্তাকে খাইল', 'কর্ত্তাকে খাইল' বলিয়া কতগুলি লোকের কোলাহল আমার কাণে আসিল। আমি প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলিতে লাগিলাম। এইরূপ খানিকক্ষণ ঠেলাঠেলির পর আমার ডান হাতে উহার মুখ ঠেকিল। ভালুক যে আমার হাত কামড়াইয়া ধরিয়াছে, তখন আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। নিরুপায় হইয়া শেষ চেষ্টা করিবার জন্য বন্দুকের নল দিয়া যথাশক্তি উহাকে ধাক্কা দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার এই চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল। ধাক্কা খাইয়া ভালুকটা পড়িয়া

গিয়া, কি জানি কেন আর আমার দিকে না ফিরিয়া সুড় সুড় করিয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। আমিও পুনরাক্রমণের ভয়ে আমার হাতের Twelve bore rifle দিয়া গুলি করিলাম। আমার গুলির খুব ভাল effect হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গেই ভালুকটা পড়িয়া গিয়া গড়াইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় গুলি করিয়া দৌড় দিলাম। হঠাৎ কোটের আস্তিনের দিকে নজর পড়ায় দেখিলাম, উহা রক্তে ভিজিয়া লাল হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি নিকটবর্ত্তী গ্রামে গিয়া রক্ত ধুইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া লইলাম।

"আহত ভালুকটীকে একটু পরেই মহেশ মারিয়া আনিল। আমি পড়িয়া যাইবার পর, আমার শিকারী হাতী ক্রমাগত দৌড়াইয়া ৩।৪ মাইল দূরে খাগডহরী গ্রামে গিয়া থামিয়াছিল।"

দাদা মহাশয়ের হাতে ৪টী দাঁতই বিঁধিয়াছিল। তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সাহসী শিকারী বলিয়াই সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন। "নার্ভাস্" লোক হইলে কি বিপদই যে হইত, তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে ডাক্তারের অধীন থাকিতে হইয়াছিল।

এইরূপ দশ এগার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী মাধববাড়ী গ্রামে একটী ছোট লেপার্ড আসিয়া বিনা কারণে ক্রমাগত অনেক লোক জখম করিতেছিল। আমাদের মুক্তাগাছার উমাচরণ চক্রবর্ত্তী নামক এক ডাক্তার ভদ্রলোককে দুইটি হাতী সহ পাঠান হয়। বাঘটি ১৭।১৮ জন লোক জখম করিয়াছিল! উমাচরণ বাবু যাইবার সময় রাস্তায়ও সংবাদ পাইলেন যে, তখনই একজন বৈরাগীকে জখম করিয়াছে। পঁহুছিয়া জানিতে পারিলেন, ঐ বৈরাগী, লোকজনের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও জঙ্গলের নিকট দিয়া গ্রামান্তরে যাইতেছিল। বাঘটি প্রভুকে দেখিবামাত্র হঠাৎ আলিঙ্গন করায় প্রভুও তাঁহাকে মালা ও কুঁড়োজালী সমেত হরিনামে দীক্ষিত

করিয়া, গুরুদক্ষিণাস্বরূপ ২।৪টি আঁচড় কামড় পাইয়া কোনরূপে পৈতৃক প্রাণটি লইয়া পলায়ন করেন। বাঘটি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করার অল্প পরেই ডাক্তারবাবু উহাকে বিষ্ণুলোকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বিনা কারণে এই সব লোক ঘাল করাতেই মনে হয়, ইহারাও শৃগাল কুকুরের মত ক্ষিপ্ত হয়। এই উভয় ক্ষেত্রেই যে সমস্ত লোক জখম হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেককেই মুক্তাগাছা আনাইয়া, উপযুক্তরূপে লোহার দাগ দিয়া, কাহারও কাহারও ক্ষতে Pot. Permanganas দ্বারা ধৌত করান হইয়াছিল। কিন্তু এই সব লোকের মধ্যে কেহ পরে জলাতঙ্ক (hydrophobia) হইয়া মারা গিয়াছে কি না জানা যায় নাই।

অনেক সময় বাঘিনীর বাচ্ছা সঙ্গে থাকিলে বা উহারা গরম হইলে বিনা কারণে লোক জখম করে। কিন্তু জঙ্গল ছাড়িয়া গ্রামে ঢুকিয়া বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরিয়া ফিরিয়া যাহাকে পায় তাহাকেই কামড়ান ক্ষিপ্ত না হইলে সম্ভবপর নহে।

বন্য জন্তুদের মধ্যে অনেক সময় চর্ম্মরোগ হইতেও দেখা যায়। আমাদের বাড়ীর নিকটেই একবার এক ঢেঁকীশালে শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর একটি লেপার্ড মারিয়াছিলেন। উহাকে লেপার্ড বলিয়া চেনা খুব কঠিন হইয়াছিল। উহার সর্ব্বাঙ্গে খোস হইয়া একটি লোমও ছিল না। চুলকানির যন্ত্রণায় ঢেঁকীঘরে আশ্রয় লইয়া অনাহারে কঙ্কালসার হইয়া নিৰ্জ্জীবের মত পড়িয়া ছিল। বাঘটি মারার পর, কেহ উহাকে ঘৃণায় স্পর্শও করে নাই। আমরা পরে মুচি পাঠাইয়া উহার নখগুলি কাটাইয়া আনাইয়াছিলাম। পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল, এই জাতীয় ব্যারাম বুঝি কেবল কুকুরেরই হয়; কিন্তু বাঘটির অবস্থা দেখিয়া আমার সে ভুল ধারণা দূর হইয়াছিল।

একবার আমরা 'থলে' শিকার করিবার সময় একটি সাদা বাঘ মারিয়াছিলাম। ক্যাম্প হইতে বাহির হইয়া শিকারভূমি অভিমুখে

অনেকদূর অগ্রসর হইলে, দূর হইতে সাদা একটা কি যাইতেছে দেখিয়া কেহ কুকুর, কেহ বা বাঘ ইত্যাদি নানা কথা বলিতে লাগিল। সেখানে জঙ্গল বেশী ছিল না বলিয়া দূর হইতে দেখিবার অসুবিধা হইতেছিল না। হাতী দৌড়াইয়া নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা গেল বাঘই বটে, কিন্তু প্রায় সাদা হইয়া গিয়াছে। বাঘটি মারিবার পর, উহার সাদা চামড়ার উপর কাল গুল্‌গুলি বেশ মনোরম দেখাইতেছিল। আমাদের মধ্যে কোন শিকারী ইহাকে Snow leopard বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন; কিন্তু পরে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে ব্যাঘ্রাদি পশুরও albino হয়। শ্বেতি (Leucoderma) রোগগ্রস্ত লোক যেমন সাদা হইয়া যায়, ইহারাও সেইরূপ হইয়া থাকে।

আর একবার একটি মাদি বাঘকে মনুবাবু মারিয়াছিলেন। তাহার রংও খুব পাত্‌লা সাদা রকমের (light) ছিল, তবে পূর্ব্বোক্ত লেপার্ডের মত অত সাদা হয় নাই। ইহাকেও আমরা প্রথম অবস্থায় অ্যালবিনো মনে করিয়াছিলাম। অ্যালবিনো হইলে ইহাদের বলবীর্য্যের লাঘব হইতে দেখা যায় না।

ভালুক একদিকে যেমন হিংস্র, তেমনি ইহাদিগকে শিশুকাল হইতে পোষ মানাইলে চমৎকার পোষ মানে; ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন। বাজিকরগণ কল্‌কেতে তামাক বা গাঁজা সাজিয়া হাতে করিয়া ভালুকের মুখের কাছে ধরিলে, ভালুক উহা সো সো করিয়া টানিয়া ভস্ম করিয়া ফেলে; এ দৃশ্য অতি চমৎকার। গঞ্জিকা সেবনের পর কিন্তু ইহাদের নেশা হয় কি না বুঝা যায় না।

ভালুকের স্বভাবই এই, ইহারা চার্জ্জ করিবার সময় দৌড়াইয়া আসিয়া, দাঁড়াইয়া সম্মুখের দুই পা দিয়া ধরিবার চেষ্টা করে।

বাঘ ও ভালুক উভয়কে এক শ্রেণীর বন্দুক দ্বারা শিকার করা চলে। দুই একজন শিকারীর নিকট শুনিয়াছি, ইহারা এক গুলিতে মরিতে চায় না। কিন্তু আমি যত গুলি মারিয়াছি তাহার সবই

প্রায় 12 Nitro Paradoxএর এক গুলিতেই শেষ করিয়াছি। কদাচিৎ ২।৩ গুলিও ব্যবহার করিতে হইয়াছে। দূরে অবস্থিত কোন কোনটা 500 Express Rifle দিয়াও মারিয়াছি। হায়না, নেক্ড়ে (wolf), বন্যকুক্কুর (wild dog) বাঙ্গলায় দেখা যায় না। ইহাদের যুক্ত-প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ, ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যা প্রদেশে বিস্তর দেখা যায়। আমি কিছুদিন চুনার ও হাজারীবাগে থাকার সময়, বহু হায়না ও নেক্ড়ে (wolf) শিকার করিয়াছি। ঐ সব স্থানে wolfকে 'লাক্ড়া' বা 'নেকড় বাঘা' ও হায়নাকে 'হুড়াড়' বলে। নেক্ড়ে গুলি আকারে শৃগালের মত ও হায়না তদপেক্ষা কিছু বড় হয়। এই সব স্থানের হায়না গুলি দেখিতে বাঘের মত ডোরা বিশিষ্ট ; ইহাদিগকে Striped হায়না বলে। অন্য আর এক প্রকারের হায়না পশুশালায় দেখিয়াছি ; তাহা এই সব স্থানে কখনও দেখি নাই।

ইহাদিগকে একটা বা কদাচিৎ দুইটাও একত্রে দেখিয়াছি। নেকড়ে গুলি কোন কোন সময় ৫।৭।১০টা কি আরও বেশী একত্র দলবদ্ধ হইয়া চলে ; তখন ইহারা আরও অধিক হিংস্র হইয়া উঠে। আমার চোখে এরূপ কখনও পড়ে নাই। ইউরোপের কোন কোন স্থানে ইহারা ২।৪ শতও এক এক দলে থাকে। সাধারণতঃ আমি যখন ইহাদিগকে একক অবস্থায় দেখিয়াছি, তখন ইহাদিগকে ভীতু বলিয়াই মনে করিয়াছি।

ইহারা সচরাচর রাত্রে চলা-ফেরা করে এবং গ্রামের ভিতর আসিয়া ছোট ছোট কুকুর ও ছাগল ধরিয়া লয়। হাজারিবাগ টাউনের উপরও, রাত্রে আমাদের বাসার নিকট ইহারা অনেক সময় আসিত। পচা মাংসই ইহাদের প্রিয় খাদ্য। হাজারিবাগে আমি ২।৩ রাত্রে কশাই খানার ভিতর থাকিয়া, যখন উহারা রক্ত খাইতে আসিত, তখন শিকার করিয়াছি। হায়নার চোয়ালের এত জোর

যে, ইহারা অনায়াসে মহিষাদির মোটা মোটা হাড় ভাঙ্গিয়া খায়। বাঘের কাছে এ রকম কার্য্য প্রায় অসাধ্য।

নেকড়ে গুলি, অনেক সময় ছোট ছোট ছেলে পিলে ধরিয়া লইয়াছে বলিয়া হাজারিবাগ থানাতেও কয়েকটা রিপোর্ট হইতে শুনিয়াছি। ইহারা নরখাদক হয় বলিয়া, ছোটনাগপুর অঞ্চলে ইহাদিগকে শিকারের জন্য, গভর্ণমেণ্ট হইতে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। তবে সাধারণ পুরস্কার অতি সামান্য।

ইহাদিগকে নিকটে পাওয়া গেলে ছর্‌রা দ্বারাও মারা চলে।

• বন্য কুক্কুর (wild dog) আমি কখনও শিকার করি নাই। শুনিয়াছি ইহারা দলবদ্ধ হইয়া চলে এবং সেই সময় অত্যন্ত হিংস্র হয়। এইরূপ অবস্থায় যখন কোন পাহাড়ে ইহাদের আবির্ভাব হয় তখন তথাকার মৃগ, মহিষ, শশক প্রভৃতি ছোট বড় হিংস্র অহিংস্র নির্ব্বিশেষে প্রায় সমস্ত জন্তুই, পাহাড় ছাড়িয়া পলায়ন করে। আমি যখন উড়িষ্যার সম্বলপুর অঞ্চলে শিকার করিয়াছি, তখন একবার তত্রত্য এক গ্রাম্য শিকারী, একটা বন্য কুক্কুর মারিয়া আনিয়া আমাকে দেখাইয়াছিল।

হাজারিবাগের নিকটে 'কেনেরি' নামে একটা পাহাড় আছে। অনেক ইংরেজ উহাকে 'জিব্রাল্‌টার হিল'ও বলিয়া থাকেন। ঐ পাহাড়ে অনেক 'হায়না' থাকে। আমি ছাগল বাঁধিয়া নিকটে বসিয়া থাকিয়া, দুইবার দুইটাকে মারিয়াছিলাম।

অনেক স্থলে আমরা বড় বড় পাহাড় beat করিয়া শিকার করিবার সময়, জঙ্গল ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু বড় শিকারের প্রত্যাশায় ইহাদিগকে আমরা মারিতাম না।

শূকর।

আমাদের ময়মনসিংহ জেলায় ও সিলেট অঞ্চলে সাধারণ লোকে 'শূকর'কে 'শিকার' বলে। ইহারা অনেক সময় জঙ্গলের ভিতর খড় ও পাতা দিয়া 'কুঁড়ে' প্রস্তুত করিয়া, সপরিবারে বাস করে। ইহার ভিতর শূকরীগণ একবারে ২৫।৩০টী বাচ্ছা পর্য্যন্ত প্রসব করে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি কাল, এবং কতকগুলি পিঠে ডোরা বিশিষ্ট হয়। বড় হইলে ডোরা গুলি মিলাইয়া যায়; নচেৎ বনে অনেক ডোরা বিশিষ্ট শূকর দেখা যাইত। পোষা শূকরের বাচ্ছার পিঠে প্রায়ই ঐরূপ ডোরা দেখা যায় না।—বন্য ও গৃহ-পালিত শূকরের এই পার্থক্য, প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের ভাবিবার বিষয়। বন্য শূকরের উৎপাতে, জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী স্থানে কৃষিকার্য্য একেবারে অসাধ্য। ইহারা ধানের ছড়া কামড়াইয়া ধরিয়া, সমস্ত ধানগুলি ছাড়াইয়া লয়।

হাওদায় শূকর শিকারে বিশেষ কোন আমোদ নাই। তবে প্রতিবারই শিকারে বাহির হইয়া, বহু শূকর মারিয়াছি; তাহা কতকটা খেয়ালের বশেও বটে, কতক বা বৎসরান্তে শিকারে বাহির হইয়া, হাত একটু সেট্ করিবার জন্যও বটে। কখন কখন আবার স্থানীয় হাজং, গারো ও নমঃশূদ্রদের অনুরোধেও মারিতে হইয়াছে। যাহারা শূকর শিকার করিতে ইচ্ছুক, হাঁটিয়া শিকার বা ঘোড়ায় চড়িয়া Pig sticking করাই তাঁহাদের পক্ষে প্রশস্ত। Pig sticking করা যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি আনন্দদায়ক ও বীরত্বব্যঞ্জক। ইহাতে অনেক সময় শিকারীও ঘোড়া সমেত আক্রান্ত হইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। যাহাদের Pig stickingএর সুবিধা নাই, তাহাদের পক্ষে হাঁটিয়া শূকর মারাও কম আমোদজনক নহে। অনেক সময় সাবধান হইয়া ইহাদের মারিতে না পারিলে, আক্রমণের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

আমাদের দেশে, নমঃশূদ্র ও মুচিরা আর এক রকম শূকর শিকার

করে; তাহা খুব সাহসের কায। জঙ্গলের এক বা দুই দিক জাল দিয়া ঘিরিয়া, তাহার নিকট ইহারা বড় বড় বল্লম লইয়া বসিয়া থাকে। এই বল্লমকে দেশভেদে ‘চল্লি’, ‘চেওয়ার’, ‘কাতরা’, ‘জাঠি’, ‘ফালা’ প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তাহারা শূকর দেখিলেই রাগাইবার জন্য, হাত তালি দিয়া উহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উহাদের দেখিয়াই, শূকর যখন “চার্জ্জ” করিয়া আসিতে থাকে, অমনিই উহারা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বল্লমের ডাটা বগলে চাপিয়া ধরিয়া, শূকরের গায়ে ঠেকাইয়া দেয়। শূকরগুলি আপনাদের জোরেই বিঁধিয়া যায়। যদি ইহারা বল্লম দেখিয়াই, অথবা উহাতে একটু বিঁধিলেই, ঘুরিয়া গিয়া আক্রমণ করে তবেই বিপদ। কিন্তু উহাদের জাতীয় স্বভাব তাহা নয়। ইহারা যাহা গোঁ ধরিবে, প্রাণান্তেও তাহা করিতে ছাড়িবে না। এই জন্যই প্রচলিত কথায় “শূয়রে গোঁ” বলিয়া থাকে।

অনেক সময় শূকর বলশালী ও শিকারী দুর্ব্বল হইলে, ইহারা বিদ্ধ হইয়াও শিকারীকে উল্টাইয়া ফেলে। কোন কোন সময় বল্লমের ডাঁটাও ভাঙ্গিয়া যায়, তখন অন্যে আসিয়া সহায়তা করে। এই অবস্থায়, শূকর নিজে বিদ্ধ হইয়াও, সময় সময় শিকারীকে জখম করিয়াছে, এরূপও ঘটিয়াছে।

হাজারিবাগে ভালুক শিকারে গিয়া পাহাড় beat করিতে করিতে আমি এক শূকর মারিয়াছিলাম। অতবড় শূকর আমি খুব কম দেখিয়াছি। শূকর যে অত বড় হইতে পারে, তাহা আমার ধারণাই ছিল না। দেখিতে ঠিক মহিষের বাচ্ছার মত উঁচু ছিল; ১২ জন লোক উহাকে বহন করিয়া আনিয়াছিল। তখনই আমার সঙ্গের সাঁওতাল beater গণ, উহার মাংস কাটিয়া ভাগ করিয়া লয়। এত প্রচুর মাংস হইয়াছিল যে, প্রায় দুই শত কুলির প্রত্যেকেই যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছিল।

পাইথন সর্প

Python নামক এক প্রকার সাপ আমাদের অঞ্চলে, সুন্দরবনে ও আসাম প্রভৃতি বহু স্থানে দেখা যায়। আমাদের দেশে ইহাদিগকে 'চক্রবোড়া'; কোন কোন স্থানে বা 'মেঘডম্বুর' সাপ বলে। ইহারা উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের boa constrictor জাতীয় সাপের পর্য্যায়ভুক্ত। ইহাদের শরীরে বড় বড় কাল ও পীতাভ চক্র থাকে; কিন্তু ইহারা ফণা-ধারী (hood) নহে। ইহারা সাধারণতঃ ১৫।২০ ফিট্ লম্বাও হয়। কিন্তু শোনা যায়, কোন কোনটা না কি ২৫।৩০ ফিট্ লম্বাও হইয়া থাকে। ইহারা শিকার ধরিয়া ২।৩টি পেঁচ দিয়া, ক্রমে চাপিয়া চাপিয়া মারে বলিয়াই constrictor পদবী পাইয়াছে। ছাগল হরিণ প্রভৃতি ধরিয়া, পিষিয়া গিলিয়া ফেলাই ইহাদের স্বভাব। আমরা অনেক সময় শিকারে যাইয়া ইহাদিগকে কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। সাপুড়িয়াগণ অনেক সময় এই জাতীয় সাপ বাক্সে ভরিয়া আনিয়া দেখাইয়া থাকে।

আমাদের শিকার পার্টিতে, আমার হাতীর দারোগা আশ্রফ্ আলীর, অন্য শিকারে দক্ষতা যেমনই থাকুক, সর্পকুলের ধ্বংস সাধনে অত্যন্ত উৎসাহ দেখা যাইত।

আমরা নেপাল টেরাইতে শিকার করিবার সময়, একদিন একটি প্রকাণ্ড অজাগরকে লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। উহার মুখ ও লেজের দিকটা স্বাভাবিক রকমে বড়ই ছিল; কিন্তু মাঝের কতকটা স্থান ভয়ানক মোটা দেখা গেল; যেন কিছু খাইয়াছে বলিয়া মনে হইল। ইহাকে মারিয়া, ক্যাম্পে আনিয়া পেট চিরিলে দেখা গেল, যে, আস্ত একটা 'হগ্ ডিয়ার' গিলিয়া ফেলিয়াছে। ২।১ দিন পূর্ব্বেই বোধ হয় উহাকে খাইয়াছিল, কারণ তখনও উহা হজম হয় নাই; মাত্র কতকটা বিকৃত হইয়াছিল। হরিণটির ছোট

ছোট দুইটি শিংও ছিল। শিং শুদ্ধ এই আস্ত জানোয়ারকে গেলা, এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া মনে হইল।

আর একবার আমাদের বাড়ীর অদূরে 'মূজাটি' গ্রামে অনেকদিন পূর্ব্বে এই জাতীয় আর একটি সাপ মারিয়াছিলাম।

১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে, সবে মাত্র দেশের সব ওলট পালট করিয়া আমাদের বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আমাদিগকে পথে বসাইয়াছে। সেই সময় একদিন দুপুর বেলা, আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা ৺ মহেশ বাবু আসিয়া বলেন যে, "মুজাটিতে একটা সাপে, একটি ছাগল ধরিয়াছে, চল মারিয়া আসি।" তখনই তাঁহার সঙ্গে গোটা কতক ছররা ও বন্দুক লইয়া গিয়া দেখি 'আমিয়ান' নদীর ধারে এক ঝোপের নিকট বহু লোক জড় হইয়াছে। দূর হইতে এক একবার খুব জোরে ছাগলের ডাকও শুনিতে পাইলাম। নিকটে গিয়া দেখি সাপে ছাগলটির একটি পা ধরিয়া, উরুদেশ অবধি গিলিয়াছে। ছাগলটা এক একবার সম্মুখের দুই পায়ে জোর করিয়া, প্রাণপণ চেষ্টায় ২।৪ পা অগ্রসর হয়, সঙ্গে সঙ্গে সাপের গলাও লম্বা হইয়া যায়। ইহা ছাগলের জোরেই হয়, কি সাপটা ইচ্ছা করিয়াই ঢিল দেয় বলিতে পারি না। আবার একটু পরেই সাপের আকর্ষণে, ছাগলটা পিছাইতে থাকে। এই অবস্থা দেখিয়া তখনি আমার ছিপে মাছ ধরার কথা মনে হইয়াছিল। আমরা না গেলে, ২।৪ ঘণ্টায় ছাগলটাকে গিলিয়া ফেলিত। যাহা হউক, সাপটিকে মারিবার পরই, ছাগলটি মুক্ত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলংশক্তি হীন হইয়া পড়িয়াছিল। যদিও উহার পা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, তথাপি উহার হাড় ভাঙ্গিয়া ছিল বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু পায়ের স্থানে স্থানে দাঁতের আচড় দেখিয়াছিলাম।

ইহাদিগকে প্রায়ই একটা করিয়া, কোন কোন স্থানে দুইটাকে মিলিতাবস্থাতেও দেখিয়াছি। কিন্তু শ্রীহট্টের তরঙ্গিয়া নামক স্থানে
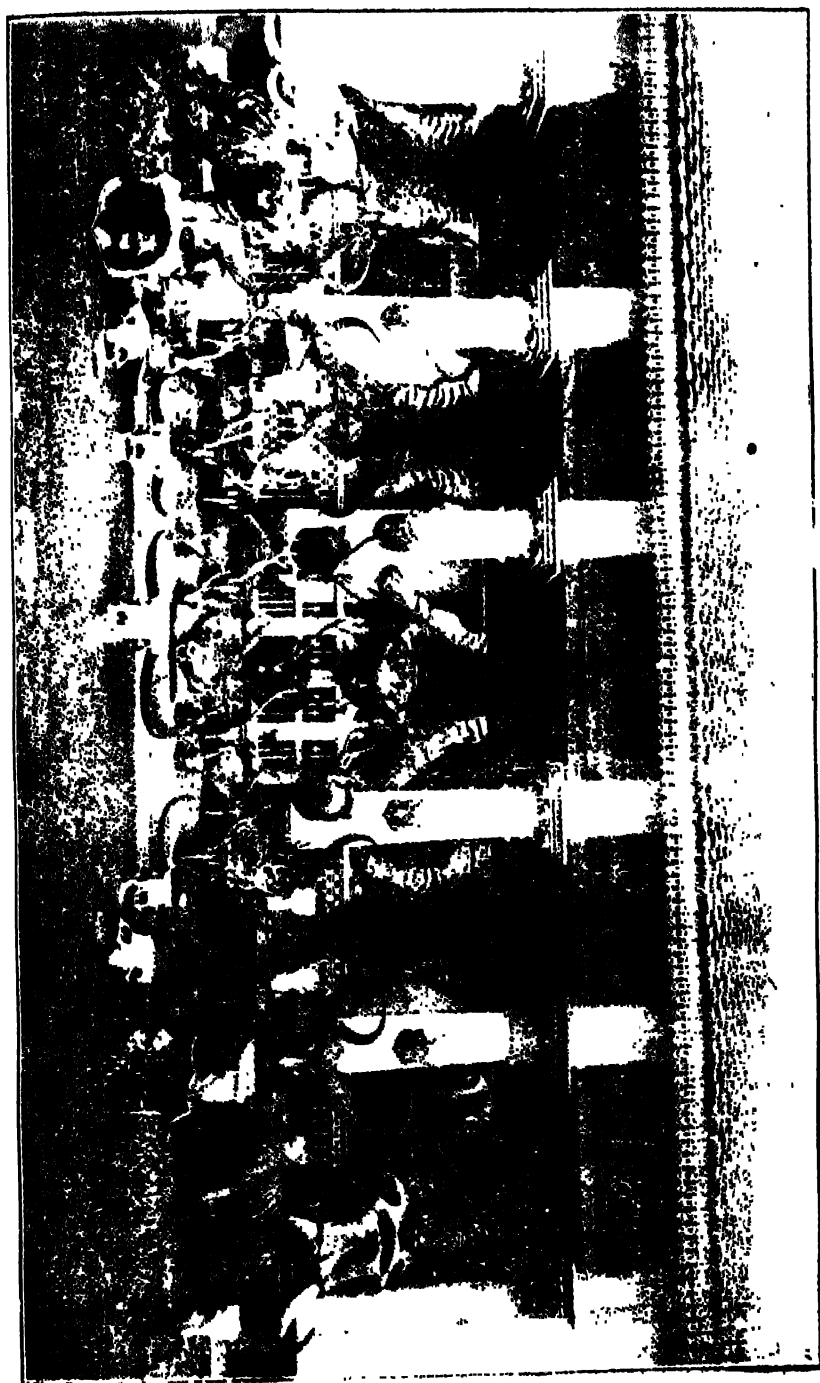
এক নদীর ধারে নলবনের মধ্যে, এই জাতীয় সাপের এক বৃহৎ পরিবার দেখিয়াছিলাম; নানা আকারের ২০।২৫টি একত্রে কুণ্ডলী পাকাইয়া ছিল। আমাদের ক্যাম্প ডাক্তার উমাচরণ বাবুকে বন্দুক দিয়া মারিতে দেওয়া হয়। তিনি ঐ সর্প স্তূপের উপর ৭।৮টি গুলি করিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহার উত্তর তিনিই দিবেন।

সাম্বর ও সোয়াম্প ডিয়র

'কাশ্মীর ষ্ট্যাগ' নামক এক জাতীয় হরিণ ব্যতীত, 'সাম্বর' ও 'সোয়াম্প ডিয়র' ভারতবর্ষের বিবিধ শ্রেণীর হরিণের মধ্যে দেহ ও শৃঙ্গ-সৌষ্ঠবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।

সাম্বরকে কোন কোন স্থানে 'সাবর', 'সম্বর' ও আমাদের দেশে 'গাউজ' বলে, এবং সোয়াম্প ডিয়রকে 'বারশিঙ্গা' বলে। সোয়াম্প ডিয়র গারো হিল টেরাই ও আসামে প্রচুর পাওয়া যায়। সাম্বর যুক্তপ্রদেশ, নাগপুর, উড়িষ্যা ও অন্যান্য পার্ব্বত্য দেশেও দেখা যায়। শুনিতে পাই, অযোধ্যার কোন কোনও বনে বারশিঙ্গা দলবদ্ধ হইয়া থাকে।

এই উভয় জাতীয় হরিণই, আকারে পনি ঘোড়ার মত। সাম্বর, সোয়াম্প ডিয়র অপেক্ষা কিছু বড় ও অধিকতর বলশালী হয়। সোয়াম্প ডিয়রের গলা সাম্বর অপেক্ষা সরু ও লম্বা হয়।

সাম্বরগুলির বর্ণ ফ্যাকাসে কাল এবং সোয়াম্প ডিয়রগুলি হরিদ্রা বর্ণের হয়। হরিণ মাত্রেই বৎসরান্তে একবার করিয়া লোম ও শিং ঝাড়িয়া ফেলে। পুরাতন লোম বদলাইলে, প্রথম প্রথম বারশিঙ্গার রং খুব চকচকে হলদে দেখায়; তখন ইহাদিগকে দেখিলে রামায়ণের স্বর্ণমৃগের কথা মনে পড়ে। ইহারা দেখিতে সাম্বর অপেক্ষা অনেক

সুন্দর। ইহাদের শিংএ অনেকগুলি ডাল হয় বলিয়া, ইহাদিগকে বারশিঙ্গা বলে এবং কোন কোন স্থানে 'ঝাকাল'ও বলিয়া থাকে। সাম্বর বা সাবরের শিং অপেক্ষাকৃত মোটা ও তিন ডালবিশিষ্ট। কোন কোন সাম্বর একটু বেশী কাল ও বড় হয়, সেগুলিকে আমাদের দেশে 'কালোয়ার গাউজ' বলে। ইহাদের এবং সোয়াম্প ডিয়রের, মাদীগুলিকে 'ঢুলানি' বা 'লাড়ী' বলে। অনেক সময় ইহাদের উভয় শ্রেণীকে একই জঙ্গলে দেখা গেলেও সাম্বর সাধারণতঃ শুষ্ক ও পাহাড়ী জঙ্গল, এবং বারশিঙ্গা জলা ও বিলের ধারের জঙ্গল পছন্দ করে।

চলাফেরা করিবার সময়, ইহাদের বৃহদাকার শৃঙ্গগুলি বনে আটকাইয়া যায় বলিয়া, সর্ব্বদাই ইহারা মুখ উচু করিয়া শিং পিঠে লাগাইয়া চলে। এ জন্য বনের ঘর্ষণে গলার কতক স্থানের লোম উঠিয়া যায়। সাম্বর বর্ষা অন্তে ও বারশিঙ্গা শীতের সময় শিং ঝাড়ে। ইহাদিগকে পুষিলে প্রতি বৎসরই এক জোড়া করিয়া শিং পাওয়া যায়।

ইহাদের উভয় শ্রেণীরই, প্রথম শৃঙ্গোদ্গমের সময় এক ডাল করিয়া হয়। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বারশিঙ্গার প্রতি বৎসরই একটি করিয়া ডাল বাড়িয়া যৌবনে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু সাম্বরের ডাল বৃদ্ধি হইয়া তিনটির অধিক আর হয় না। ইহার পর শিং মোটা ও আকারে বড় হইয়া থাকে।

সাম্বরকে শীতকালে ও বারশিঙ্গাকে বর্ষাকালে সচরাচর দেখা যায়। সাম্বর শীতান্তে ও বারশিঙ্গা বর্ষান্তে অধিকাংশই পাহাড়ে উঠিয়া যায়। মদ্দা সাম্বর (stags) গরম সহ্য করিতে পারে না বলিয়া, মহিষের মত অনেক সময় গা ডুবাইয়া "গারি নিতে" ভালবাসে। এ জন্য অনেক সময়ই ইহাদের গায়ে কাদা দেখা যায়। মাদী (hind) গুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে।

বর্ষার প্লাবনে, বনের মধ্যে প্রচুর জল হইলেও 'বারশিঙ্গা' জলেই থাকে। এমন কি, ডুব জল না হইলে কোমর কি গলা জলেও ইহাদিগকে থাকিতে দেখা যায়। তাড়া পাইলে এইরূপ জলে এত দ্রুত লাফাইয়া যায় যে, ইহাতে ইহাদের কোন কষ্ট হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। ডাঙ্গার ঘন বনে সাম্বর যেরূপ দৌড়ায়, ইহারাও জলে ঠিক্ সেইরূপই যায়। জলে থাকার দরুণ, ইহাদের গায়ে অনেক সময় জোঁক লাগিয়া থাকে। জোঁকের তাড়নায় অস্থির হইলে ইহারা জোঁক কামড়াইয়া ছিড়িয়া ফেলে, সময় সময় দুই একটা খাইয়াও থাকে। আমি শিকার করিয়া ইহাদের ২।১টার গলার ভিতর জোঁক পাইয়াছি।

ইহাদিগকে Big bore rifle দিয়া শিকার করাই বিধেয়। ইহাদের মর্ম্মস্থলে আঘাত করা না গেলে, সহজে এক গুলিতে পড়িতে চায় না; বিশেষতঃ stag গুলিকে হাওদার উপর হইতে এক গুলিতে আট-কান (stop) বড় কঠিন। হাওদা-শিকারে দৌড়ের সময় ঘন বনের মধ্যে পশ্চাৎ হইতে ইহাদিগকে আবছায়ার মত দেখা যায় বলিয়া মর্ম্মস্থল ঠিক্ করিয়া নিশানা করা বড় কঠিন। হাঁটা শিকারে সে অসুবিধা হয় না।

গো মহিষাদির ন্যায়, ইহারাও বৎসরে একটা করিয়া বাচ্ছা প্রসব করে। বাচ্ছাগুলি প্রথম প্রথম সাদা 'ফুটি' যুক্ত ও স্বাভাবিক বর্ণ অপেক্ষা কিছু ফ্যাকাসে হয়। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয়। মাদি হরিণের শিং হয় না; হরিণেরও ২।৩ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শিং হয় না। বাঘ যেমন নখ ভোতা হইয়া গেলে, গাছে আঁচড়াইয়া ধারাল করে, ইহারাও সেইরূপ গাছে ঘষিয়া শিং চোখা করে। আরও এক কারণে ইহারা গাছের সঙ্গে শিং ঘসে। শিং উঠিবার সময় উহা চামড়া দিয়া ঢাকা থাকে; উহাকে 'চাম শিঙ্গা' (Velvet Horn) বলে। ভিতরকার শিং শক্ত হইয়া

গেলে, গাছে ঘষিয়া চুলকাইয়া উপরের চামড়া উঠাইয়া ফেলে।

জঙ্গলে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া খেলা করিতে ভালবাসে। বনের মধ্যে একটী স্থান মনোনীত করিয়া, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দলে দলে আসিয়া খেলা করে। ঐ স্থানকে 'খলা' বলে। এই সব 'খলা'র নিকট বিকালে চুপ করিয়া লুকাইয়া থাকিয়া, অথবা সুবিধাজনক কোনও গাছে মাচা করিয়া বসিয়া, অনায়াসেই ইহাদিগকে শিকার করা যায়। আমি ঐরূপ মাচায় বসিয়া, ইহাদিগের খেলার দৃশ্য দেখিয়া এত অভিভূত হইয়া পড়িতাম যে, আমার শিকারের প্রবৃত্তি দূর হইয়া যাইত। কোনও সময় ২।৩টি একত্র হইয়া খেলা করে, কেহ কাহারও গাত্র লেহন করে, কেহ বা আনন্দে লাফাইতে থাকে ; কোন কোনও সময়, দুইটা একত্র হইয়া শিংএ শিংএ ধবাধবি করিয়া, বেশ এক প্রকার খট খট শব্দ উৎপাদন করে, আবার কখনও বা দুই দিক হইতে দুটী stag ডাকিতে ডাকিতে আসিয়া পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়।

রাত্রে হাতীতে চড়িয়া, কাল কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া বন্দুক হাতে আস্তে আস্তে বনের মধ্যে গেলে, অনেক সময় অতি সহজেই হরিণ শিকার করা যায়। এই অবস্থায় হাতীকে না চালাইয়া, হাতী যেন স্বেচ্ছাক্রমে বনে চরিতেছে এই ভাবে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে হয়। হাতী অতি নিকটে গেলেও, হরিণ-গুলি হাতীর দিকে বেকুবের মত হাঁ করিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বোধ হয় ইহারা মনে করে, হাতীগুলিও ইহাদের মতই চরিয়া বেড়াইতেছে।

রাত্রে ইহারা ২।৩ বা ৪টা মিলিত হইয়া, বনের মধ্যে ফাঁকা যায়গায়, অথবা বিলের ধারে কচি ঘাস খাইতে প্রায়ই আসে ; তখনও ইহাদিগকে শিকার করা যায়। বনের নিকটবর্ত্তী শস্য ক্ষেত্রেরও ইহারা

যথেষ্ট অনিষ্ট করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘাস ছাড়া, ইহারা কখনও খায় না।

ইহারা বড়ই ভীত, কিন্তু আহত হইলে কদাচিৎ চার্জ্জও করে। ইহা অবশ্য ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। পলায়ন করাই অবশ্য ইহাদের স্বভাব।

হরিণী মারা পড়িলে, কোন কোনও সময় পেটে ভ্রূণ (বাচ্ছা) পাওয়া যায়; ইহা হলুদ মখাইয়া শুকাইয়া রাখা হয়। এগুলি না কি সূতিকা প্রভৃতি অনেক রোগের ঔষধ। ইহাকে 'গর্ভ শোরা'ও বলে। যদিও আমি কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, কিন্তু সর্ব্বদাই ইহার জন্য অনেক প্রার্থী আসিয়া উপস্থিত হয়। ঠিক এইরূপ বাঘের চর্ব্বি ও জিভের জন্য সর্ব্বদাই লোক জ্বালাতন করে। এই চর্ব্বিতে বাত এবং জিভে প্লীহা রোগ আরোগ্য হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। অনেক কবিরাজ মহাশয়ও একথা বলিয়া থাকেন। শিকারান্তে আমরাও প্রতিবারই এগুলি প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করি।

এই সব বৃহৎ জাতীয় হরিণের মাংস ছোট জাতীয় হরিণের মাংসের ন্যায় সুখাদ্য নয়। বড় হরিণের চামড়াগুলি Tannery হইতে পরিষ্কৃত leather করিয়া আনিলে, অত্যন্ত নরম ও সুন্দর হয়। ইহাদ্বারা জুতা, ব্যাগ প্রভৃতি আবশ্যকীয় জিনিষ তৈয়ার করা যায়; দেখিতেও বেশ সুশ্রী হয়।

স্পটেড্ ডিয়র (চিতল) হগ্ ডিয়র ও বার্কিং ডিয়র

সাবর ও বারশিঙ্গার পরেই চিতল (spotted deer) আকারে ও উচ্চতায়, অন্য হরিণ অপেক্ষা বড় হয়। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গে সাদা ফুটি থাকে বলিয়া, ইহাদিগকে spotted deer বলে। ইহারা দেখিতে

অতি সুন্দর। ইহাদের মাংসও সুস্বাদু। বাঙ্গলার সুন্দরবন, নেপাল ও ভুটান টেরাইর কোন কোন স্থান, যুক্ত-প্রদেশ, নাগপুর, উড়িষ্যা এবং অন্যান্য বহু স্থানে ইহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহারা সর্ব্বদাই দলবদ্ধ হইয়া থাকে। দলের অধিকাংশই হরিণী (Doe), দুই তিনটী মাত্র হরিণ (Buck) থাকে। ঘাস-জঙ্গল অপেক্ষা গাছড়া-জঙ্গলে ইহারা থাকিতে ভালবাসে। ইহাদের শিং সাবরের শিঙের মত তিন ডাল বিশিষ্ট, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সরু হয়। কদাচিৎ দুই একটা এত মোটা দেখা যায় যে সাবরের শিং বলিয়া ভ্রম হয়। সাবর ও চিতলের শিং চিনিবার একটী উপায় এই যে, সাবরের শিং পার্শ্বদেশ হইতে ও চিতলের শিং পশ্চাৎ দিক হইতে বক্র (curved) হয়।

ইহাদিগকে ছোট রাইফেল্ দ্বারা ও নিকটে পাওয়া গেলে Buck shot এ smooth bore gun দ্বারাও শিকার করা যায়।

হগ্ ডিয়র ও বার্কিং ডিয়র, চিতল অপেক্ষা আকারে ছোট। ইহাদের শিংও ছোট এবং তিন ডাল বিশিষ্ট হয়; কিন্তু দেখিতে বেশ সুশ্রী।

হগ্ ডিয়র বাঙ্গলা, আসাম, নেপাল টেরাই ও অন্যান্য অনেক স্থানে দেখা যায়। ইহারা শুষ্ক স্থানে, ও খড় ও ঘাসের জঙ্গলে থাকিতেই বেশী পছন্দ করে।

বার্কিং ডিয়র আবার হগ্ ডিয়র অপেক্ষাও ছোট। ইহারা সমতলভূমি অপেক্ষা পাহাড়ী জঙ্গলে থাকিতেই বেশী ভালবাসে। এগুলির মুখের দুই দিকে দুইটি canine teeth (সাদন্ত বা কুকুরে দাঁত) বাহির হয়। দিবারাত্রির মধ্যে অনেক সময় ইহারা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ শব্দ করিয়া, নিস্তব্ধ পাহাড় প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে; এজন্য ইহাদিগকে 'বারর্কিং ডিয়র' বলে। আমাদের অঞ্চলে ইহাদিগকে 'খাউট্টা' হরিণ বলে।

হগ্ ডিয়র গুলির দৌড়াইবার প্রণালী অনেকটা শূকরের মত। তাড়া পাইলে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, শূকরের মত মাথা নিচু করিয়া, যে যেদিকে পারে দৌড়ায় বলিয়া ইহাদিগকে হগডিয়ার বা 'শূকরা হরিণ' বলে। হাতীর লাইনে ইহারা শতকরা সত্তর আশিটা লাইন ভেদ (cut) করিবার চেষ্টা করে। ইহাই অন্য হরিণের তুলনায় ইহাদের বৈশিষ্ট্য।

আমাদের দেশে গারো পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে ও "ডুদংএর থল" নামক বহুদূর বিস্তীর্ণ উলুখড়পূর্ণ বনে প্রচুর হগ্ডিয়র পাওয়া যায়। হাওদা শিকারীদের পক্ষে বড় হরিণ শিকার অপেক্ষা থলের এই সব ক্ষুদ্রকায় হরিণ যখন নক্ষত্র বেগে দৌড়াইয়া যায় তখন রাইফেল দ্বারা শিকার করা অত্যন্ত বাহাদুরী ও আনন্দদায়ক।

নেপাল টেরাইতে কুশী (কৌশিকী) নদীর চরে ইহারা এত অধিক থাকে যে, হাতী লাইন করিয়া ইহাদিগকে নদীর দিকে তাড়াইয়া নিলে, এক এক স্থানে হাতীর বেড়ের মধ্যে পাঁচ সাত শতও পড়িতে দেখা যাইত। আমাদের ঐ স্থানে শিকারের সময় হাতী লাইন করিয়া হরিণগুলিকে যখন নদীর দিকে কোণঠাসা করা হইত, তখন ইহাদের কতকগুলি স্থানাভাব ও ভীতি-প্রযুক্ত হাতীর পায়ের তলে পড়িয়া পিষ্ট হইয়া যাইত, কতক বা নিরুপায় হইয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ দিত ; আবার কতক বা পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে (collision) শূন্যে উত্থিত হইয়া আছড়াইয়া পড়িত। এইরূপে আমরা প্রত্যহ ঘণ্টা খানেক শিকার করিয়া চার পাঁচ দিনে তিন শত, সাড়ে তিন শত হরিণ মারিয়াছিলাম। এই ভাবে মারাকে নেহাৎ কসাইগিরি (Butchery) মনে করিয়া, আমি দুই একটী মারিয়াই হাওদায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, আমার বন্ধু শিকারী-দের রক্তপিপাসা নিবৃত্তির তামাসা দেখিতাম। হঠাৎ যদি কোনও সময় বলিতাম, আর কেন যথেষ্ট হইয়াছে, তখনই কেহ কেহ

বলিয়া উঠিতেন, "পয়সা দিয়া গুলি বারুদ কেনা হইয়াছে, তাহার সব্ব্যবহার করা চাই ত ?" এই ভাবে হত্যা করাকে, (massacre) গুলি বারুদের সব্ব্যবহার বলে কি না তাঁহারাই ভাল বুঝিতেন।

ইহারা ছোট জাতীয় হরিণ বলিয়া ২নং বা S. S. G. shots দিয়াও শিকার করা চলে।

অন্যান্য সমস্ত জাতীয় হরিণ অপেক্ষা ইহাদের মাংস সুখাদ্য।

এতদপেক্ষাও ছোট আর এক জাতীয় হরিণ আছে ; তাহাদিগকে mouse deer বলে। ইহারা আকারে 'সজারু' অপেক্ষা বড় হয় না ; পিঠে সাদা সাদা লম্বা ডোরা থাকে। বাঙ্গলা ও আসামে ইহা-দিগকে কখনও দেখি নাই ; নাগপুর ও উড়িষ্যা প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে, পাহাড় beat করিবার সময়, সর্ব্বদাই ইহাদিগকে দেখিয়াছি।

নীলগাই, ব্ল্যাক বাক্ ও চিকারা

নীল গাই, ব্ল্যাক বাক্ (কৃষ্ণষাঁড়) ও চিকারা, antelope শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা ইহাদিগকে হরিণের শ্রেণীভুক্ত করেন না। নীল গাইকে অনেকে গো জাতীয় মনে করিয়া শিকার করেন না। বোধ হয় ইহাদের গরুর সহিত কতকটা আকৃতিগত সাদৃশ্য, ও 'গাই' শব্দ নামের সহিত যুক্ত থাকাতেই, এইরূপ কুসংস্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা অত্যন্ত ভুল। ইহাদের আকৃতি ও শিং অনেকটা গবাদি জন্তুর মত হইলেও, কিছুতেই ইহারা ঐ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। তিনটী বিশেষ লক্ষণে ইহারা গবাদি হইতে বিভিন্ন। (১) ইহারা গোময়ের মত লাদি না করিয়া, ছাগল হরিণের মত বড়ি লাদি করে। (২) গরুর গলার

নিচে যেরূপ গলকম্বল থাকে, ইহাদের তাহা থাকে না। (৩) ইহাদের পুরুষগুলির গলার নিচে, চামরের মত কতকগুলি লম্বা লোম থাকে। অন্য কিছু পার্থক্য আছে কি না তাহা প্রাণিতত্ত্ব-বিদেরা ভাল জানেন।

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে। এক এক দলে ২০।২৫টা হইতে ১০০।১৫০ শতও আমি দেখিয়াছি। ইহারা সাবরের সমান উঁচু হয়।

আমি চুনারে থাকা সময় গঙ্গার পরপারে মাঝড়া নামক স্থানের বিস্তীর্ণ 'বাব্‌লা' ও 'কশাড়' বনে ইহাদিগকে বিস্তর শিকার করিয়াছি। সেই সব স্থানে ইহাদিগকে এক এক দলে ২০।২৫টা হইতে আরম্ভ করিয়া ১০০।১৫০ শত পর্য্যন্তও দেখিয়াছি। ঐ সব স্থানে ইহাদিগকে 'রুঝ্' বলে। সম্বলপুর ও উড়িষ্যার কোন কোন স্থানে ইহারা শুধু 'নাল' নামে পরিচিত। ইহাদের পুরুষগুলি যখন গলা উঁচু ও বুক টান করিয়া দাঁড়ায়, তখন অতি মনোরম দেখায়। শীতের প্রারম্ভে ইহারা বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া চলিয়া আইসে, আবার বর্ষার প্রারম্ভে জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপন বাসস্থানে ফিরিয়া যায়।

নীল গাই, কৃষ্ণষাঁড়, চিকারা প্রভৃতি বাঙ্গলা ছাড়া প্রায় অনেক-স্থানেই পাওয়া যায়। কৃষ্ণষাঁড় গুলি প্রায়ই মাঠে মাঠে থাকে; মাঠের তৃণ ও বিবিধ ফসলই ইহাদের খাদ্য। ইহারাও দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে। সময় সময় ইহাদের মর্দ্দা গুলিকে 'ফেটো' অবস্থায়ও পাওয়া যায়; তাহারা দলের সঙ্গে মেশেনা।

দলবদ্ধ অবস্থায় মাদীর (Doe) সংখ্যাই অধিক থাকে; মদ্দা (Buck) ২।৩ টার বেশী থাকে না। হরিণের মত ইহাদেরও মাদী গুলির শিং হয় না। মদ্দা গুলির শিং ঘোরান ঘোরান অর্থাৎ স্ক্রুর মত প্যাঁচ কাটা এক ডাল বিশিষ্ট হয়। হরিণের মত ইহারা

বৎসরান্তে শিং ঝাড়িয়া ফেলে না। ইহাদের যৌবনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্গোদ্গম হইয়া, ক্রমে বড় হয় এবং তাহাই চিরকাল থাকে। মাদী ও অল্পবয়স্ক পুরুষ গুলির পেটের রং সাদা ও পিঠের রং প্রথমে পাট কিলে (Brown) থাকে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মদ্দা গুলির পিঠ মুখ ও গলার রং পরিবর্ত্তিত হইয়া চকচকে কাল হয়; তখন ইহাদিগকে অতি সুন্দর দেখায়। অনেক সময় একই দলে একটী অল্পবয়স্ক ও একটী প্রাচীন, দুই বর্ণের দুইটী কৃষ্ণষাঁড় দেখিয়া অনেকে বিভিন্ন জাতীয় মনে করেন। বাস্তবিক বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রঙের পরিবর্ত্তন হয় মাত্র; নচেৎ ইহারা একই জাতীয়। মাদী গুলির রঙের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। আমি দুই এক স্থানে ২।১টি পালিত দুগ্ধশুভ্র কৃষ্ণষাঁড় দেখিয়াছি। তখন উহাদিগকে আমি বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া মনে করিতাম; বাস্তবিক তাহা নহে। মানুষের শ্বেতি (Leucoderma) রোগের মত ইহাদের albino হইয়া এইরূপ হয় এবং চক্ষুও অনেকটা রক্তবর্ণ দেখায়। এই ব্যারাম হইলে, বর্ণ পরিবর্ত্তন ও চক্ষু লাল হওয়া ব্যতীত, অন্য কোনও রোগচিহ্ন দৃষ্ট হয় না।

কৃষ্ণষাঁড়গুলি খোলা মাঠে দলবদ্ধ হইয়া থাকিবার সময়, বহুদূর হইতে দেখা যায় বলিয়া, ইহাদের মধ্যে ২।৩টা প্রহরীর কার্য্য করে। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়, দলস্থ সকল গুলি শুইয়া বিশ্রাম করিতে থাকিলে ২।১টি দাঁড়াইয়া পাহারা দেয়।

ইহাদের দলস্থিত কোনও একটি হত বা আহত হইলে, অন্য গুলি ক্রমাগত একই স্থানে মুখ উঁচু করিয়া উপরের দিকে লাফাইতে থাকে। এইরূপে তিন চারটি লাফ দিয়া পরে দৌড়াইতে সুরু করে। হঠাৎ কোথা হইতে আক্রান্ত হইল, তাহা দেখিবার জন্যই বোধ হয় ঐরূপ করিয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহারা আক্রান্ত হইয়াই আতঙ্কে লাফাইবার সময় প্রথমে মনে করে যে খুব বেশী

দৌড়াইতেছে ; চার পাঁচ বার লাফাইবার পর ভ্রম বুঝিতে পারিয়া দৌড়াইতে স্থুরু করে।

কৃষ্ণষাঁড় antelope শ্রেণীভুক্ত হইলেও, প্রাচীন যুগ হইতেই ইহারা হিন্দুদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। ইহাদের চর্ম্ম ব্যতিরেকে, ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কার হইতেই পারে না।

চিকারা, কৃষ্ণ ষাঁড় অপেক্ষা আকারে ছোট। ইহাদিগকে মাঠে বড় দেখা যায় না ; ইহারা পাহাড়েই দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে। ইহাদের শিং কৃষ্ণষাঁড় অপেক্ষা সরু ও সোজা এবং সম্মুখে বহু গ্রন্থিযুক্ত হয় বলিয়া ঢেউ খেলান মত দেখা যায়। শিং গুলি ছোট হইলেও দেখিতে বেশ স্থন্দর। কোন কোন স্থানের চিকারার সম্মুখে, ছোট ছোট আরও দুইটি করিয়া শিং হয়। উহাদিগকে Four horned (চৌ শিঙ্গা) চিকারা বলে। ইহাদিগের অসংখ্য আমি মির্জ্জাপুর জিলায় বিন্ধ্য পর্ব্বতে শিকার করিয়াছি।

হাওদা শিকার

"মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ,
সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।
উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে,
মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্বিনোদঃ কুতঃ॥

[কালিদাসঃ]

শিকার মাত্রই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বিভিন্ন প্রণালীর শিকারের মধ্যে, 'হাওদা শিকার'ই অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়াসসাধ্য ; কিন্তু ইহা রাজসিক ব্যাপার। প্রাচীন যুগেও, রাজারা রথারোহণে মৃগয়া করিতেন। পরবর্ত্তী যুগে তাহাই বোধ হয়, হাঁওদা শিকারে রূপান্তরিত হইয়াছে।

হাতী ছাড়া হাওদা শিকার হয় না। বহু অর্থে হাতী ক্রয় করিয়া পালন করিতে পারিলে, হাওদা শিকার করা চলে; কাযেই ইহা এক বিরাট্ ব্যাপার। বড়লোক ছাড়া এই শিকার সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে; কারণ ইহাতে আসবাবও যথেষ্ট দরকার হয়। এক একটা শিকার যাত্রায় তাঁবু, হাওদা, গদী, গাদ্লা, রেশন প্রভৃতি বহুবিধ সরঞ্জাম সঙ্গে লইতে হয়। এক কথায় শিকারের সামগ্রী বাদে, সাংসারিক ছোট বড় অনেক জিনিষ এবং বিলাসিতার অনেক উপকরণও সঙ্গে থাকে। ইচ্ছা করিলে ইহাতে বিলাস সম্ভোগও যথেষ্ট করা যায়।

এই সব শিকার পার্টিতে হাতী, ঘোড়া, উট, গো মহিষের গাড়ী ও ইহাদের চালক এবং অন্যান্য নানা শ্রেণীর লোক সংখ্যা খুব কম পক্ষে ২।৩ শত থাকে। পার্টি আরও বড় হইলে, সংখ্যা আরও বাড়িয়া যায়। ইহারা যে স্থানেই আড্ডা (camp) করে, তাহাই যেন বিভিন্ন পল্লীযুক্ত একটা ছোট গ্রাম বিশেষ হইয়া উঠে। দূর দূরান্তর হইতে ব্যবসায়িগণ, এই সকল লোকজনের নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী, ঘোড়ার পিঠে বা নৌকায় করিয়া আনিয়া, ছোটখাটো রকমের একটি পল্লীহাট বসাইয়া বিক্রয় করে।

এক ক্যাম্পের কার্য্য অন্তে, যখন ইহারা সমস্ত জিনিষপত্র গুটাইয়া স্থানান্তরে ক্যাম্প করিবার জন্য চলিতে থাকে, তখন গরু মহিষ হাতীর গলার ঘণ্টার শব্দ, লোকজনের কোলাহল এবং গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ মিশ্রিত হইয়া, এক অপূর্ব্ব ধ্বনি উত্থিত হয়। শীতকালে কর্ষিত ক্ষেত্র দিয়া চলিবার সময়, ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া, আকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই দৃশ্যে এবং সেই সময় পল্লী-রমণীগণের অন্তরাল হইতে সলজ্জ কৌতূহল দৃষ্টিতে নিম্ন শ্লোক দুইটী তখন আমার মনে পড়িত—

আমাদের জাতীয় বাহিনী রণক্ষেত্রে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে
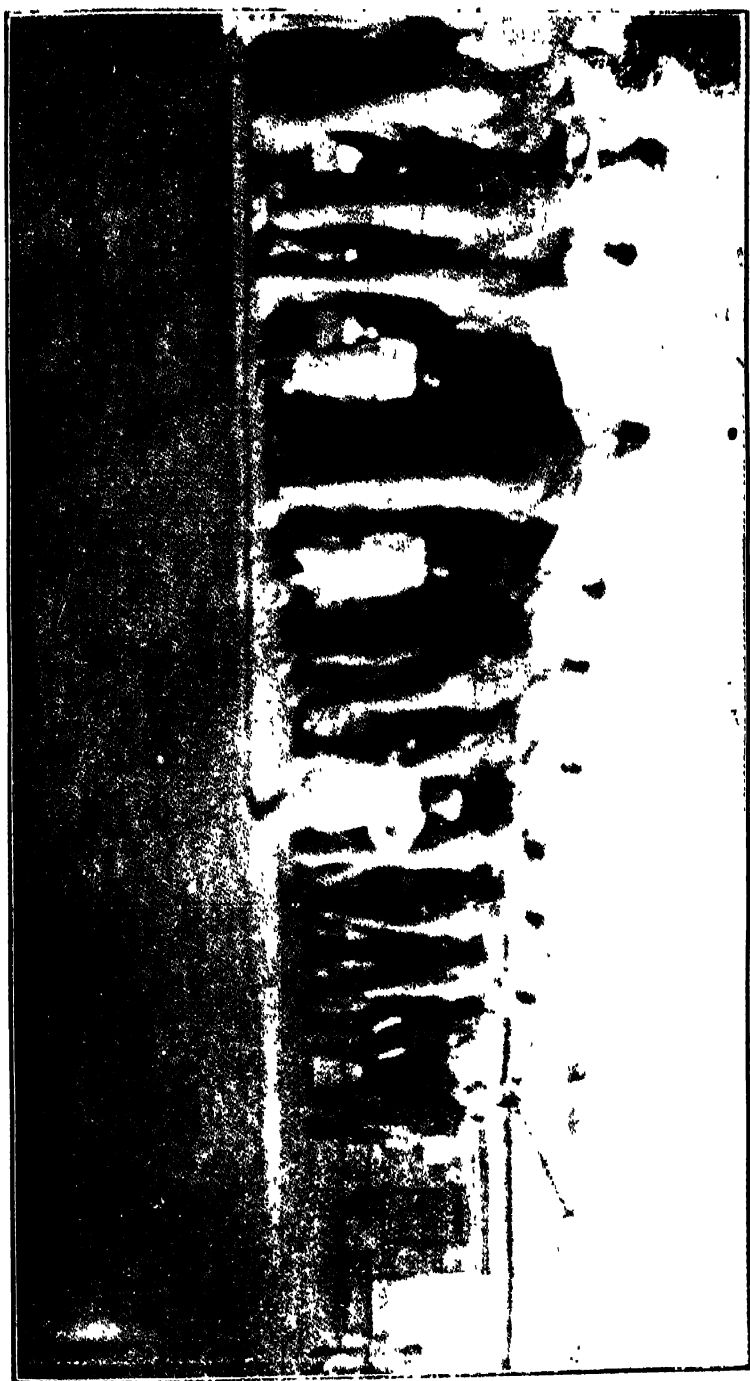
"রজোভিঃ স্যন্দনোদ্ধূতৈর্গজৈশ্চ ঘনসন্নিভৈঃ।
ভুবস্তলমিব ব্যোম কুর্ব্বন্ ব্যোমেব ভূতলম্॥"
"ভয়োৎসৃষ্টবিভূষাণাং তেন কেরলযোষিতাম্।
অলকেষু চমূরেণুশ্চূর্ণ প্রতিনিধীকৃতঃ॥"

[রঘুবংশম্]

হাওদা শিকার সমতল ভূমি ছাড়া পাহাড়ে হয় না। আসাম, গারো হিল, শ্রীহট্ট, নেপাল টেরাই ও ভুটান দোয়ারে, এই জাতীয় শিকার করা যায়। সুন্দর বনের অধিকাংশ স্থানে দাব্ অর্থাৎ দল্‌দলে মাটি থাকায়, হাতী চলাচল করিতে পারে না বলিয়া, হাওদা শিকার চলে না।

যখন জঙ্গলের মধ্য দিয়া ৪০।৫০ কি আরও অধিক হাতী লাইন করিয়া যাইতে থাকে, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। সেই সময় শিকারীদের মনে, আশা ও উত্তেজনা মিশ্রণে, কি যে এক নূতন ভাবের উদয় হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে অনুভব করিতে পারে না।

অন্য যত রকম শিকার আছে, তাহার সবগুলিতেই, শিকারী, নিজকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, নিজ অস্তিত্ব শিকারকে জানিতে না দিয়া, শিকার করিয়া থাকেন। কিন্তু হাওদা শিকার ঠিক তাহার বিপরীত, ইহাতে যেন জানোয়ারকে "চ্যালেঞ্জ" করা হয়। কতকগুলি হাতী জঙ্গল বৃক্ষাদি হড়মড় করিয়া ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে অগ্রসর হইতেছে, আর যেন বিপক্ষ পক্ষকে বলিতেছে—"আমরা তোমাদিগকে মারিব, পার তো আত্মরক্ষা কর বা পলাইয়া যাও।" ইহাতে সর্ব্বদাই জানোয়ারকে তাড়াইয়া শিকার করিতে হয়। তথাপি সর্ব্বদাই আমার মনে হয়, প্রতিদ্বন্দ্বী যেন অসমান।

এই অসম যুদ্ধেও অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। যাঁহাদের হাতীতে চড়া অভ্যাস নাই, তাহাদের পক্ষে হাওদায় শিকার করা

কঠিন ; কারণ হাতীর পিঠে হাওদায়, গদীর উপর দাঁড়াইয়া শিকার করিতে হয় বলিয়া, হাতীতে দাঁড়াইতে না পারিলে শিকার করা একরূপ অসম্ভব।

সাধারণতঃ হাতী দাঁড় করাইয়া শিকার করাই নিয়ম ; কিন্তু অনেক সময় হাতী চলিতে চলিতে, চকিতের মত জানোয়ার দেখিয়া, সেই অবস্থাতেই শিকার করিতে হয়। এই অবস্থায় অনেক সময়ই লক্ষ্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা বেশী। কাযেই হাতী চড়ায় বেশী অভ্যস্ত না হইলে, হাওদায় শিকার করা কঠিন হইয়া উঠে।

খাঁচায় থাকিয়া শিকার করা হয় বলিয়া যদি হাওদা শিকারকে বেশ নিরাপদ মনে করা যায়, তবে তাহাও অত্যন্ত ভুল। জঙ্গলের মধ্যে বহুস্থানে শুষ্ক কূপ, ফাটাল, এবং গর্ত্ত থাকে। হাতী চলিবার সময় সর্ব্বদাই শিকারীকে বন্দুক হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয় বলিয়া, অনেক সময় এত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে হয় যে, হাতী চলিতেছে অথবা কি করিতেছে শিকারীর তাহা কিছুই খেয়াল থাকে না। সেই অবস্থায় হাতী চলিতে চলিতে হঠাৎ গর্ত্তে বা কূপে পড়িয়া গেলে, শিকারীকে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া যাইতে হয় ; সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকও পড়িয়া গিয়া আওয়াজ হইতে পারে। কোন কোন সময় পড়িয়া না গেলেও হাওদায় ধাক্কা খাইয়াও বন্দুক আওয়াজ হইয়া যায় ! কাযেই এই সব অবস্থার জন্য শিকারীর সর্ব্বদাই সাবধানে থাকা উচিত। কোন কোন সময় কাঁটা ও লতা বেষ্টিত গাছড়া জঙ্গলে বন্দুক আটকাইয়া পিছনের দিকে উল্‌টাইয়া পড়িয়া যায় ; সেই সময় জঙ্গলে বাধিয়া নিজেকেই অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িতে হয় ; এর পর বন্দুক রক্ষা করা তখন অতি কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। এই সব কারণে হাওদাতে সর্ব্বদাই এক খানা দা বা বড় ছুরি রাখা উচিত।

একবার আমরা রাঙ্গামাটিয়া নামক স্থান হইতে শিকার করিয়া

ফিরিবার সময়, আমাদের একজন শিকারী বন্ধু স্বর্গীয় ডাক্তার উমেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার হাতী সহ গর্ত্তে পড়িয়া হাওদা সমেত একেবারে উল্‌টাইয়া হাতীর পেটের তলায় পড়িয়া গিয়াছিলেন। সৌভাগ্য যে, সেদিন তাঁহার হাওদা ভাগীরথী নাম্নী একটি অতি শান্ত হাতীর উপর ছিল বলিয়া তিনি দলিত হন নাই; নচেৎ হয় ত সেই দিন হইতেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের শিকার করার সৌভাগ্যের অবসান হইত।

এই সব কারণেই, হাতীতে রীতিমত শক্ত করিয়া হাওদা কসা হইল কি না, দেখিয়া লওয়া উচিত। হাওদা বাঁধা ঢিলা হইলে, এইরূপ দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। মাহুতগণের অমনোযোগিতায়, অথবা হাওদার দড়ি নূতন হইলেও, অনেক সময় হাওদা ঢিলা হইয়া যায়।

আরও একটি বিষয়ে হাওদায় সর্ব্বদাই অত্যন্ত সতর্ক থাকা দরকার। বনের স্থানে স্থানে ঘন ঝোপের মধ্যে মৌমাছির চাক থাকে। চলিবার সময় মাহুতের অসতর্কতায়, হঠাৎ তাহাতে ধাক্কা লাগিলে, তাহার ফল যাহা হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। এই জন্য সর্ব্বদাই হাওদায় কম্বল, র‍্যাগ কিংবা ওয়াটারপ্রুফ-চাদর রাখা উচিত।

একবার আমাদের দেশে, বাড়ীর নিকটেই বাঁসাটি গ্রামে এক লেপার্ড শিকারের সময় শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের হাওদার পিছনে, অদ্বৈত বংশোদ্ভব কোন এক গোস্বামী প্রভু ছিলেন। হঠাৎ এক মৌমাছির চাকে ধাক্কা লাগিয়া, তাঁহার যা দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। শিকারী বাঁধা পোষাকের উপর কম্বল মুড়ি দিতে দিতে দুই চার কামড় খাইয়াই অব্যাহতি পাইলেন, কিন্তু গোঁসাইজী হাতী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করিতে করিতেও অব্যাহতি না পাইয়া, অবশেষে নিকটস্থ

এক পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সে যাত্রায় রক্ষা পাইলেন। ইহার পর তাঁহাকে পাল্কী করিয়া বাড়ী আনিতে হইয়াছিল।

তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া জীব-হিংসার আনন্দ উপভোগ করিতে গিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, প্রকারান্তরে মহাপ্রভু তাঁহার এই প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে তিনি শিকারের নাম শুনিলে, তাহার ত্রিসীমানায়ও যাইতেন না।

বর্ষাকালে শিকারে মৌমাছি বেশী না থাকিলেও, বোল্‌তার উপদ্রব অত্যন্ত বেশী। প্রায় প্রতি ঝোপেই বোলতার চাক থাকে, এবং প্রতিদিনই দশ পনের জনকে কামড়ায়। এমন অবস্থাও ঘটে যে, শিকার সম্মুখে অথচ তখন বোলতার দৌরাত্ম্যে লাইন লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। ইহাতে এক এক সময় এত বিরক্তি বোধ হয় যে, তাহা আর বলিবার নহে। এই গোলযোগে পড়িয়া কোন কোন সময় সম্মুখস্থ জানোয়ারকে একেবারেই হারাইয়া ফেলিতে হয়। একবার হোমিওপ্যাথিক লিডম্‌প্ল্যাচটার নামক ঔষধের মাদার টিন্‌চার ব্যবহারে অত্যন্ত ফল পাইয়াছিলাম। উহা সঙ্গে করিয়া হাওদায় লইয়া যাইতাম ; কাহাকেও বোল্‌তা কামড়াইবা মাত্রই তুলি করিয়া একটু লাগাইয়া দিলে, আধ মিনিট মধ্যে জ্বালা যন্ত্রণা সব উপশম হইয়া যাইত। হাওদায় এই ঔষধটী লইতে আমি সকলকেই পরামর্শ দিই। ইহা চেলা, বিছা প্রভৃতির কামড়েও বিশেষ ফলপ্রদ।

হাতী খুব শিকারী না হইলে হাওদা শিকার ভাল হয় না। হাতী স্বভাবতঃই ভীরু জন্তু ; ইহাদিগকে শিক্ষা (Training) না দিলে শিকার করা কঠিন। হাতী ভয় পাইয়া পলাইতে আরম্ভ করিলে, সহজে ফিরান যায় না। বহু চেষ্টায় মাহুত গজবাগ্ (অঙ্কুশ) মাথায় মারিয়া ফিরাইতে সমর্থ হয়। কতক দূর পর্য্যন্ত ইহারা উচ্ছৃঙ্খল থাকে, পরে ক্রমাগত গজবাগের আঘাতে ফিরিতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় অনেক সময় বিপদের সম্ভাবনাই অধিক।

বিশেষতঃ গাছড়া জঙ্গলের মধ্যে দিয়া হাতী ভয় পাইয়া পলাইলে যে কিরূপ বিপদ হয়, তাহা সহজেই বোঝা যায়। পলাইবার সময় ইহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যে দিকে পারে ছুটিয়া পলায়। সেই সময় খানা ডোবা, কাঁটা জঙ্গল প্রভৃতি কিছুর প্রতিই ভ্রূক্ষেপ করে না।

সকল হাতীই শিকারের ভালরূপ উপযোগী হয় না। শিকার করিতে করিতে কোন কোন হাতী উৎরাইয়া যায়; কোন কোনটী এরূপ শিকারী হইয়া উঠে যে, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুকে কিছুমাত্র ভয় করে না; এমন কি বাঘ লাফাইয়া মাথায় উঠিলেও কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। তখন যেন ইহারা মনে করে, "ভয় কি, আমার রক্ষাকর্ত্তা উপরে আছেন, তিনিই আমাকে রক্ষা কর্‌বেন।" দুই একবার যদি কোন হাতী ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, তাহার উপরিস্থিত শিকারী দ্বারা উহাকে নিহত হইতে দেখে, তাহাতেও ইহাদের সাহস বাড়িয়া যায়।

হাতী শিকারী হওয়া না হওয়ার আর একটী কারণ আছে। প্রথমতঃ মাহুত যদি সুদক্ষ ও সাহসী হয়, তাহা হইলে চলনসই হাতীও ক্রমে ভাল হইয়া উঠে; কিন্তু মাহুতের দক্ষতা ও সাহস শিকারীর যোগ্যতা-সাপেক্ষ। শিকারী আনাড়ি হইলে মাহুতের দিল ছোট হইয়া যায়। সুতরাং হাতীর শিকার-পাণ্ডিত্যে মাহুত ও শিকারীর পরস্পরের যথেষ্ট সংযোগ আছে। সাধারণতঃ হাতী একটু বয়স্থ হইলে, সাহসী হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। মানুষের ন্যায় ইহারাও ক্রমে দেখিয়া শুনিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে পরিপক্কতা লাভ করে। কোন কোন হাতী আজীবনই বজ্জাত ও ভাগড়া থাকিয়া যায়। সাধারণতঃ মেনা ও মেনী হাতীগুলি অধিকতর চঞ্চল হয়। ৭ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ মদ্দা ও মাদী হাতীকে সচরাচর মেনা ও মেনী হাতী বলে।

হাওদার হাতী একটু উচ্চ হইলে শিকারে সুবিধা, কারণ অনেক

সময় জঙ্গল এত উচ্চ হইয়া পড়ে যে, হাতী হাওদা শুদ্ধ তার মধ্যে ডুবিয়া যায়। তখন উচ্চ হাতী হইলে, অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়; এবং এইরূপ ঘন জঙ্গল, হাওদা পিঠে করিয়া অপেক্ষাকৃত সহজে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

হাওদা শিকারে আর একটী বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া আবশ্যক। হাওদা শিকার কেন, সব রকম শিকারেই এইরূপ সতর্ক হওয়া উচিত। শিকার দেখিয়া অনেক সময়ই বন্দুক হাতে উঠাইয়া দুই ঘোড়া (double cock) তোলা হয়; কিন্তু কোন কারণে আওয়াজ করা না হইলে বন্দুক হাওদায় নামাইয়া রাখা হয়; তখন ঘোড়া নামাইয়া single cock বন্দুক করিয়া রাখা উচিত। ডবল কক্ বন্দুক ভুলিয়া নামাইয়া রাখিলে, অনেক সময় দুর্ঘটনা হওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে। হাওদায় বন্দুক রাখিবার ৪টী করিয়া স্থান থাকে তাহা-দিগকে gun rest বলে।

হাতী লাইন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেই শিকারীকে বন্দুক হাতে করিয়া প্রস্তুত হইয়া হাওদার উপর দাঁড়াইতে হয়। হাতের গোড়ায় বন্দুক আছে, যখন ইচ্ছা তুলিয়া লইতে পারিব মনে করিলে, তাড়াতাড়ির সময় বন্দুক উঠাইয়া কদাচিৎ মারা যায়।

হাওদা শিকারে বন্দুক সম্বন্ধে খুব সতর্ক না থাকিলে যে কিরূপ সাংঘাতিক বিপদ সময় সময় উপস্থিত হয়, তাহার দুইটী উদাহরণ নিম্নে দিতেছি।

একবার আমরা নেপালে শিকার করিবার সময়, শিকারান্তে একদিন তাঁবুতে ফিরিতেছি, মধ্যে প্রকাণ্ড কুশী (কৌশিকী) নদী। সকল হাতীই হাওদা ও গদী সমেত আরোহী লইয়া পার হইতেছে। কোন কোন স্থানে জল বেশী থাকায় হাতীগুলি সাঁতরাইয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা এলোমেলো ভাবে পার হইতেছিল। এক হাওদায় স্বর্গীয় মনু বাবু ও কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায় ছিলেন। এই হাওদার পশ্চাতে, এক গদীর হাতীতে বাপুজী নামক এক বৃদ্ধ শিকারী ছিলেন। বাপুজী গদীতে চড়িয়া শিকার করিতেন বলিয়া তাঁহার হাতে সর্ব্বদাই একটী হেন্‌রি মার্টিণি রাইফল্‌ থাকিত। মনুবাবুর হাতীর পিছনেই, বাপুজীর হাতীও সাঁতরাইয়া পার হইতেছিল। হাতী পার হইবার সময়, সেই আন্দোলনে বাপুজীর পক্ষে বন্দুক রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। খানিক পরেই আমরা দেখিতে পাইলাম, বাপুজী তাঁহার বন্দুকটী যোগেন বাবুকে হাওদায় রাখিতে অনুরোধ করিলেন। যোগেন বাবু বন্দুক লইবার জন্য হাত বাড়াইয়াছেন, বাপুজীও বন্দুক দিতেছেন, এই সময় ধাক্কা লাগিয়া বাপুজীর হাতেই বন্দুক আওয়াজ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই যোগেন বাবু দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন ও মনুবাবুর মাথার সোলাহ্যাট্‌ উড়িয়া গিয়া জলে পড়িল। সেই সময় সকলেই কি হইল কি হইল বলিয়া গোল করিয়া উঠিল। গুলি যোগেন বাবুর মুখের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়া, মনু বাবুর টুপিতে লাগিয়াছিল। বারুদের আগুনের হল্কাতে যোগেন বাবুর গোঁফ ও মুখ, স্থানে স্থানে পুড়িয়া গিয়াছিল।

এই ঘটনার পর, বাপুজী কয়েকদিন স্তব্ধ হইয়া ছিলেন। তাঁহার আত্মগ্লানির মাত্রা কিছু কমিয়া আসার পর, তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছিলেন। যদি পূর্ব্বেই বন্দুক হইতে গুলি খুলিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে আর এরূপ দুর্ঘটনা হইত না।

আর একবার গুলি মাটিতে লাগিয়া, পিছলাইয়া (glance) গিয়া, এইরূপ একটি বিপদ ঘটিয়াছিল। সেও আজ ১২।১৪ বৎসর আগেকার ঘটনা। আমরা গারো পাহাড়ের নীচে আরালিয়া নামক স্থানে, ক্যাম্প করিয়া শিকার করিতেছিলাম। একদিন সংবাদ পাইলাম, বাউসামের বাথানে একটি জংলী মহিষ বা বয়ার আছে। বাউসাম একটি প্রকাণ্ড হাওর বা বিল। এই স্থানে অনেকেই মহিষ

পোষে এবং অনেক সময় সেখানে ২।৩টি বাথানে ৪।৫ শত মহিষও থাকে। বাথানিয়ারা ও কতকগুলি গোয়ালা একদিন আসিয়া জানাইল যে, বয়ারের উৎপাতে ওখানে বাথান রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে এবং গোয়ালেরা দুধের জন্য, বাথানে যাতায়াত করিতে পারে না। এই জন্যই বোধ হয় উহারা এত আগ্রহের সহিত আমাদের শরণাগত হইয়াছিল। মহিষটা ক্রমাগত দৌরাত্ম্য করিতে করিতে এত বদ্-মায়েস হইয়া উঠিয়াছিল যে মানুষ ত দূরের কথা, হাতী দেখিয়াও প্রায় ভয় পাইত না।

আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে হাওদায় না গিয়া, মাত্র ৩।৪টি গদীর হাতী লইয়া, আমরা ২।৩ জন শিকারী যাইব। পরদিন প্রত্যূষে মনু বাবু, রাজা জগৎকিশোর ও আমি, তিন হাতীতে তিনটি রাইফল লইয়া বাহির হইলাম। খানিক দূর গিয়াই, একটা প্রকাণ্ড বন তুলসীর জঙ্গলে, বয়ারটিকে, ২।৩টী পালিত মাদী মহিষের সঙ্গে দেখিতে পাইলাম। দূর হইতে যদৃচ্ছা গুলি না করিয়া, যতদূর সম্ভব নিকটে গিয়া মারিব স্থির করিয়া, তিনজন তিন দিক হইতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমরা খানিক অগ্রসর হইতেই, পালিত মহিষ কয়টী চলিতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উদ্দিষ্ট বয়ারও চলিতে লাগিল। ক্রমেই দূরে যাইতেছে দেখিয়া গুলি করা হইল। সৌভাগ্য যে, প্রথম গুলিতেই উহার ডান পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, ভাঙ্গা পা লইয়া দৌড়াইতে লাগিল। আমরাও উহার পাছে পাছে দৌড়াইয়া গুলি বৃষ্টি করার পর, উহাকে নিধন করিলাম। আমরা যখন ক্রমাগত গুলির পর গুলি করিয়া মহিষকে নিস্তেজ করিতেছিলাম, তখন হঠাৎ একটি গুলি গাছের একটী সরু ডালে লাগিয়া পিছলাইয়া বোঁ বোঁ শব্দে মনু বাবুর পায়ের খানিক চামড়া ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। আর একটু হইলেই পা খানা, বাউ-সামের হাওরে রাখিয়া, কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া কাঠের পা

লাগাইয়া, দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইতে হইত। যদিও ইহা আমাদের স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়, তথাপি আমাদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

শিকারে, সময় সময় এইরূপ নানা অবস্থার মধ্য দিয়া, নিজেকে ও অপরকে বিপন্ন করিয়া, আমার বেশ ধারণা হইয়াছে যে, বন্দুক ও গুলি বারুদ সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। এই সব বনে, অনেক সময়ই বন কামলারা নলখাগড়া ইত্যাদি কাটে; কেহ কেহ বা বিলে মাছও ধরে। খুব সতর্ক হইয়া গুলি না চালাইলে, মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কোন কোন সময়, হাতী যখন দৌড়ায় তখন গুলি করিলে, গুলি গাছে বা মাটিতে লাগিয়া ছিটকাইয়া উঠিয়া যায়; তখন তাহার গতিবেগ বাড়িয়া জোর অত্যন্ত বেশী হয়।

হাওদা শিকার তিন প্রণালীতে হইয়া থাকে।

(১) জঙ্গল ভাঙ্গা হাতী (Beater) ও হাওদার হাতী এক সঙ্গে লাইন করিয়া যাওয়া।

হাওদার হাতীকে, সর্ব্বদা লাইনের হাতী অপেক্ষা, ২।১ হাত অগ্রে রাখাই কর্ত্তব্য। এইরূপ লাইন করিয়া সব হাতী সমভাবে গেলেও, অনেক স্থানে বনের তারতম্যে, হাতীগুলি অগ্র-পশ্চাৎ হইয়া পড়ে। তখন আগের হাতীকে দাঁড় করাইয়া, পাছের হাতীর জন্য অপেক্ষা করা উচিত। ইহা লক্ষ্য না করিলে, হাওদা শিকার হইতেই পারে না।

কোন কোন সময় হাতী ২।৩ লাইন হইয়া পড়িলে, মাহুতদিগের তাহা বড় লক্ষ্য থাকে না; কারণ, তাহারা অনেক সময়ই বনের মধ্যে প্রায় ডুবিয়া যায়। এজন্য শিকারীরই তাহা লক্ষ্য রাখা উচিত। কোনও স্থানে লাইন ডাইনে কি বাঁয়ে ঘুরাইতে হইলে, একটি একটি করিয়া হাতী ক্রমে না ঘুরাইয়া, সবগুলি এক সঙ্গে ঘুরাইবার চেষ্টা

করিলে, লাইন নষ্ট হইয়া যায়। লাইনের উভয় প্রান্তের হাতী দুইটীতে দুইটি নিশান থাকিলে, উহা দেখিয়া লাইন পরিচালনা করার সুবিধা হয়। অনেক সময় ঘন বনে মাহুতেরা 'সোরগোল' করিয়া যাইতে থাকে; সেই শব্দেও লাইন ঠিক্ রাখা যায়। কিন্তু যতই চেষ্টা করা হউক না কেন, ঘন বনে লাইন ঠিক রাখা বড়ই কঠিন।

কোন জানোয়ার সম্মুখে পড়িলে, কোন শিকারীরই লাইন ছাড়িয়া একা বা সঙ্গে আরও ২।১টি হাতী লইয়া, উহাকে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া অত্যন্ত অন্যায়। ইহা শিকার-বিধির বিরোধী; ইহাতে শৃঙ্খলা (discipline) একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। সেই সময় অন্য শিকারীর সম্মুখে কোন শিকার পড়িলে, তাহার শিকারের বিঘ্ন ঘটে; নিজেরও সাফল্যের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। আমাদের পার্টিতেও কোন কোন বন্ধুর, এই অভ্যাসটি অত্যন্ত প্রবল ছিল; কিছুতেই তাঁহাদিগকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করা যাইত না। তবে কাহারও শিকার জখম হইলে, অবস্থা বিবেচনায় ২।১ স্থলে ঐরূপ করিতে হয়।

লাইন করিয়া যাওয়ার সময়, কাহার সম্মুখে জানোয়ার বাহির হইবে, তাহা অনিশ্চিত। একের সম্মুখের শিকারকে, পার্শ্ববর্ত্তী অন্য কোন শিকারীর গুলি করা, বা অগ্রসর হইয়া তাহার সম্মুখে যাইয়া পড়া অত্যন্ত অসভ্যতা। হয় ত সম্মুখস্থ শিকারী, জঙ্গলের অবস্থার জন্য শিকার দেখিতে পান নাই, অথবা দেখিতে পাইয়াও মারিবার জন্য ভালরূপ সুযোগের অপেক্ষায় আছেন, এই অবস্থায় অপরের এইরূপ ব্যবহার একেবারে নীতিবিরুদ্ধ। তবে কোন সময় যদি এরূপ অবস্থা ঘটে যে, সম্মুখস্থ শিকারী কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না; অথচ ক্ষণমাত্র বিলম্বে শিকার হাতছাড়া হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, তখন অপর শিকারীর উহা মারা দোষাবহ নহে।

স্থূল কথা এই যে, প্রত্যেক শিকারীরই নিজ নিজ সম্মুখস্থ শিকার মারা নিয়ম। কিন্তু কেহ কোন শিকারকে জখম করিয়া দিলে, অন্য শিকারী যদি তাহা সম্মুখে পাইয়াও না মারেন, তবে আর একত্র শিকার করা চলে না। অন্যের শিকার মারিতে যাই কেন, এইরূপ হিংসামূলক বুদ্ধি হইতে, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ শিকার মারিতে হইবে, এই নীতি অনুসরণ করিলে, বার আনা শিকারও 'ব্যাগ্' করা যায় না।

(২) দ্বিতীয় প্রণালীর হাওদা শিকারে শিকারীকে স্থানে স্থানে হাওদাসহ নাকায় Stopএ দাঁড়াইয়া, beater হাতী দ্বারা জঙ্গল ভাঙ্গাইতে হয়। যে সকল স্থান দিয়া জানোয়ারের পালাইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাকে 'নাকা' বলে। আর একটী কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত, যে সকল শিকারীর উপর বেশ নির্ভর করা যায়, তাহাদিগকেই 'নাকায়' দাঁড়াইতে দেওয়া সঙ্গত। কোন জঙ্গলে ২।১টী মাত্র 'নাকার' স্থান থাকিলে, সেই কয়েকটী শিকারীকে তথায় দাঁড়াইয়া, অবশিষ্ট শিকারীদিগকে লাইনের সঙ্গে যাইতে হয়। এই জাতীয় 'নাকায়' দাঁড়াইয়া শিকার, বাঘ শিকারের সময়ই ভাল হয়। যদি বাঘ,মরি (kill) করিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যায় এবং সীমাবদ্ধ জঙ্গল না হয়, তবে অনেক সময় লাইনের শব্দে দূর হইতেই বাঘ, বিস্তৃত জঙ্গলে সরিয়া পড়ে; এই অবস্থায় সুবিধামত 'নাকার' স্থান গ্রহণ করিতে পারিলে, খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। যে সব শিকারী 'নাকায়' থাকিবেন তাঁহাদের জঙ্গল বা গাছের আড়ালে দাঁড়ানই বিধেয়; কারণ, শব্দ পাইয়াই লাইনের হাতী পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বে 'নাকার' সম্মুখে, শিকার আসিয়া উপস্থিত হয়। শিকার আসিয়াই যদি নাকায় হাতী দেখিতে পায়, তবে ফিরিয়া যায়— অথবা বিপথে বাহির হইয়া পড়ে। আবার কোনও সময় ইহারা ফিরিয়া গিয়া, লাইনের হাতী ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। যে স্থানে লুকোচুরি,

সেই স্থানেই বিপদ আশঙ্কা করিয়া, প্রকাশ্য শত্রুর সম্মুখীন হইতে দ্বিধা বোধ করে না। হাঁটা বা মাচা শিকারে এইরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। নাকার হাতীতেও শিকারীকে খুব সাবধানে বন্দুক লইয়া সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়; কারণ কোন্ সময় সুযোগ পাওয়া যাইবে তাহা অনিশ্চিত এবং তাহা একবার হারাইলে আবার পাওয়া কঠিন।

(৩) নেপাল টেরাইতে কর্ণেল খড়গজঙ্গের নেতৃত্বে, আমরা অন্য এক প্রণালীতে হাওদা শিকার করিয়াছি। Beater হাতী দ্বারা লাইন রচনা করিয়া, হাওদার হাতীগুলি লাইনের ৫০।৬০ গজ সম্মুখে সমদূরবর্ত্তী হইয়া, সমস্ত লাইন জুড়িয়া, আগে আগে চলিতে থাকে, লাইন পিছনে পিছনে আইসে। এই প্রণালীর শিকারে আমরা বিশেষ ফল পাই নাই। ইহা আমি মোটেই পছন্দ করিতাম না।

বাঙ্গলা ১২৯৭ সনে আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর পর হইতে আমি শিকার আরম্ভ করি। প্রথম বৎসরই মুক্তাগাছার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী, আমার পূজনীয় খুল্লতাত শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের শিকারপার্টিতে যোগদান করি। তখন সেই পার্টিতে গোবরডাঙ্গার স্বনামখ্যাত জমিদার ৺জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ওরফে মনুবাবু শিকার করিতেন। তাহারা আমার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই শিকার আরম্ভ করিয়াছিলেন।

শিকার সম্বন্ধে তখন আমার বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না। ধরিতে গেলে আমার খুড়া মহাশয়ই, আমাকে শিকার শিখাইয়াছেন। বলিতে কি, শিকার সম্বন্ধে তিনি আমার গুরুস্থানীয়। আমার উপর তিনি যথেষ্ট স্নেহশীল বলিয়াই, অধিকাংশ শিকারেই নিজের স্বার্থের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া, আমায় সুবিধা করিয়া দিতেন। তাহার ন্যায় সদাশয় মহাপুরুষ, আমি জীবনে কমই দেখিয়াছি। শিকার কেন, সর্ব্ব বিষয়েই তাহার ন্যায় দেবচরিত্র লোক এতদঞ্চলে

বিরল। স্বর্গগত মনুবাবুর সঙ্গেও এই শিকার উপলক্ষে প্রথম পরিচিত হইয়া, পরে বান্ধবতার দৃঢ়বন্ধনে এরূপ বাঁধা পড়িয়াছিলাম যে, তাহার শেষ দিন পর্য্যন্তও সেই শিকলে মরিচা ধরে নাই। তাহার শেষ মুহূর্ত্তে যে আমি তাহার শয্যাপার্শ্বে থাকিতে পারিয়াছিলাম এ জন্য নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করি। বন্ধুর ভালবাসা যে কি স্বর্গীয় জিনিস, ইহা আমি তাহার ভালবাসা হইতেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। আমার জীবনের অধিকাংশ শিকারই ইঁহাদের সঙ্গে একত্রে করিয়াছি। অনেক সময় কারণাধীনে আমি পৃথক শিকারও করিয়াছি।

আমাদের এই সুদীর্ঘ কালের সাধনার ফল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করা এক অসম্ভব বিরাট ব্যাপার। ইহার বহু ঘটনায় বিশেষ বৈচিত্র্য না থাকায় পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইব না। তবে যে সব বিশেষ বিশেষ ঘটনায় ও অবস্থায় বিভিন্ন জাতীয় জন্তুর স্বভাব পরিস্ফুট হইয়াছে—"সত্ত্বনামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিম চ্চত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ"—এবং নিজেরা অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হইয়াও কি উপায়ে মুক্ত হইয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিব। আশা করি ইহা দ্বারা পাঠককে কথঞ্চিৎ আনন্দ দান করিতে পারিব।

আমাদের এই সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী শিকারে যে কত স্থানে কত রকম অবস্থার মধ্য দিয়া, কত শিকার করিয়াছি, তাহা এখন ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ি। এ পর্য্যন্ত আমাদের পার্টিতে খুব কম হইলেও দুই শতাধিক বাঘ bagged হইয়াছে। আহত, অনাহত বাঘও শতাধিক ফস্‌কাইয়া গিয়াছে। হরিণ ও মহিষ যে কত শিকার করা হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ হিসাব (রেকর্ড) আমরা রাখি নাই, রাখাও অসম্ভব।

লেপার্ড অধিকাংশ সময় আমরা দেশেই মারিয়াছি। তখন আমাদের মুক্তাগাছার নিকটবর্ত্তী স্থানে, চতুর্দ্দিকে দশ মাইলের মধ্যে,

যথেষ্ট জঙ্গল ছিল। ইহার জন্য কষ্ট করিয়া দূরে যাইবার আবশ্যক হইত না। তবে আমাদের পার্টিতেও যে লেপার্ড শিকার না হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু তাহার সংখ্যা বেশী নয়। প্রতি বৎসর আমরা বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়াই ১০।১৫টা করিয়া লেপার্ড মারিতাম। আমি নিজেও খুব কম পক্ষে ১০০।১৫০ লেপার্ড মারিয়াছি। আর এখন বোধ হয়, গত ১০।১২ বৎসরের মধ্যে বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী লেপার্ডেরও সংবাদ শুনিতে পাই নাই। এ সবই পাটের মহিমা! দেশে পাটের আবাদ আসিয়া গ্রামে আর জঙ্গল নাই বলিলেই হয়।

হায়রে পাট! তোমার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া দেশের চাষারা রাতারাতি বড়লোক হইবার প্রলোভনে জঙ্গল সাবাড় করিয়া শিকার ত দুর্ল্ভ করিয়াছেই; এককালে বাজারের মাছও দুর্ম্মূল্য করিয়াছিল। কয়েকদিন পাটের টাকার গর্ব্বে ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া, চারি আনার মাছ এক টাকা দিয়াও তাহারা কিনিয়াছে; কিন্তু ঘরে যে এক সের চাউলও নাই, একবারও তাহা চিন্তা করিয়া দেখে নাই। ফৌজদারী কোর্টেও ইহার প্রভাব যথেষ্ট দেখা গিয়াছে। দেশের বন জঙ্গল সাবাড় হওয়ায় জ্বালানি কাঠের অভাবে কয়লার সঙ্গে সঙ্গে ডিস্‌পেপসিয়ারও আমদানী হইয়াছে; কিন্তু বিগত মহাসমরের সময় হইতে পাটের সে মোহিনী মূর্ত্তি আর নাই। সমতা রক্ষা করিয়া উভয় কূল বজায় রাখিলে, কৃষকদিগকে আজ পর-মুল্য নির্দ্দেশ-প্রত্যাশী হইয়া স্বার্থান্ধ বিদেশী বণিকগণের খেয়াল চরিতার্থ করিয়া আত্মবলি দিতে হইত না।

প্রথম কিছুদিন আমাদের শিকার পার্টিতে, শ্রীযুক্ত রাজা জগৎ-কিশোর আচার্য্য চৌধুরী, ৺জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ৺মহেশ কিশোর আচার্য্য চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বরদাকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও আমি এই কয়জন ছিলাম। কিছুদিন পরে বরদা বাবু শিকার ছাড়িয়া

দিলে, আমরাই কয়েক বৎসর শিকার করি। তাহার পর, আমার অনুজ ৺সুরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ও কুমার শ্রীমান্ জিতেন্দ্র-কিশোর আচার্য্য চৌধুরী পর পর আসিয়া যোগ দেন। কিছুদিন পরে মহেশ বাবু, পরে আমার ভ্রাতা ও সর্ব্বশেষে মনুবাবু আমাদের ছাড়িয়া তাঁহাদের সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। "অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।"

বাঘ অত্যন্ত সতর্ক জন্তু। একস্থানে কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। কোন কোন সময় গুরু ভোজনের পর, ইহাদের নিদ্রা এত গভীর হয় যে, সহজে জাগ্রত হয় না।

একবার আমাদের দেশে ভবানীপুর নামক স্থানে ক্যাম্প্ করিয়া আমি ও রাজা জগৎকিশোর শিকার করিতে যাই। ঐ স্থানের জঙ্গলে অনেক কাঁটা বাঁশ (Spear bamboos) ও গারো বাদা থাকায়, হাতী দ্বারা শিকার করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। আমাদের দেশে জঙ্গলে গারোরা আসিয়া স্থানে স্থানে 'জুম' করে। উহাদিগকে লাম্‌দানী গারো বলে। পাহাড়ের নিম্নভূমিতে বসতি করে বলিয়া ইহাদের ঐ প্রকার নামকরণ হইয়াছে। উহারা ৩।৪ বৎসরের অধিক একস্থানে থাকে না। উহারা চলিয়া গেলেই ঐসব স্থানে ভয়ানক কাঁটা জঙ্গল জন্মে; উহাকেই "গারো বাদা" বলে। গারো বাদাতে হাতী প্রবেশ করা অসম্ভব। আমরা ২।৩ শত প্রজা সংগ্রহ করিয়া, হাতীর সঙ্গে একত্রে জঙ্গল ভাঙ্গাইতাম; এবং কয়েক দিনের উপর্য্যুপরি চেষ্টাতেও কোন ফল পাই নাই। কিন্তু এমন রাত্রি ছিল না যে বাঘের ডাক শোনা না গিয়াছে, অথবা মরি (kill) না করিয়াছে। আমরা যখন কয়েক দিনের ক্রমাগত চেষ্টাতেও অকৃতকার্য্য হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিব মনে করিতেছিলাম, এমন সময় একদিন এক ফকির আসিয়া মন্ত্র পড়িয়া বাঘ দেখাইবে

বলিল। অন্ধ বিশ্বাসী প্রজাদের অনুরোধে একদিন সেই ফকিরকে লইয়া শিকারে বাহির হইলাম। ফকির হাতীতে উঠিয়াই, খানিক ধুলি হাতে লইয়া উড়াইয়া দিয়া একদিকে আমাদিগকে যাইতে বলিল, আমরাও তাহাই করিলাম। প্রাতে ৮টা হইতে আরম্ভ করিয়া বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া আমরা সকলেই এত পরিশ্রান্ত ও বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তখন ঐ ফকিরকে 'যে পায় সেই মারে' এই অবস্থা হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহার প্রহারের অধিক দুর্দ্দশা হইয়াছিল। তখন বুঝিতে পারি নাই যে মাহুতেরা দুষ্টামি করিয়াই তাহাকে এক বদ্ হাতীতে উঠাইয়া দিয়াছিল। খানিক পরে দেখা গেল এক মাহুত ফকিরকে হাতী দিয়া ঝাড়াইয়া ফেলিয়া তাহার দুর্দ্দশার চূড়ান্ত করিয়াছে। যাহা হউক, ফকিরের এই দুর্দ্দশার পর পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইল যে আরও খানিক দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া হইবে। পরামর্শ হইল বটে, কিন্তু অত্যন্ত পরিশ্রম হওয়ায় লাইনের প্রতি কাহারও তেমন মনোযোগ হইল না। খানিক দূর লাইন করিয়া যাওয়ার পর, এক স্থানে অত্যন্ত কাঁটা ছিল বলিয়া লাইনের অন্যান্য হাতী ও লোকজনের অপেক্ষায় হাওদার হাতীগুলি দাঁড় করাইতে হইল। Beater হাতী ও লোকগুলি ৪০।৫০ গজ পিছনে, ভয়ানক সোর-গোল করিয়া আসিতেছিল। কেহ বা হাতী দিয়া বাঁশ ও গাছ ভাঙ্গিতেছে, কেহ বা 'দা' দিয়া জঙ্গল কাটিতে কাটিতে আসিতেছে, এইরূপে অগ্রসর হইয়া আমাদের সহিত মিলিতে উহাদের প্রায় ১৫ মিনিট সময় লাগিয়াছিল।

জঙ্গলের ত এই অবস্থা। এখন বাঘের ঘুমের কথা বলিতেছি। এইরূপ ভীষণ গোলযোগের মধ্যে আমরা দাঁড়াইয়া আছি; রাজা জগৎকিশোর আমার ৩০।৪০ হাত দূরে একটি কাঁটা বাঁশের ঝোপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া 'দা' দিয়া বাঁশের 'খড়্‌কে' তৈয়ার করাইতেছিলেন।

অনেকক্ষণ পরে তাঁহার হাওদার পিছনের লোক হঠাৎ তাহাকে বলিল, "হুজুর বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে একটা কি যেন দেখা যায়।" তিনি অনেক উঁকিঝুঁকি দিয়াও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পরন্তু ইহা লইয়া তাহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। হাতীকে এদিক ওদিক নানা স্থানে সরাইয়া, একস্থানে যেন হল্‌দে সতরঞ্চির মত কি একটা পড়িয়া আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তারপর আর কিছুক্ষণ উঁকিঝুঁকি করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইলেন, সাদা কি একটা একটু একটু নড়িতেছে। বাস্তবিক উহা বাঘের পেটের সাদা লোমগুলি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ নড়া স্থান লক্ষ্য করিয়াই তিনি ১২-বোর রাইফেলের একগুলি করিলেন। তখন পিছনের Beater হাতী এবং লোকজনগুলি প্রায় আসিয়া পড়িয়াছিল। গুলির সঙ্গে সঙ্গে বাঘটী ভয়ানক ডাক দিয়া 'ঝটাপটি' করিয়া দৌড় দিল, ইহার পরই আমরা তাড়াতাড়ি যতদূর সম্ভব লাইন ঠিক করিয়া খানিকদূর যাইয়া দেখি, বাঘটীর পেটে গুলি লাগিয়া নাড়ি ভুঁড়ি বাহির হইয়া গাছের মধ্যে একদিক্ আট্‌কাইয়া গিয়াছে। বাঘটী উহা টানিয়া বড়শিতে মাছ গাঁথার মত ১০।১২ হাত দূরে গিয়া পড়িয়াছে। পরে আর এক গুলিতে উহাকে শেষ করা গেল। পরে দেখা গেল উহা একটি বাঘিনী, মাপে ৯ ফিট ৩ ইঞ্চি।

বাঘিনীকে মারার পর ফকিরের আস্ফালনে মাহুতেরা কিছু দমিয়া গেল। "ঝড়ে বক মরিল, ফকিরেরও কেরামত বাড়িল।" পূর্ব্বদিন ফকির যতটুকু নাকাল হইয়াছিল, পরদিন মাহুতদের দেওয়া 'খোদার সিন্নি' খাইয়া তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়াও সমধিক লাভবান হইয়াছিল।

এই ঘটনা হইতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, অনেক সময় বাঘেরা ঘুমে কুম্ভকর্ণকেও পরাস্ত করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে বহু চেষ্টার ফলে অকালে কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; কিন্তু ৫০টি হাতী

ও বহু লোকজনের সোরগোলেও মৃত্যুর পূর্ব্বে এই হতভাগ্য পশুর ঘুম ভাঙ্গে নাই। ইহার পর আরও ২।১ স্থানে ঘুমন্ত বাঘ দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাদের নিদ্রা এত গভীর নহে—গোলমাল শুনিয়াই জাগিয়া পড়িয়াছে।

যে বাঘ মানুষের ত্রিসীমানায়ও আসিতে চায় না, তাহাদের আর একটী আশ্চর্য্য স্বভাব এই যে খুব বেশী ক্ষুধার্ত্ত হইলে অনেক সময় লোকজন গ্রাহ্য করে না। নিম্নের ঘটনা দুইটি হইতে ইহাদের এইরূপ বিরুদ্ধ স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

একবার শিলেটের 'চন্দ্রপুর' ক্যাম্প্ হইতে আমরা কোন এক স্থানে শিকার করিতে গিয়া বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় রাস্তায় একজন লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিল, "হুজুর বাঘ ব্যাড়ো"—অর্থাৎ এক বাঘকে বেড় দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়া সে আমাদিগকে সংবাদ দিতে আসিয়াছে। লোকটা এত দ্রুত আসিয়াছিল যে, কিছুক্ষণ উহার মুখে কথাই সরিতেছিল না। উহার নিকট সমস্ত অবস্থা শুনিয়া সেখানে গিয়া দেখিলাম যে, কোন গৃহস্থের বাড়ীর সংলগ্ন একটা ক্ষুদ্র নল-বনে (যেখানে বাঘ আসিবার কোনই সম্ভাবনা নাই) রাত্রে কোন্ সময় যে বাঘ আসিয়ছে তাহা কেহ টের পায় নাই। ঐ স্থানটি আমাদের ক্যাম্পের অতি নিকটে ছিল। প্রাতে একটী বাছুর ধরিয়া নেওয়ায় প্রথম বাঘের সন্ধান হয়। তখন কতকগুলি লোক সেই জঙ্গলে গিয়া বাছুরটাকে ছাড়াইয়া আনে। ইহার ঘণ্টাখানেক পরেই আবার কতকগুলি লোকের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড বলদকে জখম করে। উহারা বলদটিকেও বহু কষ্টে ছাড়াইয়া নেয়।

এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি। এই সব হিংস্র জন্তু-সমাকুল স্থানের লোকগুলি অত্যন্ত সাহসী হইয়া থাকে। ইহারা একাকী জঙ্গল দিয়া চলাফেরা করিতে এবং এইরূপে বাঘের মুখ হইতে গরু

বাছুর ছাড়াইয়া আনিতে কিছুমাত্রও ভয় পায় না। ইহাদের পরম সৌভাগ্য এই যে ঐ সব অঞ্চলের বাঘ এ পর্য্যন্ত নরখাদক হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। নচেৎ বন জঙ্গলে ইহাদের যে কি বিপদ ঘটিত তাহা বলাই বাহুল্য।

বাঘটি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয়, লোক জনের বাধা বিঘ্ন না মানিয়া ক্রমাগত গরু ধরিতেছিল; নচেৎ সচরাচর প্রায় এরূপ করিতে দেখা যায় না।

আমরা আসিয়াই দেখিলাম ৪০।৫০ জন লোক ও ৩।৪টী হাতী বনটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। স্থানটি আমাদের ক্যাম্পের নিকটবর্ত্তী বলিয়া, প্রথমতঃ ক্যাম্পে গিয়া যে কয়টি রুগ্ন হাতী ছিল তাহাদের এবং লোকজনের সাহায্যে ঘিরিয়া রাখিয়া আমাদিগের অপেক্ষা করিতেছে।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, আর শিকার করা চলে না বলিয়া অতঃপর কি করা হইবে তাহারই পরামর্শ চলিতে লাগিল। কেহ বলিলেন, "মরা গরুটাকে জঙ্গলে রাখিয়া দেওয়া হউক। কাল আসিয়া শিকার করা যাইবে। মরা গরুর লোভে বাঘ বনেই থাকিয়া যাইবে।" কাহারও মতে যে ভাবে পাহারা দেওয়া চলিতেছে সমস্ত রাত্রি আলো জ্বালিয়া রাখিয়া এইরূপ পাহারা দেওয়া চলুক। এইরূপ নানা উদ্ভট কল্পনার পর স্থির হইল যে, একটী বেট (bait) বাঁধা হউক। (বাঘের 'মরির' জন্য যে জানোয়ার বাঁধা হয় তাহাকে bait বলে) পরামর্শান্তে তাঁবুতে ফিরিয়া গিয়া বেট বাঁধার জন্য একটী ঘোড়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ঘোড়াটিকে বনের নিকটেই ফাঁকা যায়গায় বাঁধা হইল। হাওদা-শিকারীদের পক্ষে একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, হাওদা শিকার করিতে হইলে ২।৪টা ঘোড়া বা মহিষের বাচ্ছা বেট বাধিবার জন্য সঙ্গে রাখা উচিত। অনেক সময় "মরির" খবর না পাওয়া গেলেও জঙ্গলে বাঘ আছে জানিতে পারিলে, মাচের

জন্য 'চার' ফেলার মত ঐ সব স্থানে বেট বাঁধিতে হয়। অন্যথা তাহাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। এই জন্য বেট সঙ্গে না থাকিলে অনেক সময় হাওদা শিকার ভাল হয় না। ভিন্ন স্থানে এই প্রকার 'মরি', বাধাকে 'গাড়া' বাঁধা বলে।

বেট বাঁধিবার নিয়ম এই—খুব শক্ত সরু দড়ি দিয়া লম্বা করিয়া ইহাদের পায়ে বাঁধা উচিত, গলায় বাঁধা ঠিক নয়। যতদূর সম্ভব বাঘকে ইহা বুঝিতে দেওয়া উচিত, যে বেট স্বাধীন ভাবে চরিতেছে।

যাহা হউক, পরদিন প্রাতে আমরা যাইয়া দেখি ঘোড়াটি মরে নাই; কিন্তু উহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। ঘাড়ের এক-স্থানে চারিটি দাঁতের চিহ্নও রহিয়াছে।

প্রথমেই ঘোড়ার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া এত দুঃখ হইল যে তাহা বলিবার নহে। সে বেচারা কোন রকমে দাঁড়াইয়া ছিল মাত্র। স্থানের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, বাঘের সঙ্গে ঘোড়ার লড়াই হইয়া-ছিল। ঘোড়ার খুরের আঘাতে ঐ স্থানে ঘাস ও মাটি খানিক খানিক উঠিয়া গিয়াছে। এক এক স্থানে মাটি ও জঙ্গল পা'ট হইয়া জমির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমাদের সকলের ধারণা হইল যে, যখনই ঘোড়াটা আক্রান্ত হইয়াছে, তখনই পিছন ফিরিয়া ক্রমাগত 'পুস্তক' ঝাড়িয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। হয়ত ঘাড়ে কাম্‌ড়াইবার সময় ঘোড়াটা মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া বাঘটাকে ছাড়াইয়াছিল। ঘোড়াটি গাড়ীর ঘোড়া ছিল বলিয়া পায়ে নাল বাঁধা ও আয়তনে বড় ছিল।

যাহা হউক্, জঙ্গলে ঢুকিতেই বাঘ পাওয়া গেল। প্রথমে মাহুতেরা উহাকে নির্জ্জীব অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পায়। মনু বাবুর অব্যর্থ সন্ধানে পশু-দেহ হইতে মুক্তি লাভ করিবার সময়

কিন্তু উহার জাতীয় বীরত্ব দেখাইতে ছাড়ে নাই, যদিও তাহা ক্ষণিক। বাঘিনীটার মাপ ৯ফিট্ ২ইঞ্চি ছিল।

ইহার শরীর স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠিয়াছিল। দাঁতের গোড়ায় ও মুখের অনেক স্থানে ঘোড়ার নালের আঘাত-চিহ্ন ছিল। ইহা দ্বারা তখন মনে হইয়াছিল যে, অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল বলিয়াই বাঘটী এত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও ছোট জঙ্গলে থাকিয়া ঘোড়ার সঙ্গে লড়াই করিয়াছিল। কিন্তু ইহজীবনে তাহার ক্ষুধার আর নিবৃত্তি হইল না।

আমার মনে হয় বাঘিনীটাকে না মারাই উচিত ছিল। জীবিত থাকিলে, অশ্ব জাতির নিকট কিরূপ অপদস্থ হইয়াছিল তাহা জ্ঞাতি কুটুম্বের নিকট প্রচার করিত—হয়ত উহাতে ভবিষ্যতে ঘোটককুলের উপকারও হইতে পারিত।

ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত অস্থির হইলে বাঘ লোকের ঘাড়ে আসিয়া পড়িতে দ্বিধা বোধ করে না। সে আজ প্রায় ২৫।২৬ বৎসরের কথা, আমাদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী লাঙ্গুনীয়া গ্রাম হইতে একদিন একটা লেপার্ডের সংবাদ পাইয়া শিকার করিতে যাই। সেদিন সঙ্গে হাতী বড় বেশী ছিল না, আমি একাই গিয়াছিলাম। আমার হাওদার ও অন্যান্য হাতী সমেত সর্ব্ব শুদ্ধ ৪।৫টি হাতী ছিল। হাওদায়, আমার পশ্চাতে আমার পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত সুধেন্দুনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় ছিলেন। শিকারে আমার মত তাঁহার বাতিক না থাকিলেও, হাওদার পিছনে বসিবার বাতিক বড় কম ছিল না। বাড়ীর আশে পাশে শিকার হইলেই তিনি হাওদার পিছনে বসিয়া যাইতেন; এ ক্ষেত্রেও ছিলেন।

জঙ্গল বেশী থাকায়, সন্ধান পাইয়াও ৪।৫ ঘণ্টার অক্লান্ত চেষ্টায় বাঘটী মারিতে পারি নাই। কেহ কেহ আবছায়ার মত ৩।৪ বার বাঘটীকে দেখিয়াও ছিল।

সন্ধ্যা হয় দেখিয়া হতাশ হইয়া গ্রামের ভিতর এক বাড়ীর নিকট আসিলাম। তখন আমি সবে মাত্র নূতন শিকারী, তাহাতে আবার 'দেখা দিয়া শ্যাম কোথা লুকালে,' ইহাতে আমার মনের অবস্থা যাহা হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। অগত্যা নিরাশ হইয়া বাড়ী আসিবার জন্য হাওদা হইতে নামিয়া প্যাডে উঠিয়াছি ঠিক সেই সময় নিকটেই বাঘের ডাক শোনা গেল। তখন মাহুতদের মধ্যে কেহ কেহ আবার জঙ্গল Beat করা হউক, কেহ কেহ বা পর দিন আসিয়া শিকার করা যাইবে ইত্যাদি নানারূপ পরামর্শ দিতে লাগিল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া সেদিন আর না ঘাটাইয়া, একটা ছাগল দিয়া বেট্ বাঁধা স্থির করা হইল। তখনই গ্রাম হইতে একটা ছাগল কিনিয়া আনিয়া, যেদিকে বাঘের ডাক শোনা গিয়াছিল, তাহার নিকটেই কোন এক স্থানে ছাগলটাকে বাঁধা স্থির করিয়া, আমার হাওদার হাতীর মাহুতকে ছাগল লইয়া যাইতে আদেশ করিলাম এবং আমি হাওদায় উঠিয়া, নিজেই হাতী চালাইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলাম; অন্যান্য হাতীও আমার পশ্চাতে আসিতে লাগিল। খানিক অগ্রসর হওয়ার পরই হতভাগ্য ছাগল ভ্যাঁ ভ্যাঁ করিয়া ডাকিয়া উঠিল; লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে "হুজুর ছাগল নিলে, ছাগল নিলে" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতেই চাহিয়া দেখি যে, বাঘটা হঠাৎ লাফাইয়া আসিয়া ছাগলের ঘাড়ে পড়িয়াছে। তখন আমরা সকলে একযোগে চেঁচাইয়া উঠাতে বাঘ ছাগল ছাড়িয়া জঙ্গলে ঢুকিল। এদিকে সেই সাহসী মাহুতও একদৌড়ে আসিয়া একটী হাতীর শুঁড় বাহিয়া উপরে উঠিয়া বসিল। ছাগলটা খুব জখম না হইলেও, পড়িয়া গিয়াছিল। ইহার পর ২।৩ জন লোক, হাতী হইতে নামিয়া উহাকে ধরাধরি করিয়া একটী বাঁশ ঝোপের নিকট বাঁধিল। বলা বাহুল্য, আমরা ছাগলটীকে সে বার হাতী দিয়া ঘিরিয়া লইয়া গেলাম।

ছাগল বাঁধিবার পর ১৫৷২০ হাত ফিরিয়া আসিয়া কি জানি কেন আমার খেয়াল হইল, একটু দাঁড়াইয়া দেখা যাক্ আবার আইসে কি না। মাত্র ২৷৩ মিনিট দাঁড়াইবার পরই দেখিলাম বাঘটা 'সুড় সুড়' করিয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতেছে। ইহার একটু পরেই আবার ছাগলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আমরা যে ৪৷৫টি হাতী লইয়া এত নিকটে দাঁড়াইয়া আছি তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। যখন লাফ্ দিয়া আসিয়া মুখ 'কাত্' করিয়া ছাগলটার গলা কাম্ড়াইয়া ধরিল, তখন সে কি ভয়ানক দৃশ্য! ছাগলটা পা ঝাড়িতেছে আর গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বাঘটাও গোঁঙরাইতেছে। ঠিক সেই সময়ে সকলেই সমস্বরে বলিতেছিল, "হুজুর গুলি করুন, হুজুর গুলি করুন।" গুলি আর কি করিব, আমি যেন ভাবে বিভোর হইয়া কেবলই ভাবিতেছিলাম, ছাগলটি যেন গোঁঙরাইতে গোঁঙরাইতে বলিতেছে—"It is play to you, but death to me." যাহা হউক, লোকগুলির কোলাহলে আমার চমক্ ভাঙ্গিবামাত্র নিশানা করিয়া এক গুলি করিলাম। গুলির সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মুখ হইতে ছাগলটা খসিয়া পড়িল। গুলি তাহার মাথায় লাগায় সে একটুও নড়িতে চড়িতে পারে নাই।

নানা রকম অবস্থার মধ্য দিয়া একটি মাত্র বাঘ মারায় কেবল যে খুসীই হইয়াছিলাম তাহা নহে। ইহাতে ব্যাঘ্র চরিত্রেরও ২৷৩টি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এরূপ দৃশ্য অনেক শিকারীর ভাগ্যেই ঘটে না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল যে, ইহার মত নির্লজ্জ বাঘ বুঝি বা ইহাদের সমাজে দ্বিতীয়টি নাই। ২৷৪ মিনিট অপেক্ষা করিলেই সম্ভবতঃ উহার আর কোন বিপদের আশঙ্কা থাকিত না। পোড়া পেটের জ্বালা কিন্তু বড় জ্বালা!

কেবল ব্যাঘ্র কেন, মনুষ্য সমাজেও ক্ষুধার জ্বালায় ইহা অপেক্ষা বীভৎস কাণ্ড সংঘটিত হইতে দেখা যায়। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত স্থানে

কত বুভুক্ষু মাতা সময় সময় আপন সন্তানকে পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া 'নিজের আহার্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। কোন কোন সময় জলমগ্ন জাহাজের আরোহীরা বোটে ভাসিয়া যাইতে যাইতে, ক্রমে আহার্য্য নিঃশেষ হইয়া আসিলে, নিজেদের মধ্যে lottery করিয়া এক একজন নিহত হয়।

যখন সভ্য জগতেই এরূপ ঘটনা বিরল নহে, তখন আর ক্ষুধার্ত্ত লোভী বাঘ আহারের জন্য জীবন দিবে, সে আর বেশী কথা কি?

আমার পাণ্ডুলিপি এই পর্য্যন্ত লেখার পর, 'হারানিধি' পাওয়ার একটি গল্প বলিতেছি। যদিও ইহার সহিত মূল বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, তথাপি অৰ্দ্ধ পথে আমি কিরূপ 'নাকাল' হইয়াছিলাম তাহা পাঠকদিগকে না শুনাইয়া থাকিতে পারিতেছি না। ইহাতে আমার একটু উপকারও হইবে। অভিনয় করিতে করিতে যেমন মধ্য পথে Carpenter's sceneএর আবশ্যক হয়, এই গল্পটিতে আমারও সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। ইহাতে ক্ষুদ্রের পার্শ্বে বৃহতের অবতারণা দোষ পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

সেদিন কোন বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে যাই। বন্ধুবরের বিশেষ অনুরোধে এই পাণ্ডুলিপি খানিও তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আহারান্তে বাড়ী ফিরিবার সময় ঘটনাক্রমে ২।৩ বার গাড়ী বদল করিতে হয়। রাত্রি প্রায় ১টার সময় বাড়ীর নিকট আসিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, গাড়ীতে পাণ্ডুলিপি খানি নাই। আমার তখনকার মনের ভাব সকলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রায় সমস্ত রাত্রি গাড়ী লইয়া পূর্ব্বে যে যে স্থানে গাড়ী বদল করিয়াছিলাম, সে সকল স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

এত বড় কলিকাতা সহর তখন প্রায় নিস্তব্ধ। কেবল গ্যাসের আলো ও স্থানে স্থানে পাহারাওয়ালা ছাড়া কচিৎ দুই এক জন

নিশাচর গাড়ীতে বা মোটরে যাতায়াত করিতেছিল। কোথাও বা, সুরা-পান-বিহ্বলা বারাঙ্গনার অলস-কণ্ঠ-নিঃসৃত অস্পষ্ট সঙ্গীত শোনা যাইতেছিল। আমার সে সব দিকে কোনই লক্ষ্য ছিল না। আমার মনের এই দুরবস্থা 'History of the French Revolution'এর সুপ্রসিদ্ধ লেখক Carlyle তখন উপস্থিত থাকিলে, উপলব্ধি করিতে পারিতেন। Carlyle বহু শ্রম ও গবেষণার ফলে 'History of the French Revolution' নামক সুবিখ্যাত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত John Stuart Mill কে দেখিতে দেন। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় Millএর দাসী উহা অকর্ম্মণ্য কাগজ মনে করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় Carlyleএর মনে যে ভাব হইয়াছিল, আমার তাহা অপেক্ষা বড় কম হয় নাই। তবে Carlyleকে পরে বহু চেষ্টা ও কষ্ট করিয়া আবার বহু দিন ধরিয়া ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইয়াছিল; কিন্তু ভগবান আমাকে সে দায় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

সমস্ত রাত্রি বিফল চেষ্টার পর প্রত্যূষে আবার বাহির হইয়া বেলা ১২টা পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে অন্বেষণ করিয়া, এক আস্তাবল হইতে আমার এই হারানিধি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

হাওদা শিকারে—হাওদা শিকারে কেন, সব শিকারেই,—মাথা অত্যন্ত ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। যে শিকারী যত উত্তেজিত হইয়া পড়িবেন, তাঁহার নিজের বিপদের এবং শিকার না পাইবার সম্ভাবনাও তত বেশী। একবার উত্তেজিত হইয়া কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম তাহা লিখিতেছি।

প্রায় ২০।২২ বৎসর পূর্ব্বে শিলেটের শ্রীপুর নামক স্থানে আমরা ক্যাম্প করিয়া মিঞাঝুরি গ্রামের জঙ্গলে শিকার করিতে যাই। বাঘের সন্ধানে উপর্য্যুপরি কয়দিন চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হওয়ায় শেষে একদিন একটী ঘোড়াকে বেট (bait) বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

পরদিন প্রাতে দেখা গেল, ঘোড়াটাকে মারিয়া বনের মধ্যে অনেক দূর টানিয়া লইয়া গিয়াছে। সেবার আমাদের শিকার পার্টিতে—বাবুও ছিলেন। তিনি জঙ্গলে ঢুকিয়াই এত উত্তেজিত হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহার উপদ্রবে আর কাহারও শিকার করার উপায় থাকিত না। পাখী, গো সাপ, বেজী প্রভৃতি যাহাকেই বন নাড়াইতে দেখিতেন, বাঘ বাঘ বলিয়া ক্রমাগত চেঁচাইতেন ও তাহার উপরই ক্রমাগত গুলি বর্ষণ করিতেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভ্রম বুঝিতে পারিয়াও বেশ সপ্রতিভই থাকিতেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে একবার কোন এক জঙ্গলে আমাদের সঙ্গে শিকার করিতে করিতে এই অভিনব প্রণালীতে দৈবাৎ এক প্রকাণ্ড বাঘ (tiger) মারিয়া ফেলিয়াছিলেন ; সেই হইতেই তাঁহার ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় যে, বন-নড়া দেখিয়া মারিলেই শিকার হয়—জানোয়ার দেখার আর আবশ্যক করে না। আরও একটু মজা এই যে, তিনি এইরূপ যদৃচ্ছা (at random) গুলি করিতেন বলিয়া, যে কোন শিকার মারা পড়িলে তিনিই মারিয়াছেন বলিয়া দাবা করিয়া বসিতেন।

প্রতিদিনই বন-নড়া দেখিয়া গুলি করিয়া সকলেরই শিকারের অসুবিধা জন্মাইতেন বলিয়া, সেদিন আমরাও তাঁবু হইতে স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম যে, সকলেই তাঁহার পন্থা অবলম্বন করিব।

আমরা সেই বাঘের উদ্দেশে গিয়া অতি অল্পায়াসেই তাহার সন্ধান করিয়া ফেলিলাম। খোঁজ হইবামাত্রই তিনিও তাঁহার যথাভ্যস্ত 'ব্যাটারি' চালাইতে সুরু করিলেন। আমরা পূর্ব্ব পরামর্শমত কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াও পারিয়া উঠিলাম না ; কারণ আমরা এ ভাবে শিকার করিতে একেবারেই অনভ্যস্ত।

বাঘও সন্ধান হইল, তিনিও তাহার পাছে পাছে জঙ্গলের আগা নড়া দেখিয়া ক্রমাগত গুলি করিতে করিতে ছুটিলেন। তখন অন্য

শিকারীরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। লাইন নষ্ট হইয়া গেল, তাহা আর দেখে কে? তখন আমরা এত বিরক্ত হইয়াছিলাম যে, তাহা আর বলিবার নহে। আমার বিরক্তির সঙ্গে ক্রোধের ও উত্তেজনার ভাবও হইয়াছিল। সকলে চুপ করিয়া রহিলেন; কিন্তু আমি আমার হেড্ মাহুত সোনাউল্লাকে হুকুম করিলাম, "ঐ হাতীর সঙ্গে সঙ্গে চালাও।" সেদিন হাওদা আমার প্রিয় বিখ্যাত হাতী মোহনলালের উপর ছিল। মোহনলাল যেমন একদিকে শিকারে শ্রেষ্ঠ ছিল, তেমনই অন্য হাতীকে সায়েস্তা করিতেও খুব মজবুত ছিল। আমিও তাঁহার হাতীর সহিত প্রায় পাশাপাশি মিলিত হইয়া দৌড়াইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিন্তু তখনও তিনি তাঁহার নিত্য কর্ম্ম ভুলেন নাই। যতই পিছন হইতে আওয়াজ হইতেছিল, বাঘও ক্রমেই ততই দূরে সরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমার হাতী তাহার হাতীর সঙ্গে ভিড়িয়া পড়াতে তাঁহার হাতী ভয় পাইয়া পিছনে হটিয়া গেল। ইহাতে বরং একটু সুবিধাই হইল। আমি সম্মুখে পড়িয়া যাওয়াতে তিনি আর গুলি করিবার সুযোগ পাইলেন না। ইহাতেই আমি বাঘের খুব নিকটে যাইতে পারিয়াছিলাম।

জঙ্গল ঘন হইলেও খুব উচ্চ ছিল না। একস্থানে যেন বন নড়িতে নড়িতে হঠাৎ থামিয়া গেল। বাস্তবিক সেইস্থানে একটা গর্ত্ত ছিল। বাঘ সেই গর্ত্তে নামিয়া বোধ হয় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমার হাতীও গর্ত্তের পারেই দাঁড়াইয়াছিল। তখন ওখানে গর্ত্ত আছে বলিয়া বুঝিতে পারি নাই, পিছনের দিকে চাহিয়া দেখি, তিনি প্রায় আসিয়া পড়িলেন। পাছে আবার সেই বিপ্লবের সৃষ্টি হয় মনে করিয়া, যে স্থানে বন নড়া শেষ হইয়াছে ঠিক সেইস্থানে হাতী বাড়াইতে আদেশ দিলাম। ইহার পর মুহূর্ত্তমধ্যে কি যে হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। হাতী একটু অগ্রসর হইয়াই উপুড় হইয়া গর্ত্তে পড়িয়া গেল। আমার হাতে 500 express rifleটী হাওদার ডাণ্ডার ধাক্কা লাগায় ডান্ নল (right

barrel) দম্ করিয়া আওয়াজ হইয়া গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে উপুড় হইয়া পড়িয়া গিয়া হাওদায় ভয়ানক ধাক্কা খাইলাম, ওদিকে বাঘেরও ভীষণ ডাক শুনিলাম। এই ঘটনা ঘটিতে বোধ হয় ১০।১৫ সেকেণ্ডের অধিক সময় লাগে নাই।

যখন হাতী চারি পায়ে ভর করিয়া ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়াইল, তখন হাওদার সম্মুখে ঝুঁকিয়া দেখি হেড্ মাহুত হাতীর কাণের পাশ দিয়া কাত্ হইয়া পড়িয়াছে। 'দুলশীতে' পা আট্কাইয়া তাহার মাথা নিচের দিকে ঝুলিতেছে। (হাতী চালাইবার জন্য তাহার গলার রজ্জু গুচ্ছকে'দুলশী'বলে ; মাহুত উহাতে পা আটকাইয়া হাতী চালায়। ইহা ঘোড়ার রেকাবের মত কায করে) হাতী সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বাঘ তাহার মাথা কামড়াইয়া ধরিয়া সম্মুখের দুই পা দিয়া মাথার দুই পার্শ্বে ও পিছনের দুই পা দিয়া শুঁড় আকড়াইয়া ধরিয়াছে। সে দৃশ্য যিনি না দেখিয়াছেন তাহাকে বুঝান অসম্ভব। তখনই আমার মনে হইল, হয় বাঘ মাহুতকে ধরিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, অথবা আমার বন্দুকের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়াতে এই বিপদ ঘটিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ বন্দুকের বা নল (left barrel) বাঘের ঘাড়ে প্রয়োগ করিলাম। আমার বিশ্বস্ত বন্দুকের অমোঘ শেল্ তৎক্ষণাৎ তাহাকে পার্থিব জ্বালা যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিল।

বাঘ প্রকাণ্ড—মাপে ৯॥ ফিটের উপর ছিল।

ইহার পর যখন মাহুত হাওদা ধরিয়া হাতীর উপর বসিল, তখন দেখিতে পাইলাম, তাহার মাথার পাগ্ড়ী পড়িয়া গিয়াছে ; সে নিজেও নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্য যে কোনরূপ জখম হয় নাই। যদি আমি এইভাবে উত্তেজিত হইয়া আমার সহযোগীর সহিত প্রতিযোগিতা না দেখাইতাম, তবে হয়ত এই বিপদ হইত না।

তবে ইহাও ঠিক যে, আমি এইভাবে বিপদগ্রস্ত না হইলে, বাঘটি ক্রমাগত গুলির উৎপাতে হয়ত বাড়ী যাইয়া মরিত।
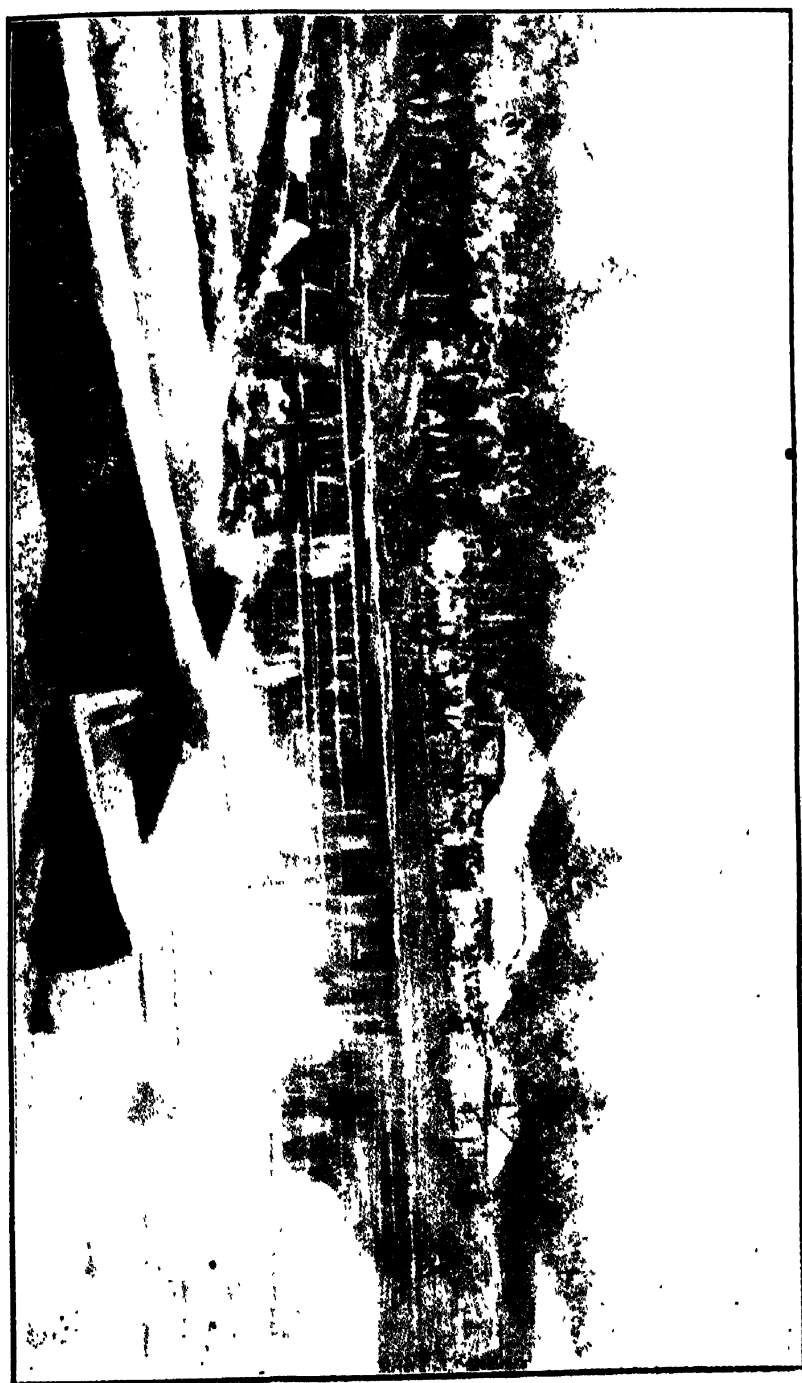
অনেক শিকারী মনে করেন, শিকার করিবার সময় জানোয়ারের ঘাড়ের উপর গিয়া না পড়িলে বাহাদুরী কিছু কম হয়। কিন্তু বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত, কোন সময়েই কোন শিকারের একেবারে ঘাড়ের উপর গিয়া হাতী লইয়া পড়া উচিত নয়। ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা ত আছেই, অধিকন্তু হাতীর উপর হইতে খাড়া ভাবে ঘাস কি ঝোপ জঙ্গলে, নীচের দিকে দেখা যায় না বলিয়া শিকার করা চলে না। একটু দূর হইতেই বরং তের্‌ছা ভাবে ভাল দেখা যায়; কাযেই শিকারীর একটু দূরে থাকাই ভাল। একবার এই ভাবে বাঘের ঘাড়ে গিয়া পড়াতে, আমাদের পার্টির এক শিকারীর যেরূপ বিপদ ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি।

বাঙ্গালা ১৩০৪ সনের ভীষণ ভূমিকম্পের পর, কিংবা তৎপর বৎসর আমরা "দুদুং এর থলে" (থল একটী উলুখড় সমাকীর্ণ বহুদূর বিস্তীর্ণ জঙ্গল) শিকার করিতে যাই। সেবার আমাদের পার্টিতে মনুবাবু, মহেশবাবু, ও আমি ছিলাম। আমাদের ইচ্ছা ছিল, থলে শিকার করিবার পর, সুসঙ্গ এর মধ্য দিয়া, পূর্ব্বাভিমুখে সিলেটের দিকে কতকদূর অগ্রসর হইব। আমাদের বাহাদুরপুর কাছারীর নিকটবর্ত্তী পোড়াপুঁঠিয়া গ্রামে, একটি অতি বিস্তীর্ণ জলাশয়ের ধারে আমরা প্রথমে 'ক্যাম্প' করি। এই জলাশয়টী এককালে বহতি নদী ছিল, পরে উহার স্রোত বন্ধ হইয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে। যাহারা হাজারিবাগের হ্রদ (Lake) দেখিয়াছেন, তাহারা ইহার বেশ ধারণা করিতে পারিবেন।

আমরা বরাবরই 'থলে' যাইবার পথে এই স্থানে ২।৩ দিন থাকিয়া হল্ট করিয়া যাইতাম; কারণ ইহার নিকটেই লেপার্ডের খুব ভাল ভাল কয়েকটী জঙ্গল আছে। বহুদূর বিস্তৃত স্বভাবসুন্দর এই জলাশয়ের তীরে সারি সারি তাঁবু পড়িয়া, স্থানটীকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিত। আমরা এই স্থানে দুই দিন থাকিয়া ৩।৪টি

বাঘ মারিয়া, 'থলে' চলিয়া গেলাম। আমাদের অঞ্চলে 'থল' Hog-deer শিকারের একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

থলে বাঘের (tiger) কয়েকটি বড় বড় প্রিয় জঙ্গল আছে। ঐ সব জঙ্গলে অনেক সময়ই বাঘ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া 'থলের' নিকটবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে অনেক ছোট ছোট জঙ্গল আছে, তাহাতেও সময় সময় দুই একটী লেপার্ড পাওয়া যাইত। কিন্তু সেবার কি জানি কেন, বহু লেপার্ড আসায়, এই সব জঙ্গল ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল। যে জঙ্গলেই যাইতাম, ২।১টী করিয়া লেপার্ড পাওয়া যাইত। একদিন ৫টা পর্য্যন্ত পাইয়াছিলাম। সেবার বাঘের এত আমদানী দেখিয়া, আমরা বেখবরেই নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের জঙ্গল ঠেঙ্গাইয়া বেড়াইতাম এবং প্রতিদিনই ২।৩টী করিয়া লেপার্ড পাইতাম। এই স্থানে সেবার ৪।৫ দিনে ১৪।১৫টি লেপার্ড শিকার করা হয়।

এইরূপে একদিন 'চালিতাখালি' গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন জঙ্গলে গিয়া একটি লেপার্ড পাই। ঐ স্থান আমাদের 'ক্যাম্প' হইতে ৫।৬ মাইল দূরে ছিল। জঙ্গলটি বেশ ঘন এবং একটি শুষ্ক নালার মধ্যে অবস্থিত ছিল। লম্বায় প্রায় ২ ফার্লং এবং চওড়ায় কোন কোন স্থানে ১ ফার্লং এবং কোথাও বা কিছু কম হইবে।

সেদিন আমাদের কি অযাত্রা ছিল যে বাঘটিকে কিছুতেই মারিতে পারিতেছিলাম না। আমরা তিন জনে উহার উপর বহু গুলি বর্ষণ করিয়াও কিছুই করিতে পারিলাম না; কারণ একে ঘন নল বন, তাহার মধ্যে আবার খুব ঘন ঘন গুজার ঝোপ বিঘ্ন জন্মাইতেছিল। (গুজা একরূপ বুনো কাঁটা গাছ। ইহার এক একটী ঝোপের মত হয় ও সাদা সাদা ফুল হয়। ইহাকে ইংরাজীতে Bush rose বলে) এক ঝোপ হইতে আর এক ঝোপে লাফাইয়া যাইবার সময়, Snap

shot ছাড়া নিশানার কোন সুযোগ পাওয়া যাইত না। (যে সব আওয়াজের সময় বন্দুকের নল জানোয়ারের দিকে রুজু করিয়া চোক না বুজিয়াই আওয়াজ করা হয় তাহাকে snap shot বলে। ইহাতে অনেক সময় বন্দুক বুকে লাগান যায় না। খুব অভ্যাস না থাকিলে এইরূপ shot মারা যায় না।) ক্রমাগত পাছে পাছে দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে জঙ্গল অনেকটা পা'ট হইয়া আসিয়াছিল। যতই জঙ্গল পা'ট হইতে লাগিল, বাঘের বিক্রম যেন ততই বাড়িতে লাগিল। তখন আর সহজে এক ঝোপ হইতে অন্য ঝোপে বাহির হইতে ছিল না। ঝোপের নিকট হাতীর মাথায় লাফাইয়া উঠিত। এই ভাবে ক্রমাগত 'চার্জ্জ' করিয়া ৫।৭টা হাতীকে বেশ 'ঘা'ল' করিল। ইহার পর লাইনের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল; মাহুতদের মনেও প্রবল ত্রাস উপস্থিত হইল। কোন কোন মাহুত "পীরের বাঘ, মারিয়া কায নাই," কেহ বা "ইহা দেবাংশী, ইহাকে মারা যাইবে না," ইত্যাদি যাহার মুখে যাহা আসিল, তাহাই বলিয়া ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিতে লাগিল। স্থূল কথা মাহুতেরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল বলিয়াই, এইরূপ নানা উপদেশ দিতেছিল। আমাদের নিশানার উপর উহাদের বিশেষ আস্থা ছিল, কিন্তু এখানে ক্রমাগত বিফলতায় বোধ হয় উহাদের মন দমিয়া গিয়াছিল। এর পর আমরা স্থির করিলাম, 'বীটার' হাতী ছাড়া আমাদের তিন হাওদা নিয়াই চেষ্টা করিয়া দেখিব। তদনুসারে হাওদা তিনটী পাশাপাশি করিয়া, আমরা এ ঝোপ সে ঝোপ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

মহেশ বাবুর হাওদা, রাজা জগৎকিশোরের 'শম্ভু প্রসাদ' নামক দাঁতলার (tusker) উপর ছিল। বোধ হয় 'শম্ভুপ্রসাদ' বাঘের ঘাড়েই পাড়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল, অথবা কি কারণে বলিতে পারি না, হঠাৎ বাঘের ডাক শুনিয়া মহেশ বাবুর হাওদার দিকে তাকাইয়া

দেখি, বাঘ 'শম্ভুপ্রসাদের' মাথায় উঠিয়া কামড়াইয়া ধরিয়াছে ; কিন্তু শরীরটা হাতীর কাণের পাশ দিয়া ঝুলিতেছে। হাতী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু তাহার প্রকাণ্ড কাণ দুইটা ফাঁক করিয়া মেলাইয়া দিয়াছে। (এই ভাবে হাতীর কাণ ফাঁক করিয়া দাড়ানকে কাণ ফাঁদাইয়া দাঁড়ান বলে।) সেই সঙ্গে সঙ্গে মহেশ বাবু, হাওদার সম্মুখে ঝুকিয়া, 500 Express rifle দিয়া বাঘকে নিশানা করিতে-ছিলেন। হাতীর কাণে বাঘ ঢাকা পড়িয়া গেলেও তিনি মনে করিতে-ছিলেন, বাঘকেই নিশানা করিতেছেন। আমরা এই অবস্থা দেখিয়া ক্রমাগত চেঁচাইয়া গুলি মারিতে নিষেধ করিতেছি; কিন্তু তাহার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। মহেশ বাবু এত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন যে, আমাদের চীৎকার তাঁহার কাণে পৌঁছে নাই। তিনি দম্ করিয়া হাতীর কাণেই গুলি করিয়া বসিলেন। বন্দুকের আওয়াজে বাঘ হাতী ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া আর এক ঝোপের ভিতর ঢুকিল। এদিকে মাহুতও "আমাকে মারিয়া ফেলিয়াছে" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। দেখা গেল যে Express এর shell গুলি, হাতীর কাণে লাগিয়া ফাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গিয়াছে ও তাহারই কয়েক টুক্‌রা মাহুতের পায়ে বিঁধিয়া গিয়াছে।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, মাহুতের জখম মাত্র চর্ম্মভেদ করিয়াছিল, কিন্তু হাতীর কাণ ছিড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থা দৃষ্টে মহেশ বাবুর মুখ চুণ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাতী সরাইয়া নিয়া হাওদা খুলিয়া ফেলা হইল। হাতীর কাণের বড় বড় শিরা হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত বাহির হইতেছিল। হাওদা বদলাইতে যে সময় লাগিল আমার মনে হইল, ইহাতেই বুঝি ২।৩ ঘটি রক্ত পড়িল। ইহার পর হাতীকে 'ক্যাম্পে' নিয়া নদীতে ফেলিয়া লোহা পোড়া দাগ দিয়া, তবে রক্ত-স্রাব বন্ধ করা হয়। অজস্র রক্তস্রাবে হাতীকে সেদিন একটু অবসন্ন বোধ করায়, এক বোতল No, I ব্রাণ্ডি একেবারে খাওয়াইয়া

দেওয়া হইল। কিন্তু পর দিন হইতে, হাতীর আর বিশেষ কোন দুর্ব্বলতা অনুভব করি নাই। রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত খুব কম হইলেও এক কলসী রক্ত পড়িয়াছিল। এত রক্তপাতেও ক্ষণিক দুর্ব্বলতা ছাড়া, আর কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। হাতী ছাড়া অন্য কোন জানোয়ার হইলে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল।

মাহুতকে ৫।৭ দিন ক্যাম্প হাঁসপাতালেই থাকিতে হইয়াছিল। বেচারা আরোগ্য লাভ করিয়া আড্ডাস্থিত অন্যান্য মুসলমানদিগকে খুব বড় একটা 'খোদার' সিন্নি দিয়া ভোজ দিয়াছিল। তবে এই অর্থ মহেশ বাবুর পকেট হইতে বাহির হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না।

বাঘটী এই ভাবে আমাদিগকে 'নাকাল' করিয়া, পরে আর কিন্তু মোটেই কষ্ট দেয় নাই। বোধ হয় সে তখন মনে করিয়াছিল "আর কেন, তোমাদের যত ক্ষমতা দেখা গেল, এখন অস্ত্র ত্যাগ করিলাম।" তবে ভীষ্মদেবের মত সে কাহাকেও 'শিখণ্ডি' বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল কি না, তাহা বলিতে পারি না। লেপার্ড হইলেও, ইহা মাপে প্রায় ৮ ফিট্ ছিল। এত বড় লেপার্ড সচরাচর খুব কমই দেখা যায়।

সচরাচর গ্রামে শিকার করিবার সময় এত দর্শক জুটিয়া যায় যে, তাহাদের যন্ত্রণায় শিকার করা মুস্কিল হইয়া পড়ে। ইহাদের দুই হাতে ঠেলিয়াও সরান যায় না। অধিকন্তু কোমরে হাত দিয়া, হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া, তামাসা দেখিতে বিশেষ পটু। যদিও হাতী দিয়া একদিক হইতে তাড়াইয়া দেওয়া যায়, তখনই আবার দৌড়িয়া অন্য দিকে যাইয়া ভিড় করে। অধিকন্তু জঙ্গলে কোন কিছু নড়িয়া উঠিলেই "ঐ বাঘ, ঐ বাঘ" করিয়া চেঁচাইয়া উঠে, আবার কোন কোন সময় হঠাৎ 'বাগডাশা' কি 'শেয়াল' জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া পড়িলে, "বাঘ বাঘ" বলিয়া সকলে

মিলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে থাকে; তখন কে কাহার ঘাড়ে পড়ে ঠিক থাকে না। ইহার পর তখনই আবার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া অস্থির করিয়া তোলে, ও পুনরায় আসিয়া ভিড় করিতে থাকে। ইহাদের দ্বারা শিকারের কোন সাহায্য হওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় মানুষ এড়াইয়া গুলি করা কঠিন হইয়া উঠে। এই অবস্থায় কোন কোন সময় ২।১ জনকে জখমও করে।

একবার আমাদের বাড়ীর অদূরবর্ত্তী 'ঘাটুরী' গ্রাম হইতে একটী লেপার্ডের খবর পাইয়া, ২টী 'বাচ্চা' হাতী লইয়া শিকার করিতে যাই, তখন আর অন্য হাতী বাড়ীতে উপস্থিত ছিল না। গ্রামে পৌঁছিলে, একটী অর্দ্ধ শুষ্ক পুষ্করিণীর পাড়ে কতকগুলি বাঁশ ঝাড় কাঁটা বন ও আগাছায় পরিপূর্ণ জঙ্গলে বাঘ আছে বলিয়া শুনিতে পাইলাম।

যাহা হউক, অতি অল্পায়াসেই উহার খোঁজ পাওয়া গেল। এক গুলিতেই উহার পিছনের একখানা পা খোঁড়া করা গেল। ইতিমধ্যেই ঐ জঙ্গলের আস-পাশ ৩।৪ শত লোকে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল। কাঁটা জঙ্গলের মধ্যে দুইটি মাত্র হাতী দিয়া আমি কিছুতেই বাঘটিকে কায়দা করিতে পারিতেছিলাম না। অথচ এই সব লোকের চীৎকারে বাঘও একস্থানে স্থির থাকিত না। তখন যাহা হয় হউক মনে করিয়া যাই একটু অগ্রসর হইব, খানিক দূরে বনের একেবারে নিকটেই এক ধোপা প্রকাণ্ড একটি কাপড়ের বোচ্‌কা পিঠে লইয়া উঁকি ঝুকি দিয়া "ঐ বাঘ ঐ বাঘ" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠামাত্রই, দেখিলাম যেন বাঘটি বিদ্যুতের মত উহার বোচ্‌কার উপর লাফাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ধাক্কায় ধোপা, বোচ্‌কা ও বাঘ সমেত উপুড় হইয়া পপাত ধরণীতলে। বাঘের পেছনের পা, ধোপার উরুদেশে ও সম্মুখের পা, কাঁধের উপর ছিল। উহার এইরূপ বিপদের সময়ও অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ

করিয়াছিলাম। চতুর্দ্দিক হইতে "ধোপারে বাঘে খাইল, ধোপারে বাঘে খাইল," বলিয়া চীৎকার শোনা যাইতেছিল। কিন্তু সৌভাগ্য যে ইহার পরই বাঘটি ধোপাকে ছাড়িয়া পুনঃ জঙ্গলে যাইবার সময় আমার দ্বিতীয় গুলিতে ভবলীলা সাঙ্গ করিল।

আমার মাহুত কিন্তু মহা খুসী হইয়া বলিতেছিল, "যেমন শালা অযাত্রা ধোপাকে বারবার নিষেধ করিয়াছিলাম, তেমনই উহার খুব আক্কেল হইয়াছে।" সত্য কথা বলিতে কি ধোপার সহিত মাহুতের এই নূতন সম্পর্ক স্থাপনে আমার বিশেষ ক্রোধের কারণ হয় নাই। ইহাকে মুক্তাগাছা আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে আমার ১০।১৫ টাকা ব্যয়ও হইয়াছিল।

বাঘ যে অত বড় হিংস্র জন্তু ইহারাও শিকারের সময় প্রাণ বাঁচাই-বার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে অত্যন্ত হয়রাণ হইয়া কোন কোন সময় বা ভীত হইয়া এরূপ অস্বাভাবিক চরিত্রের পরিচয় দেয়, যাহাতে নিজেদেরই অবাক হইয়া যাইতে হয়। নিম্নের গল্প তিনটি হইতে তাহা বিশেষরূপে বুঝা যাইবে।

১। বাঙ্গলা ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে মুক্তাগাছাস্থ আমাদের সকলের বাড়ীই চুরমার হইয়া যায়। তখন পর্য্যন্তও কাহারও বাড়ী সংস্কার হয় নাই। ইহার কিছুদিন পরে মুক্তাগাছা টাউনের উপর আমাদের বাড়ীর অতি নিকটে সামান্য একটু জঙ্গলে একটি লেপার্ড আসিয়াছিল, প্রাতে রাজা জগৎকিশোরের এক কর্ম্মচারী ৺গিরিশচন্দ্র রায় আসিয়া সংবাদ দেন যে, তিনি তাঁহার বাসা হইতে আসিবার সময় উহাকে ঝোপের মধ্যে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়াছেন। আমি রাজাকে খবর দিলাম। তিনি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন যাইতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহার "চমকতারা" নাম্নী প্রসিদ্ধ শিকারী হস্তিনীটী আমার জন্য পাঠাইয়া দেন। ঐ একটী মাত্র হাতী নিয়াই আমি শিকার করিতে যাই।

সেখানে গিয়া দেখি বাঘ থাকিবার মত কোন জঙ্গল নাই, কেবল কতকগুলি আট্‌সেওড়া, কচু ও ভাটি গাছে স্থানটি পরিপূর্ণ। দূর হইতেই বাঘ দেখিতে পাইয়া গুলি করি, ফলে উহার পিছনের একটি দাবনা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বাঘও কুকুরের মত লেংচাইতে লেংচাইতে মিউনিসিপাল রোড দিয়া দৌড়িয়া যাইতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, মুক্তাগাছা টাউনের উপর বাঘ আসিয়াছে ও আমি শিকার করিতে যাইব ইহা পূর্ব্ব হইতেই প্রচার হওয়ায় ৩।৪ শত লোক ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা রাস্তা দিয়া বাঘের পিছনে খানিক দূর গিয়াই দেখিতে পাইলাম, বাঘটি এখানকার অন্যতম ভূম্যধিকারী আমার দাদা মহাশয় ৺যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের অন্দর বাড়ীর ভগ্ন প্রাচীরের মধ্য দিয়া ঢুকিয়া পড়িল। পিছনে পিছনে আমরাও হৈ চৈ করিয়া যাইয়া অন্দরে প্রবেশ করিলাম। ভূমিকম্পে স্থানে স্থানে প্রাচীর ধ্বসিয়া পড়ায়, প্রবেশ করিতে আমাদের কোনই অসুবিধা হয় নাই। আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ২।৩ শত দর্শকেও বাড়ীর ভিতর পূর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সংবাদ প্রচার হইয়া পড়ায়, বাড়ীর মেয়েরা—যে যাহার ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমার শিষ্ট শান্ত দাদা মহাশয়ের নিকট বাহির বাড়ীতে এই সংবাদ পৌঁছিবামাত্রই এমন ভাবে তিনি তাঁহার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন যে, তন্মধ্যে বাঘ প্রবেশ করা দূরে থাকুক বায়ু প্রবেশও কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। "চাচা আপন বাঁচা" নীতি অবলম্বন করিয়া বোধ হয় তিনি বাড়ীর আর কাহারও খবর নেওয়ার অবসর পান নাই। এইত গেল বাড়ীর কর্ত্তার অবস্থা। এখন বাঘের কি হইল তাহা দেখা যা'ক।

আমরা আঙ্গিনায় ঢুকিয়া আর বাঘ দেখিতে পাইলাম না। তবে বাঘ গেল কোথায়? তখনই স্থির করিয়া লইলাম, আঙ্গিনার দক্ষিণ দিকের ভাঙ্গা দোতালা দালানেই বাঘ ঢুকিয়া থাকিবে। ঐ দালানের

সব কোঠারই দরজা বন্ধ ছিল, কেবল একটী লোহার গরাদ দেওয়া জানালার ৪।৫টি শিক ছিল না ; ঐ স্থান দিয়াই ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকিবে মনে করিয়া, কিরূপে উহাকে বাহির করা যায় তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। কোন্ বীর পুরুষ দরজা খুলিয়া আহত বাঘের মুখে যাইবে ? অথচ বাঘ সত্য সত্যই তথায় আছে কি না, তাহা খোঁজ করিতেও যাওয়া দরকার। যাহা হউক অনেক দেলাশা ভরসা দিয়া আমারই এক ভৃত্য দীনুকে এক লাঠি দিয়া দরজা খুলিয়া ঢুকাইয়া দিলাম। দরজা খুলিবামাত্রই বহু দিনের আবদ্ধ ঘর হইতে, দুর্গন্ধে ও চামচিকা উড়িবার ফট্ ফট্ শব্দে, অস্থির করিয়া তুলিল। একটু পরেই, অন্ধকারে চক্ষু অভ্যস্ত হইয়া আসিলে, ভিতর হইতে দীনু বলিল যে,কিছুই দেখা যায় না, কেবল স্তূপাকারে কতকগুলি 'চাটাই' ও পাটকাঠি পড়িয়া আছে মাত্র। ইহা বলিয়াই ভাঙ্গা 'চাটাই ২।৩ খানা উল্টাইয়া, লাঠি দিয়া আন্দাজেই খোঁচা দিতে লাগিল, একটু পরেই চেঁচাইয়া বলিল যে, কিসের উপর খোঁচা লাগে বুঝা যায় না, কিন্তু যেন বেশ নরম তুল্ তুল্ করে। বাহির হইতে আমরা "বাঘের গায়ে খোচা লাগিলে কি সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে ? ভাল করিয়া দেখ" বলায়, দীনু 'চাটাই' গুলির ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া দিয়া, কি যেন একটা কিছু হাতে নিয়া বাহির হইয়া আসিতে আসিতে বলিল, কি যেন একটা শুইয়া আছে, উহার লোম ছিড়িয়া আনিয়াছি, আমি তো লোম দেখিয়াই অবাক! বাস্তবিকই কতকগুলি পীত ও কালো রংএর লোম। তবে কি বাঘ ওখানে ঢুকিয়া মরিয়া গিয়াছে ? নচেৎ জখমী জ্যান্ত বাঘের লোম ছিড়িয়া আনিয়া দীনু সশরীরে ফিরিয়া আসিবে, ইহাই বা কেমন কথা ? আবার মনে করিলাম ঐ রংয়ের কোন কুকুর বোধ হয় ওখানে শুইয়া আছে। কিন্তু তাহাই কি একটা কথা ?

যাহা হউক, অতঃপর দরজার সম্মুখে, আমি বন্দুক নিয়া প্রস্তুত

হইয়া রহিলাম। ২।৩ টা লম্বা বাঁশ, ভাঙ্গা জানালার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া ২।৩ জনে ক্রমাগত খোচাইতে লাগিল। একটু পরেই হড় মড় করিয়া বাঘটা আমার হাতীর সম্মুখে দরজা দিয়া লাফাইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তমাত্র অবসর না দিয়া উহাকে আবার গুলি করিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এবারও সে স্বল্প কালের জন্য অব্যাহতি পাইল বটে, কিন্তু উহার নীচের চোয়াল একেবারে উড়িয়া গেল। গুলির সঙ্গে সঙ্গেই ডাক দিয়া বাম দিকে একটু গিয়াই, দোতালার সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া পড়িল। কিন্তু সিঁড়ির মোড়েই আমার ২।৩ জন পদাতিক লাঠি হস্তে শূন্য দোতালা পাহারা দিতেছিল। অত্যধিক সাহসী কি না, নতুবা এত লোক প্রাঙ্গণে থাকিতে উহারা পূর্ব্ব হইতেই ওখানে থাকিবে কেন? বাঘটি কিন্তু মোড় পর্য্যন্ত উঠিয়া দোতালাও নিরাপদ নয় ভাবিয়া, উহাদের একজনকে আঁচড়াইয়া, ওখান হইতে এক লাফে আমার অনুজ শ্রীমান্ যতীন্দ্রনারায়ণের বাড়ীর ভিতর গিয়া পড়িল। তখন সেখান হইতেও চেঁচামেচি শুনা যাইতে লাগিল। আমরা ত আর হাতী সহ সিঁড়ির উপর উঠিতে পারি না, কি ভাঙ্গা দেয়াল ডিঙ্গাইতেও পারি না। কাযেই ঘুরিয়া যাইতে একটু বিলম্ব হইল। ইত্যবসরে বাঘটি সেখান হইতে খানিকদূরে গিয়া কতকগুলি কলাগাছের মধ্যে লুকাইয়া রহিল।

যাহা হউক, ইহার পর অল্পায়াসেই উহার ভব যন্ত্রণা দূর করিয়াছিলাম।

সেই দিন সন্ধ্যার পর, দাদা মহাশয়ের ওখানে বেশ কিঞ্চিৎ জলযোগ করা গেল এবং ৩।৪ দিন পর দিদি ঠাকুরাণীর নিকট হইতেও আমার এই বাহাদুরীর পুরস্কার স্বরূপ, একটী ভোজ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে দাদা মহাশয়কে এক ঘরে করিয়াছিলাম; যেহেতু তিনি সময়কালে দিদি ঠাকুরাণীকে, বাঘের মুখে দিয়া, নিজে দরজা বন্ধ করিয়া, আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

২। অনেকদিন আগেকার কথা, তখনও ময়মনসিংহ—জামাল পুর 'রেল' হয় নাই। আমরা সেবার জামালপুর হইতে সুরু করিয়া, ক্রমাগত ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে আসাম গোয়ালপাড়া অবধি শিকার করি। বাড়ী হইতে বরাবর গাড়ীতেই জামালপুর যাইয়া, পরে সেখান হইতে ক্রমাগত হাতীতে যাই।

ইস্‌লামপুর নামক স্থানে ক্যাম্প করিয়া, আমরা কয়েকদিন শিকার করি। আমাদের জিলার এই ইস্‌লামপুর, কাঁসার বাসনের জন্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

একদিন কোন জঙ্গলে, হঠাৎ দুইটী বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল। জঙ্গলটী খুব বড় না হইলেও, উহাতে ঘনসন্নিবিষ্ট নল্‌বন ছিল। ২।৩ বার বীট করিবার পরই, মাহুতেরা বাঘ দুইটী দেখিতে পাইল; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত আমাদের অদৃষ্টে দর্শন লাভ ঘটে নাই। মাহুতদের 'ঐ বাঘ' 'ঐ বাঘ' চীৎকারে একটী বাঘ হঠাৎ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া, মাঠের মধ্য দিয়া ভোঁ। দৌড় দিল।

এখানে একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এই জঙ্গলটীর চতুর্দ্দিকেই প্রকাণ্ড মাঠ ছিল ও আমরা শিকারে গিয়াছি বলিয়া, বহু দর্শক তখন তথায় তামাসা দেখিতে জুটিতেছিল; যেমন সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। মাঠে বহু দর্শক ছিল বলিয়া, আমরা আর তখন তাহাকে গুলি করিতে পারিলাম না; দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিলাম। বাঘের দৌড় দেখিয়া, দর্শকগুলিও সকলে এক যোগে 'ঐ যায়' 'ঐ যায়' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠায়, বাঘ আরও জোরে দৌড়াইতে লাগিল। ঐ মাঠের বহুদূরে এক খাসী বাঁধা ছিল বাঘটী দৌড়াইতে দৌড়াইতে গিয়া খাসীর ঘাড় মট্‌কাইয়া আর এক জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল। এত বড় মাঠ থাকিতে যে কেন খাসীর উপর বিক্রম প্রকাশ করিল বুঝিতে, পারিলাম না। তখন আমরা স্থির করিলাম যখন আর একটা এই জঙ্গলে আছে, তখন ইহাকে শেষ

করিয়া উহার খোঁজ করা যাইবে। আমরা লাইন করিয়া ক্রমাগত জঙ্গল ভাঙ্গিতে লাগিলাম; কিন্তু হায়! সকলই বিফল হইল। বন সমভূমি করিয়া ফেলিলাম, তথাপি বাঘ বাহির হইল না। শেষে এরূপ অবস্থা হইল যে বনের চিহ্ন মাত্র রহিল না। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, বাঘ কোথায় গেল? কেহ বলে এটাকেও মাঠ দিয়া যাইতে দেখিয়াছি, কেহ বলে জঙ্গলের মধ্যে গর্ত্ত আছে তাহাতে ঢুকিয়াছে। এই ভাবে যাহার যাহা মনে আসিতেছিল সে তাহাই বলিল।

জঙ্গলের মধ্যে গর্ত্ত থাকাই সম্ভব মনে করিয়া, নিকটবর্ত্তী দর্শকদের জঙ্গল উল্টাইয়া দেখিতে বলা হইল। তাহারা উৎসাহের সহিত বন উল্টাইতে লাগিল। খানিকক্ষণ ওলট্ পালট্ করিতে করিতে হঠাৎ একজন 'বাঘ' 'বাঘ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পর সেখানে গিয়া দেখা গেল, বেচারা মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

গুলি করা হইল না, অথচ বাঘ মরিয়াছে—ইহাই তখন সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিল। সমস্যা তখন পূরণ করে কে?

বাঘটাকে নাড়াচাড়া করিয়া দেখা গেল যে, উহার মাথার খুলি গুঁড়া হইয়া গিয়াছে, নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে।

তাহার পর শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের 'চন্দনতারা' নাম্নী এক হস্তিনীর পায়ে রক্তের দাগ দেখিয়া সমস্যা পূরণ হইয়া গেল। 'চন্দনতারা'র পদতলে পিষ্ট হইয়া বেচারা ইহ জীবনের সকল সাধ মিটাইয়াছে। সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের হস্তে নিহত হইলে স্বর্গলাভের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু জন্মান্তরীন কর্ম্মফল তাহাকে অন্য দিকে টানিয়া নিয়া গেল।

তাহার পর আমরা ইহার সঙ্গিটীকেও ইহার পথবর্ত্তী করিয়া, তাহার বৈধব্য শোক দূর করিয়াছিলাম।

৩। আর একবার আমাদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী বেগুনবাড়ী

নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের চরে কয়দিন হইতে বাঘের খুব দৌরাত্ম্য শোনা যাইতেছিল। আমাকে ২।৩ দিন সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও হাতীর অভাবে শিকারে যাইতে পারিতেছিলাম না। কয়দিন পরে তিনটী মাত্র হাতী সংগ্রহ করিয়া শিকারে বাহির হইলাম। এই তিন হাতীর মধ্যে কোনটীই হাওদায় মজবুদ (Staunch) ছিল না। যাহা হউক, একটার উপর হাওদা দিয়া যাইয়া দেখা গেল, ব্রহ্মপুত্রের চরে খড় ও ঝাউ জঙ্গলে বেশ পাকাপোক্ত হইয়া বসিয়া অনেক গো-বংশ ধ্বংস করিয়াছে।

সেখানে মাত্র দুই টুক্‌রা জঙ্গল ছিল। একটির ২৫।৩০ গজ দূরেই আর একটি ছিল। আমাদের সঙ্গে মোটেই হাতী তিনটী, তাহার মধ্যে দুই হাতী দিয়া জঙ্গল বীট করিয়া এক হাতী stopএ রাখিলে, জঙ্গল ভাঙ্গা চলে না। যাহা হউক, কিছুক্ষণ চেষ্টার পর বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল। আমরা বীট করিতে আরম্ভ করিলে, শে দূর হইতেই এক জঙ্গল হইতে অপর জঙ্গলে চলিয়া যায়, কাযেই মারার কোন সুবিধা হইতেছিল না। যদি কখনও আমি দুই জঙ্গলের মধ্যে নাকায় (stopএ) দাঁড়াইয়া অন্য হাতী দুইটীকে জঙ্গল বীট করাই, তখন আর বাঘ বাহিরই হয় না। আমরা আবার সেই জঙ্গলে গিয়া তিন হাতী দিয়া বীট করা আরম্ভ করিলেই অন্য জঙ্গলে চলিয়া যায়। এইরূপ ক্রমাগত ঘোরাঘুরিতে অত্যন্ত বিরক্ত ও হয়রাণ হইয়া পড়িলাম, কিন্তু বাঘ মারিতে পারিলাম না। আর একটু চেষ্টার পরই, দৈবাৎ একটিকে একবার সুবিধামত বাহির হইতে দেখিয়া, এক স্ন্যাপ-শটেই নিঃশেষ করিলাম। কিন্তু আরও ২।৪ বার চেষ্টা করিয়া অপরটিকে কিছুতেই মারিতে পারিলাম না।

পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইয়া. অবশেষে বনের চতুর্দ্দিকে শুক্‌না খড়ে আগুন ধরাইয়া দিলাম। দশ বার মিনিটের মধ্যেই সমস্ত

খড় পুড়িয়া শেষ হইয়া গেল, কিন্তু বাঘ বাহির হইতে দেখা গেল না। আমার বিশ্বাস ছিল, আগুন দিলেই কোন একদিক দিয়া দৌড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। এই সময় কোন একজন লোক বলিয়া উঠিল 'ঐ যে বাঘ পড়িয়া আছে।'

সেখানে যাইয়া আমরা কাল লোমশূন্য কুকুরের মত কি একটা দেখিলাম। খুব নিকট গিয়া দেখিলাম, ব্যাঘ্রপ্রবর পুড়িয়া ঝল্‌সিয়া গিয়াছে ; শরীরে লোমের চিহ্নমাত্র নাই, সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া কাল হইয়া গিয়াছে, উপুড় হইয়া পড়িয়া আমার দিকে মিট্ মিট্ করিয়া চাহিতেছে ও নিঃশব্দে দাঁত বাহির করিতেছে। আমি ত দেখিয়াই অবাক্! উহাকে তখন মারিতেও ঘৃণা বোধ হইল। পরে চরের উপস্থিত দর্শক মুসলমানগণের লগুড়ঘাতে উহার দহন যন্ত্রণার অবসান হইল।

এই সকল ঘটনা হইতে আমার বেশ ধারণা হইয়াছে যে, নিকটবর্ত্তী স্থানে ভাল জঙ্গল না থাকিলে, অধিকাংশ সময়ই ইহারা হাতীর পদতলে পিষ্ট হইয়া বা আগুনে পুড়িয়া মরিতেও রাজী, তবু ফাঁকায় বাহির হইতে চায় না। কিন্তু কদাচিৎ ইহার বিপর্য্যয় যে না দেখা যায় তাহা নহে। কিন্তু তাহার সংখ্যা কম।

সব শিকারেই—বিশেষতঃ মহিষ, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু শিকারে আর একটি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। এই সব শিকারে সর্ব্বদাই নূতন টোটা (cartridge) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। পুরান হইলে তাহার ক্যাপের রং খারাপ হইয়া যায় ও ভিতরের বারুদ জমিয়া থাকে। সে অবস্থায় অনেক টোটা আওয়াজই হয় না। কোন কোন সময় এইরূপ পুরান কার্ত্তুসের ক্যাপ ফুটিয়া এক আধ সেকেণ্ড পরে হঠাৎ আওয়াজ হয় ; ইহাকে hang fire বলে। ইহাতে নিশানা ঠিক থাকে না। Miss fire ও hang fire উভয়েই তুল্য বিপদের আশঙ্কা আছে। চার্জ্জের সময় এরূপ হইলে বিপদের গুরুত্ব যে কত হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। হাঁটিয়া

শিকারে এরূপ হইলে সময় সময় শিকারীকে নিজের জীবন দিয়াও ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এরূপ ঘটনা বিরল নহে। সামান্য কৃপণতা করিয়া ধনের লোভে প্রাণ দিয়া লাভ নাই। যদিও অনেক সময় প্রাণ যায় না বটে, তবু আশঙ্কার স্থলে অল্পের জন্য কৃপণতা না করাই ভাল। যে শিকারের উদ্দেশ্যে এত আয়াস ও অর্থব্যয়, সঙ্গে সঙ্গে বিপদ সম্ভাবনাও আছে, সেই শিকারও এই কার্পণ্যের ফলে 'মিস' করিতে হয়।

'মিস্ ফায়ার' হইয়া আমি নিজে দুর্দ্দশাগ্রস্ত না হইলেও, বহুস্থানে ভাল ভাল শিকার 'মিস্' করিয়াছি। হয়ত ভবিষ্যতে সেরূপ সুযোগ পাইবার সম্ভাবনা আর নাই।

আর এক রকমে আমি ২।৪ বার খুব জব্দ হইয়াছি। একবার রীতিমত বিপদেই পড়িয়াছিলাম, অনেক ঘোড়াওয়ালা বন্দুকের অথবা রাইফেলের দুইদিকে চাপের lock-এর উপর ২টা করিয়া special safe দেওয়া থাকে। উহা বন্ধ থাকিলে কিছুতেই বন্দুকের 'ঘোড়া' পড়ে না ও double cock (দুইমা'র) উঠান যায় না। আওয়াজ করিবার সময় ঐ safe টানিয়া খুলিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই duplicate safe ই প্রকারান্তরে অনেক সময় ভয়ানক unsafe হইয়া দাঁড়ায়। অনেক সময় ভুলে ইহা খোলাই হয় না। অথবা খুলিয়া রাখিলেও, কোন কোন সময় হাওদার ঝাঁকি লাগিতে লাগিতে বন্ধ হইয়া যায়।

আমার একটী রাইফেলের এই রকম safe ছিল। একবার আসামে এইরূপ safe লাগানো অবস্থায়, আমি একটী বাঘের উপর 'লব্‌লবি' (trigger) টিপিতে টিপিতে উহা ভাঙ্গিয়াই ফেলিলাম; তবু আওয়াজ হইল না। প্রকাণ্ড বাঘ মিনিট খানেক হাতীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। তখন অপর বন্দুক তুলিয়া মারিবার বুদ্ধিও যোগাইল না। কাযেই বাঘটীকে হারাইতে হইল।

safe যে বন্ধ ছিল তাহা আমার খেয়ালই ছিল না। এ সময় বাঘটি চার্জ্জ করিলে কি যে বিপদ হইত, তাহা কল্পনা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সে বুদ্ধি ঘটে আসিলে অপর বন্দুক উঠাইয়া ফায়ার করিলাম; কিন্তু বাঘ তখন বহুদূর চলিয়া গিয়াছিল।

আর একবার—তখন আমি নূতন শিকারী, সেই আমার প্রথম শিকার;—আমাদের পার্টিতে অনেক শিকারী ছিলেন। তখনও নূতন ধরণের নানা শ্রেণীর বন্দুক বাহির হয় নাই, আমারও ছিল না। আমার পৈতৃক সম্পত্তি যে কয়েকটী ছিল তাহা দিয়াই শিকার করিতাম। ঐ সব বন্দুকের মধ্যে safe দেওয়া ১৬ নং একটী hammer rifle ছিল; উহা নিয়াই তখন শিকার করিতাম।

একদিন আমরা হরিণ শিকারে বাহির হইয়াছি; খানিকদূর জঙ্গল বীট করিয়া যাওয়ার পর আমার সম্মুখে প্রকাণ্ড এক বয়ার (পুং মহিষ) হড়্‌মড়্‌ করিয়া বাহির হইল। তখন হরিণ মারার জন্য প্রস্তুত ছিলাম বলিয়া আমার হাতে একটি snider rifle ছিল, তাহাও আবার একনলা। মহিষ দেখিবামাত্রই গুলি করিলাম। গুলির সঙ্গে সঙ্গেই জখম হইয়া শিং নিচু করিয়া সে এত বেগে আমাকে চার্জ্জ করিল যে, আমি আর তাড়াতাড়ি অন্য বন্দুক লইবার অবকাশ পাইলাম না। হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া হাওদা হইতে ১৬নং রাইফেল উঠাইয়া লইলাম; কিন্তু তখন মহিষ আমার হাতীর পেটে শিং বিধাইয়া দিয়াছে! আমার প্রিয় হস্তিনী 'মনমতী' শৃঙ্গাঘাতে কাতর হইয়াও, পাছে তাহার প্রভুর বিপদ হয় এই আশঙ্কায় এত ধীর ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল যে, আমার হাতের বন্দুক দিয়া পুনরায় গুলি করিবার কোন অসুবিধা বোধ করি নাই। কিন্তু হায়, সমস্তই বৃথা হইল। সেই safe দেওয়া বন্দুকের 'লব্‌লবি টিপিতে টিপিতে এবারও বাঁকাইয়া ফেলিলাম। সেই সময় আমার

অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, হয়ত আর একটু হইলেই হাতী শুদ্ধ উল্টাইয়া পড়িতাম। অন্য হাতী হইলে নিঃসন্দেহ ইহার বহু পূর্ব্বেই পড়িয়া যাইতাম।

সৌভাগ্য ক্রমে আমার হাওদার পাশে আর এক শিকারী ৺উমেশচন্দ্র সেন মহাশয় ছিলেন। ইনি আমাদের camp ডাক্তার, তিনি উপর্য্যুপরি দুই গুলি করিয়া 'মহিষাসুর বধ করিলেন।

পরে সেই বন্দুকের safe একেবারে বন্ধ করাইয়া আনাইয়াছিলাম এবং তদবধি উহা আর বড় ব্যবহার করিতাম না। তাহার পর আমি নানা শ্রেণীর ভাল ভাল বন্দুক কিনিয়াছি; ঐ সব ছোট বন্দুক আর আমার পছন্দ হইত না।

সত্য কথা বলিতে হইলে—লোকে বলে "নাচ্‌তে না জান্‌লে উঠান বাঁকা"—আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব এই সকল বন্দুক দিয়াই কত যে হরিণ, মহিষ ও বাঘ ভালুক শিকার করিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। আর আমি 'লায়েক' হইয়াই ঐ সকল ছোট বন্দুক অপছন্দ করিয়া ফেলিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কেবল ভাল rifle হইলেই শিকার হয় না—শিকারীরও ক্ষমতা থাকা চাই।

আরও ২।১ বার মহিষের মুখে পড়িয়াছি; কিন্তু তাহা এত সাংঘাতিক হয় নাই। ইহারা হাওদা শিকারে প্রায়ই চার্জ্জ করে না। কদাচিৎ কোন কোনটা ভয়ানক হইয়া উঠে।

স্বর্গীয় মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় একবার ঠিক এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মহিষ তাঁহার হাতীর প্রস্রাব দ্বার চিরিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর হইতে ঐ হাতী মহিষ শিকারে অত্যন্ত ভয় পাইত; কিন্তু অন্য শিকারে পূর্ব্ববৎ দৃঢ় ছিল।

আর একবার আমি বর্ষাকালে নৌকা করিয়া মহিষখলা শিকার করিতে যাই। ইহা ৭।৮ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। সেবার পার্টিতে

কেবল আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীহট্টের জমিদার পরলোকগত মহী-উদ্দিন চৌধুরী ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না।

একদিন 'কালাগড়' নামক এক জঙ্গলে একপাল মহিষের সংবাদ পাইয়া আমরা শিকার করিতে যাই। অল্প কালেরই মধ্যে মহিষের সন্ধান হইল। প্রকাণ্ড বয়ারকে আমি গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই সে চার্জ্জ করিয়া এত বেগে আসিয়া আমাদের সঙ্গের 'খুঁজি' আম্‌জদালী মুন্সী যে হাতীতে ছিল তাহার পেছনের দুই পায়ের ভিতর দিয়া শিং চালাইয়া এত জোরে গুতাইতে লাগিল যে হাতী প্রায় উল্টাইয়াই পড়ে। যন্ত্রণাকাতর হস্তিনীর বিকট চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে মুন্সীর "এ আল্লা মইলাম! এ আল্লা মইলাম!" (মরিলাম) ও জঙ্গলের 'হড়্‌মড়্‌' শব্দে আমি যত সত্বর সম্ভব তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, মুন্সী গদির দড়ি ধরিয়া এক দিকে ঝুলিয়া পড়িয়া ঐরূপ চেঁচাইতেছে। ও দিকে হাতীর ত এই অবস্থা! আরাম হাওদা মতিলাল নামক এক মাকনার উপর ছিল। আমার গুলি করিবার পূর্ব্বেই মাহুতের ইঙ্গিতে সে এত বেগে শুঁড় দিয়া মহিষকে ধাক্কা দিল যে, মহিষটা ছিট্‌কাইয়া কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল। এদিকে আক্রান্ত হাতীও ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে মুন্সী ঝুলিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া উপর্য্যুপরি আমি দুই ফায়ার করিলাম। ইহার পরই আমার বন্ধু চৌধুরী সাহেব আসিয়া উহাকে নিঃশেষ করিলেন।

অনেক সময় মহিষ বিনা কারণেও চার্জ্জ করে। বাঘের হাতে রক্ষা পাইলেও, মহিষের চার্জ্জে খুব পূর্ব্ব পুণ্যফল না থাকিলে রক্ষা পাওয়া কঠিন। বাঘ অনেক সময় থাবা দিয়া বা আঁচড় কামড় দিয়াও ছাড়িয়া যায়; কিন্তু মহিষ, একবার ধরিতে পারিলে শেষ না করিয়া ছাড়ে না।

একবার আসামে, 'চুনারির ঘাট' নামক স্থানে আমরা camp

মত্ত বাঘের পশ্চাদ্ধাবনকারী মহিষ আহত হইয়া পলায়মান

করি। সেখানে একদিন শিকারে বাহির হইয়া যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম তাহাই লিখিতেছি।

একদিন শিকার করিয়া আমরা তাঁবুতে ফিরিতেছি, কতক শিকারী ও হাতী আগে চলিয়া গিয়াছে, কতক পাছে আসিতেছে এইরূপ বিশৃঙ্খল ভাবে আমরা যাইতেছিলাম। মনুবাবু, রাজা জগৎ-কিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও আমি পাশাপাশি তিন হাওদায় গল্পগুজব করিতে করিতে যাইতেছিলাম। ব্রহ্মপুত্রের 'চরের' মধ্যে কাশবনে একটি চরশ (Florican) পাখী উড়িতে দেখিয়া, মনুবাবু আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, একটি ছর্‌রার বন্দুক হাতে লইয়া নামিয়া পড়িলেন। পাখীটি এক-একবার উঠিয়া খানিক দূরে গিয়া বসিতেছে, আর তিনি উহার পাছু লইতেছেন। এইরূপে তিনি আমাদের হাতী হইতে ক্রমেই দূরে সরিয়া পড়িতেছিলেন। আমরাও ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। তখন কেহ বলিতেছিল, "আমরা চলিয়া যাই", কেহ বা আর একটু অপেক্ষা করিতেও বলিতেছিল। যদি আমরা সত্যই তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতাম, তবে হয়ত উহাই চিরজীবনের জন্য ছাড়াছাড়ি হইত। এই ভাবে কতকদূর অগ্রসর হইবার পর দেখিলাম যে, কাশবন হইতে এক প্রকাণ্ড মহিষ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা প্রথমে উহাকে পালিত মহিষ মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু এরূপ নির্জ্জন স্থানে পালিত মহিষ আসিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, তাহাও আলোচনা করিতে লাগিলাম। মিনিটখানেকের মধ্যে দেখা গেল, মহিষটা শিং নীচু করিয়া মনুবাবুকে লক্ষ্য করিয়া চার্জ্জ করিয়াছে।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তিনি মহিষ হইতে অনেক দূরে ছিলেন; নচেৎ সেদিন আর তাঁহার রক্ষা পাইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। আমরা তখনই সকলে মিলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে তাঁহার পিছনে ঊর্দ্ধশ্বাসে হাতী ছুটাইলাম, আমরা হাওয়ার প্রতিকূলে ছিলাম

বলিয়াই এত চীৎকারও তাঁহার কাণে পৌঁছিতেছিল না। আমার হাওদা সেদিন 'জুলিয়া' নাম্নী এক অতি দ্রুতগামিনী হস্তিনীর উপর ছিল। এই হাতী এত বেগবতী ছিল যে, অনেক সময় সে ভাড়াটিয়া গাড়ীর সহিতও ২।৪ মাইল রাস্তা দৌড়াইয়া যাইতে পারিত।

যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আমরা মহিষের কাছে যাইতে পারিলাম না। তবে অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলাম। ইহার পর এমন সঙ্গীন সময় উপস্থিত হইল যে, আর একটু পরেই মনুবাবুকে ধরিয়া ফেলে আর কি! তখন নিরুপায় হইয়া রাজা জগৎকিশোর ও আমি উভয়েই হাতী দাঁড় করাইয়া, খুব নিশানা করিয়া দূর হইতেই দুই গুলি করি-করিলাম। ভগবানের অশেষ করুণা যে,আমাদের গুলি ব্যর্থ হয় নাই, পক্ষান্তরে খুব ভাল ফলই হইয়াছিল। আহত হইয়াই দুষমন্ মনুবাবুর দিকে আর না গিয়া অন্য দিকে দৌঁড়াইল। আমারাও তখন উহার পাছে পাছে দৌড়াইয়া, গুলি বর্ষণ করিতে করিতে উহাকে নিপাত করিলাম। বলা বাহুল্য মনুবাবুও পরে আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

মনুবাবু যে এইরূপ সাংঘাতিক অবস্থায় পড়িয়াছিলেন তাহা তিনি বন্দুক আওয়াজের পূর্ব্বে টেরই পান নাই। তিনি কিন্তু এক মনে পাখীটিকেই অনুসরণ করিতেছিলেন।

মেহের উল্লা নামক আমাদের সঙ্গের স্থানীয় প্রসিদ্ধ শিকারী ও "খুজি"র নিকট পরে জানিতে পারিলাম যে, এই মহিষটী ঐ অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বে ২।৩টি মানুষ মারিয়াছিল। নিরীহ লোকেরা খড় কাটিতে গিয়া অকালে প্রাণ দিয়াছিল। ইহার পর হইতে মনুবাবু আর কখনও এ ভাবে হাঁটিয়া যাইতেন না; সর্ব্বদাই সঙ্গে একটী প্যাড হাতী রাখিতেন।

এই জাতীয় খুনী মহিষকে মার্কা মহিষ বলে। বাথানের পালিত কাছুর মহিষের মধ্যেও এইরূপ মার্কা মহিষ আছে, তাহাদের সম্মুখের

এক পায়ে কাঠের কুঁদা বাঁধা থাকে, উহা নিয়া তাহারা বেশী দৌড়াইতে পারে না।

এখনও আমার trophyর মধ্যে ঐ মহিষের মাথাটি রক্ষিত আছে, যখনই উহাকে দেখি, তখনই যেন উহার জীবিত কালের সেই ভীষণ দৃশ্য বায়োস্কোপের ছবির মত আমার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটী গল্প বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

সেবার আসামের 'খল্‌সিয়ার ভিটা', 'চুণারী ঘাট' প্রভৃতি অনেক স্থানে শিকার করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময়, আমাদের হাতী, গরুর গাড়ী ও অধিকাংশ লোকজন, হাঁটা পথে তুড়া পাহাড়ের রাস্তায় ফিরিবার উপদেশ দিয়া, কতক লোকজন সঙ্গে গোয়ালপাড়া হইতে ষ্টীমারে উঠিলাম। আমাদের সঙ্গে সেই বারের শিকারলব্ধ বাঘের চামড়া মাথা ও হরিণের ভাল ভাল শিং প্রভৃতি অনেক ছিল।

শিকারপার্টি কোন স্থানে যাতায়াত করিবার সময় সর্ব্বদাই পাশ্চাত্য জাতি কর্ত্তৃক বেশ সমাদৃত হইয়া থাকেন। অনেক সময়, বাঘ ও হরিণের কাঁচা চামড়া ও মাথা অত্যন্ত দুর্গন্ধ সত্ত্বেও তাঁহারা বিরক্ত না হইয়া বরং যথেষ্ট প্রীতির চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। ইহার কারণ কেবল পাশ্চাত্য জাতির স্বভাবসিদ্ধ শিকারপ্রিয়তা। কিন্তু কোন কোন স্থলে আবার কেহ কেহ "নেটিভ" বিদ্বেষ-বিষে এতই জর্জ্জরিত যে, এই সব বিলাস-ব্যসনে বা অন্য কিছুতেও তাঁহারা ক্ষণিক বিষ উদ্‌গিরণ না করিয়া কিছুতেই শান্তি পান না।

দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ জাহাজে ৩।৪টি সাহেব ও ২।৩টি মেম ছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই জাহাজের 'ক্যাবিন' গুলি দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। আমাদের দলবলও কম ছিল না। ৬।৭টি প্রথম শ্রেণীর

আরোহী ৪।৫টি দ্বিতীয় শ্রেণীর। ইহা ছাড়া চাকর বাকরও ২০।২৫ জন ছিল। ক্যাবিন গুলি অন্যায়ভাবে আবদ্ধ দেখিয়াও, সাহেবদিগকে বিরক্ত না করিয়া আমরা ষ্টীমারের সামনের ডেকে ফরাস বিছাইয়া লইলাম।

তখন চৈত্র মাস, ক্যাবিনের গরম ভোগ করা অপেক্ষা বরং এখানে আমরা আরামই বোধ করিতেছিলাম। আমরা কতকগুলি নেটিভ, জাহাজের ডেক দখল করিয়া সাহেব মেমদের আমোদ উপ-ভোগ ও বৈঠকের সুবিধা নষ্ট করিয়াছি বলিয়া, বোধ হয় মনে মনে আমাদের উপর তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু এই সমস্ত শ্বেত-কায় বীরপুরুষের মধ্যে একজন কিছুতেই মনের ঝাল না ঝাড়িয়া থাকিতে পারিলেন না।

সকাল বেলা আমরা ডেকের ফরাসে বসিয়া চা পানান্তে নানারূপ গল্পগুজব করিতেছি। আমাদের মধ্যে একজন তাঁহার গড়্গড়াতে পরম আরামে ধূমপান করিতেছিলেন। হঠাৎ সেই শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গব পশ্চাৎ দিক হইতে চোরের মত আসিয়া গড়্গড়া হইতে 'সরপোষ' (ঢাক্‌নি) সমেত কল্কেটী টপ্ করিয়া তুলিয়া লইয়া ব্রহ্মপুত্র গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। এই কাযটি করিয়াই সে যেন বড় একটা কিছু বাহাদুরী করিয়াছে এই ভাব দেখাইয়া, অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে তাহার সঙ্গীদিগের সহিত হাসি তামাসা করিতে করিতে সেলুনের ভিতর দিয়া গিয়া যে যাহার কেবিনে ঢুকিয়া পড়িল। এত তৎপরতার সহিত কাযটি সম্পন্ন হইল যে আমরা সকলেই একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। কোন প্রতিকার করা দূরে থাকুক কিছু বলিবার অবসরও পাওয়া গেল না। বলা বাহুল্য আমরা সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া প্রতিশোধের সুযোগ প্রতীক্ষায় রহিলাম।

সত্য সত্যই তখন আমার মনের ভাব যে কি হইয়াছিল তাহা

বলিতে পারি না। পরাধীন জাতি হইলেই কি এতখানি নিগ্রহ সহ্য করিতে হইবে?

ভগবান অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিশোধের সুযোগ করিয়া দিলেন। ঘণ্টা দুই বাদে প্রাতরাশের অব্যবহিত পরেই ইহারা পুনরায় ডেকে আসিয়া গল্প গুজব আরম্ভ করিল। কাহারও মুখে সিগার কাহারও বা সিগারেট ছিল; এবং আমাদের প্রিয় বন্ধুটী পাইপে তামাক ভরিয়া বেশ আরাম করিয়া টানিতেছিল। ষ্টীমারের চিম্‌নি অপেক্ষা ইহার মুখ-গহ্বর হইতেও টানে টানে বড় কম ধূম উদ্‌গার হইতেছিল না। আমার যেন আর সহ্য হইল না। হঠাৎ উঠিয়া নিমিষের মধ্যে তাহার সম্মুখে গিয়া প্রজ্বলিত পাইপ্‌টি তাহার মুখ হইতে টানিয়া লইয়া তাহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলাম। বলা বাহুল্য, ইহার ফল ভালই হইয়াছিল। আর মন্দ হইলেও তাহার জন্য আমি প্রস্তুতই ছিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে সাহেবগণ যে যার ক্যাবিনে প্রবেশ করিয়াই যে দরজা বন্ধ করিল, আর বড় একটা বাহিরে আসিল না। যদিও বা কদাচিৎ কেহ আসিত, সিগার বা সিগারেট কাহারও মুখে দেখা যাইত না। কিন্তু আমাদের বন্ধুবর সেই যে ক্যাবিনে ঢুকিলেন, গোয়ালন্দ যাওয়ার পূর্ব্বে আর তাহাকে বাহির হইতে দেখা যায় নাই।

এইরূপ আরও ২।১ বার ইহাদিগকে নেটিভ বিদ্বেষ জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া নিস্ফল ক্রোধে আস্ফালন করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু পূর্ব্বের মত প্লীহা ফাটার দিন এখন ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছে—

"তেহি নো দিবসা গতাঃ"

হাতী শিকারী না হইলে হাওদায় অনেক সময়ই বিপদের সম্ভাবনা থাকে। যদি কোন দিন নিরাপদে ফিরিয়া আসা যায় তবে সেদিন যেন দৈবই রক্ষা করিল বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বদা সকল শিকারীর পক্ষে খুব শিক্ষিত হাতী পাওয়া কঠিন। মাঝারি শ্রেণীর হাতীও

মন্দ নহে। সচরাচর ইহারা পলায় না, তবে বাঘ শিকারে বড় স্থির হইয়াও থাকে না। স্থির থাকুক আর নাই থাকুক, জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া বাঘের গন্ধ পাইলেই মাথা ঝাকিয়া 'দে ছুট' না হইলেই রক্ষা। কতকগুলি হাতী অত্যন্ত ভীরু। বাঘ ত দূরের কথা জঙ্গলে একটি পাখী বা গো সাপ নড়িয়া উঠিলেই ইহারা আতঙ্কে নৃত্য করিতে থাকে। বাঘের গন্ধ পাইলেই ইহাদের মাথা ঝাঁকুনিতে ও চিৎকারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে; লাইনও নষ্ট হইয়া যায় অনেক সময় আমরা এই জাতীয় 'ভাগড়া' হাতী বাধ্য হইয়া লাইন হইতে সরাইয়া দিয়াও শিকার করিয়াছি।

এই শ্রেণীর খারাপ হাতীতে শিকার করিতে গিয়া একবার যে বিপদ হইয়াছিল তাহা ভাবিলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বিপদ-মুক্ত হইয়া গেলে, তাহা লইয়া অনেক সময় আমরা রহস্যালাপ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু যাহাই করি না কেন, ইহাতেও অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

সে আজ ১৪।১৫ বৎসরের কথা, একবার শিলেট অঞ্চলে শিকার করিবার সময় আমাদের পার্টিতে গোবরডাঙ্গার জমিদার ৺ রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ জগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ছিল। সে তখন নূতন শিকারী, সবে মাত্র Big game shootingএ হাতে খড়ি দিবার জন্য সেই বারই আমাদের পার্টিতে যোগ দিয়াছিল। তখন তাহার বয়স ১৮।১৯ বৎসর হইবে। ভবিষ্যৎ জীবনের অসীম আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম লইয়া, প্রথম বাঘ শিকার দেখিতে গিয়াছিল। সেবারে সে নূতন শিকারী বলিয়া বাঘ শিকারের সময় সর্ব্বদাই কোন প্রবীণ শিকারীর হাওদার পশ্চাতে স্থান পাইত। হরিণ শিকারে কিন্তু পৃথক হাওদায় স্বাধীন ভাবে তাহার শিকারের ব্যবস্থা ছিল।

সেবার আমরা নেত্রকোণা হইয়া প্রথমে 'গারো হিল' এর নিম্ন

দিয়া শিকার করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হই। 'টাঙ্গুয়ার' প্রকাণ্ড হাওরের পারে কতকগুলি হরিণ ও মহিষ শিকার করিয়া সিলেট শ্রীপুরের জমিদার শরৎবাবুর বাড়ীর নিকটে ক্যাম্প করি। শরৎ বাবুর সঙ্গে এই শিকার উপলক্ষেই প্রথমে পরিচয় হইয়া পরে তাহা বান্ধবতায় পরিণত হইয়াছিল।

এই ক্যাম্পের নিকট 'জোড়কান্দা' নামক স্থানে হরিণ শিকারের একটা ভাল স্থান আছে। যখনই আমরা শ্রীপুরে ক্যাম্প্ করিতাম ২।১ দিন জোড়কান্দায়ও হরিণ শিকার করিয়া যাইতাম।

সেদিনও আমরা হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যেই বাহির হইয়াছিলাম। উপর্য্যুপরি কয়েকদিনের শিকারে শ্রান্ত ক্লান্ত আমাদের ভাল ভাল শিকারী হাতীগুলিকেও সেদিন বিশ্রাম দেওয়া হইয়াছিল। কাযেই সকলের হাওদাই বাজে হাতীর উপর ছিল। জগৎপ্রসন্নও সেদিন হরিণ শিকার বলিয়া রাজা জগৎকিশোরের 'কমল কলি' নামক হাতীর উপর পৃথক হাওদায় স্থান পাইয়াছিল। অদৃষ্টগুণে তাহার হাতীটীও তত ভাল ছিল না।

আমরা জোড়কান্দায় গিয়া গোটা দুই হরিণ মারিয়াছি, এর মধ্যে মাহুতদের "বাঘ বাঘ, ঐ যায়, ঐ যায়" চিৎকারে সেইদিকে আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। মাহুতদের অনেক সময় অযথা বাঘ বাঘ করিয়া চেঁচাইয়া উঠা একটা স্বভাব, বিশেষতঃ আমার হাতীর দারোগা আশ্রবালীর ভ্রাতার, জঙ্গলে ঢুকিয়াই 'টাইগার টাইগার' বলিয়া চিৎকার করা একটা মুদ্রাদোষ বিশেষ ছিল। নানারূপ জেরা করিয়া আমরা বাঘ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলে, অতঃপর কি কি করা যায় সেই পরামর্শ চলিতে লাগিল। কাহারও ভাল হাতীতে হাওদা ছিল না। ভাল হাতীতে হাওদা বদল করিতে হইলে অন্ততঃ এক ঘণ্টা সময় নষ্ট হইবে, ততক্ষণ বাঘ চলিয়াই যাইবে। কাযেই 'যা থাকে কপালে' মনে করিয়া যেখানে বাঘ

গিয়াছে বলিয়া দেখাইয়া দিল তাহার নিকটে যাইয়াই আমরা লাইন ফর্ম্ম করিয়া ফেলিলাম। খানিক যাইতে না যাইতেই বাঘ দেখা গেল; কিন্তু তখনও উহা দূরে ছিল। নূতন শিকারী হইলেও জগৎপ্রসন্ন দূর হইতেই এক গুলি করিল। গুলিটী সম্পূর্ণ বিশ্বাস-ঘাতকতা না করিয়া, বাঘের পিছনের পায়ে গিয়া লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সপ্তরথীতে উহাকে ঘিরিয়া ফেলিলাম। বাঘও একটা ঝোপের মধ্যে আশ্রয় লইয়া ক্রমাগত গর্জ্জন করিতে লাগিল। আমরা ঘিরিলাম বটে, কিন্তু বাঘের ভয়ানক ডাক শুনিয়া হাতীগুলি আর এক পা-ও অগ্রসর হইতেছিল না, দূরে চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু জোর করিয়া 'বাড়াইবার' চেষ্টা করিলেই মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া ক্রমাগত চীৎকার ও মাথা ঝাঁকানি দিয়া হট্ করিতে লাগিল।

যদি বাঘও 'ঝোপ' হইতে বাহির না হয়, আমরাও কাছে যাইতে না পারি, তবে আর শিকার হইবে কি করিয়া? কেহ ঢিল ছুড়িতে ছুড়িতে, কেহ কেহ বা কতকগুলি শুক্‌না বন কাটিয়া আগুন ধরাইয়াও বাঘের দিকে ছুড়িতে লাগিল। ইহাতে কিছু ফল হইল। হঠাৎ একবার বাঘটা ঝোপ হইতে বিদ্যুতের মত বাহির হইয়া একটী হাতীর কাণ কামড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল। আমরাও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলাম। গুলি করিবার অবসর কৈ? ইচ্ছা করিলে বাঘ সেই গোলমালের সময় অনায়াসেই চম্পট দিতে পারিত; কিন্তু আমাদের দুর্দ্দশার সবে মাত্র সুরু, সে এখনই যাইবে কেন? যাহা হউক, হাতীর ঝাড়ায় বাঘ পড়িয়া গিয়া আবার সেই ঝোপেই আশ্রয় লইল। আমরাও উহাকে পুনঃ ঘিরিয়া ফেলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলাম—তাঁবু হইতে হাওদার হাতী আনিয়া হাওদা বদ্‌লাইয়া লওয়া হউক, নচেৎ বাঘ-মারা শক্ত হইবে। আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববৎ ঢিল ছোঁড়াও চলিতেছিল। ২।৪ মিনিট পরে বাঘও

আবার সেইরূপ হঠাৎ চার্জ্জ করিয়া একেবারে মহেশ বাবুর হাতীর মাথার উপর লাফাইয়া উঠিল। মাহুত বেচারা গত্যন্তর না দেখিয়া ক্রমাগত বাঘের মাথায় 'গজ্‌বাক্' দিয়া খোঁচাইতে লাগিল আর "এ আল্লা—এ আল্লা—খাইল!" বলিয়া চেঁচাইতে আরম্ভ করিল। ইহা যে সে ইচ্ছা করিয়া বা বুদ্ধি খাটাইয়া করিয়াছিল তাহা নহে, সঙ্গীন মুহূর্ত্তে 'ঘাব্‌ড়াইয়া' গিয়া, তাহার যাহা মনে হইতেছিল তাহাই করিতেছিল। এবার আর মহেশ বাবুর লক্ষ্যও ব্যর্থ হয় নাই বা তাঁহার গুলিতে হাতীর কাণও ছেঁদা হয় নাই। পেটে গুলি খাইয়া বাঘ হাতী হইতে পড়িয়া গিয়া, আর ঐ ঝোপে না ঢুকিয়া অন্যদিকে যাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, এবারও আমাদের হাতীগুলি পূর্ব্ববৎ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কিন্তু আহত হওয়ায় বাঘ খুব জোরে চলিতে পারিতেছিল না। আমরা আবার লাইন করিয়া পূর্ব্ববৎ উহাকে ঘিরিয়া ফেলিলাম। একটু পরেই আবার চার্জ্জ করিয়া জগৎপ্রসন্নের হাতী কমলকলির কাণ ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল। এবার বাঘ সম্মুখের এক পা হাতীর কাণে ও অপর পা কাণের পেছন দিক দিয়া মাহুতের উরুতে বিঁধাইয়া হাতীর কাণ কামড়াইয়া ধরিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে হাতীটীও হাওদা সমেৎ কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। যাঁহারা হাতীর 'হেড়ে নেওয়া' দেখিয়াছেন,—তাঁহারা এইরূপ শোয়াটা বেশ ধারণা করিতে পারিবেন। হাওদা সমেত এইভাবে হাতীর শুইয়া পড়া জীবনে সেই একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। এ ভয়ানক দৃশ্য আর ভুলিবার নয়। বাঘের শরীরটা হাতীর মাথা ও তাহার বিরাট দেহের ফাঁকে পড়ায় বোধ হয় বাঘটার কিছু হয় নাই; নচেৎ হাতীর চাপনে পিষ্ট হইয়া যাইত। হাতী ক্রমাগত ঝটাপটি করিয়া খানিক উঠিতেই বাঘটা যেন উহার কাণ ধরিয়া টানিয়া আবার শোয়াইয়া ফেলে। হাতী খানিকটা উঠিলে বাঘের শরীর দেখা যায়, আবার শুইলে হাতীর তলায় ঢাকা পড়িয়া কেবল মাথাটা দেখা যায়।

এই সময় উপরের শিকারীর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। হাতীর এইভাবে ক্রমাগত ঝটাপটির সময় শিকারীর মাথা হাওদার শিকের সহিত ঠোকাঠুকি হইতেছিল। বন্দুক ও অন্যান্য যাহা কিছু হাওদায় ছিল, প্রায় সমস্তই মাটীতে পড়িয়া গেল। মাত্র একটী বন্দুক কেমন করিয়া যেন হাওদায় আট্‌কাইয়া ছিল। সৌভাগ্য যে বন্দুকগুলি মাটীতে ছিটকাইয়া পড়িয়াও আওয়াজ হয় নাই। শিকারী কাৎ হইয়া প্রাণপণ শক্তিতে হাওদার শিক ধরিয়া আছে। হাতী যখন এক একবার উঠিবার চেষ্টা করে, তখন শিকারীর মাথা বাঘের মুখের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। আবার যখনই হাতী শুইয়া পড়ে তখন বাঘের মুখ ও শিকারীর মাথা অর্দ্ধহস্তের মধ্যে আসিয়া পড়ে।

এই অবস্থায় আমরা সকলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। বাস্তবিক তখন দৈবের উপর নির্ভর করা ভিন্ন অন্য উপায়ও ছিল না। বাঘ মারিতে হাতী মারি, কি মানুষ মারি এই আশঙ্কায় সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভগবানের অশেষ করুণায় মহেশ বাবু হঠাৎ অগ্রসর হইয়া বাঘের কোমর লক্ষ্য করিয়া এক গুলি করিলেন। যদিও এই কায তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অবৈধ ও দায়িত্ব-পূর্ণ, তথাপি অনেক সময় অনেক মন্দ কাযের মধ্য দিয়াও সৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। কোমরে গুলি লাগিয়াই বাঘ হাতী ছাড়িয়া মাটীতে পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মনুবাবুর গুলিতে এই ভীষণ দৃশ্যের অবসান হইল।

ইহার পর হাওদাস্থিত শিকারীকে প্রকৃতিস্থ করিতে কিছু সময় লাগিয়াছিল। মাহুতের কয়েক স্থানে ছুরির কাটার মত (incision) খুব জখম হইয়াছিল। অনেক চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের পরে সে আরোগ্যলাভ করে।

হাওদার হাতী ভাল না হইলে অনেক সময়ই এইরূপ বিপদের

আশঙ্কা থাকে। সর্ব্বদা ভাল হাতী পাওয়া কঠিন; কিন্তু যতদূর সম্ভব অন্ততঃ মাঝারি রকমের হাতীও নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া উচিত। যে সে হাতীতে হাওদা দিলেই শিকার ভাল হইবে এই ধারণা ঠিক নহে। বরং মাটীতে দাঁড়াইয়া শিকার করাও ভাল, কিন্তু নিকৃষ্ট হাতীতে হাওদা দিয়া বিপদগ্রস্ত হওয়া মূর্খতা। বাঘ যদি মহেশ বাবুর গুলিতে হাতীকে ছাড়িয়া না দিত, তবে হাওদায় মাথা ঠোকাঠুকি হইয়া অথবা বাঘের মুখেই শিকারীর পরিণাম আরও শোচনীয় হইত।

এদিকে যেমন হাওদা শিকার অন্যান্য প্রকারের শিকার অপেক্ষা নিরাপদ ও সুবিধাজনক, অন্যদিকে তেমনি এইরূপ 'ভাগড়া' হাতীতে শিকার করা সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। কারণ ইহাতে শিকারীর স্বাধীনতা মাত্রও নাই, সমস্তই হাতীর উপর নির্ভর করে। হাঁটা শিকারে বরং যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে।

এইবার একটী হাতী-ডুবির অত্যাশ্চার্য্য গল্প বলিব। ইহার সঙ্গে শিকারের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও, শিকার উপলক্ষ্যেই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল বলিয়া, এ স্থলে ইহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমরা শ্রীপুর হইতে ক্যাম্প উঠাইয়া, আরও কয়েক স্থানে শিকার করিয়া, শেষ ক্যাম্প সিলেটের 'তরঙ্গিয়া' নামক স্থানের একটী নদীর পারে করি। একদিন দশ বার মাইল দূর হইতে সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই দুইজন লোক আসিয়া বাঘের খবর দিল— অমুক গ্রামে রক্তি নদীর অপর পারে, সেই দিনই বাঘে দুইটি গরু মরি (kill) করিয়াছে। সেবার সেই ক্যাম্পে, আমাদের কেমন অযাত্রা হইয়া পড়িয়াছিল যে, প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন স্থান হইতে বাঘের খবর পাইতাম, কিন্তু প্রতি দিনই বিফল হইয়া ফিরিতাম। কোন দিন টাইগার লেপার্ড হইয়া দাঁড়াইত, কোনদিন বা অদৃষ্টগুণে তাহাও জুটিত না। আবার কোন দিন বা 'মরি'

খাইয়া বাঘ সে জঙ্গল হইতে চলিয়া গিয়াছে, এরূপও ঘটিত। কখনও বা ঘনবিস্তৃত জঙ্গলের জন্য, অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিতাম। এইরূপ নানা কারণে কয়েক দিনের বিফলতায়, সকলেই প্রায় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলাম; এমন সময় এই সংবাদটী পাইয়া সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্রমাগত কয়েকদিনের বিফলতায়, ও শিকার স্থানের দূরত্বের কথা উল্লেখ করিয়া, বড় বেশী উৎসাহ দেখাইলেন না। যাহা হউক স্থির হইল, পরদিন আমরা 'প্যাড্' হাতীতে (গদীর হাতীতে) পরে যাইব, একটু সকাল করিয়া কতকগুলি বাজে হাতীতে হাওদাগুলি রওয়ানা করিয়া দিব, ইহাতে হাওদার হাতীগুলির পরিশ্রমেরও লাঘব হইবে।

তদনুসারে পরদিন প্রত্যূষে, একজন খুঁজিকে দিয়া হাতীগুলি রওনা করাইয়া দেওয়া হইল, একজন আমাদের অপেক্ষায় থাকিল।

অনুমান ৯ ঘটিকার সময় রওনা হইয়া প্রায় ১২টার সময় আমরা 'রক্তি' নদীর পারে গিয়া দেখি, হাতীগুলি আমাদের প্রতীক্ষায় বিশ্রাম করিতেছে।

নদীর অপর পারে খানিক দূরেই শিকারের স্থান। এই স্থানে নদীর অবস্থাটা একটু বলা আবশ্যক। ইহা একটি মন্দস্রোতা ও অল্প পরিসরা নদী, উভয় তীর নানাবিধ ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষরাজি ও জঙ্গলে আচ্ছাদিত। বর্ষায় পারাপারের জন্য একটি খেয়াঘাট আছে; লোকজন ও গো-মহিষাদি চলিতে চলিতে উহা একটি ডোবার মত হইয়া গিয়াছে। স্রোত ছিল না বলিয়া সাধারণতঃ সাঁতরাইয়াই সকলে পার হয়; কিন্তু ঐ ডোবার মধ্যস্থলে জল অত্যন্ত গভীর ছিল, বোধ হয় ১০।১২ হাতের কম হইবে না। হাওদা ও গদীগুলি পার করার জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে নৌকা আনার বন্দোবস্ত করিয়া হাতীগুলিকে পার করিতে হুকুম দেওয়া হইল। মাহুতগণ ও

হাতীগুলিকে ‘এলোমেলো’ ভাবে জলে নামাইয়া পার করিতে লাগিল। কতক পার হইয়াছে, কতক বা ডুবিয়া ডুবিয়া সাঁতার দিতে দিতে পার হইতেছে; সে এক মনোহর দৃশ্য। মাহুতগণ কেহ বা হাতীর পিঠে দাঁড়াইয়া, কোমর অবধি, কেহ বা বসিয়া গলা অবধি ডুবিয়া ডুবিয়া যাইতেছে। ময়মনসিংহ কালীপুরের ভূম্যধিকারী, স্বর্গীয় ধমণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের ‘মধুমতী’ নাম্নী একটী কুন্‌কী হাতী, খানিকটা সাঁতরাইয়া যাওয়ার পরই, হঠাৎ যেন ‘ঘুর-পাক’ খাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আমরা সকলেই প্রথমতঃ মনে করিলাম, হাতীটী জলে খেলা করিতেছে। কিন্তু মাহুত ক্রমেই জলে ডুবিতে লাগিল ও “আমার হাতী গাঙ্গে নিল, গাঙ্গে নিল” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল! তখন যেন হাতী ক্রমেই ডুবিয়া যাইতেছে, মাহুতও হাতীর উপর দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে মাহুতের গলা পর্য্যন্ত তলাইয়া গেল। তখন হাতীর শরীরের আর কিছুমাত্র দেখা যায় না; কেবল শুঁড়ের ডগাটি জলের উপর নড়িতেছে ও তাহা দ্বারাই নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। এদিকে মাহুত চীৎকার করিতে করিতে যখন ডুবিয়া যায় যায় হইল, তখন আর হাতীর উপর থাকিতে না পারিয়া, জলে সাতার দিয়া পার হইয়া আসিল। হাতীটীও সঙ্গে সঙ্গে তলাইয়া গিয়া জলের নীচে ক্রমাগত ২।৩ মিনিট ‘ভুরভুরি’ কাটিয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল। বুঝিলাম সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

অন্যান্য মাহুতগণ এই দৃশ্য দেখিয়া, কেহ কেহ তাড়াতাড়ি পার হইয়া গেল, কেহ কেহ বা ফিরিয়া আসিল। আমরা সকলেই পারে দাঁড়াইয়া ‘চেঁচামেচি’ ও হা-হুতাশ করিতে লাগিলাম। ইহা ছাড়া আর উপায়ই বা কি? এত বড় প্রকাণ্ড একটা হাতী যে নিমেষের মধ্যে স্রোতহীন ডোবায় এই ভাবে সিকি দু-আনীর মত ডুবিয়া যাইতে পারে, এইরূপ দৃশ্য দেখা দূরে থাক, কোন দিন কল্পনাও

করিতে পারি নাই। পূর্ব্বে কোন কোন সিলেটী মাহুতের নিকট 'গাঙ্গে হাতী নেয়' এইরূপ গল্প শুনিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা কোনদিন বিশ্বাস করি নাই। এইবার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে একবার আমাদের 'নয়তারা' নাম্নী একটী কুন্‌কী হাতী, পায়ে 'বাণ্ডা ভরা' (জোড়ন দেওয়া) থাকা সত্ত্বেও, পোড়াবাড়ী ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী কোন চর হইতে ছুটিয়া বর্ষার বিস্তীর্ণ তরঙ্গান্দোলিত খরস্রোতা যমুনা নদী উজান বহিয়া সাঁতরাইয়া, সুবর্ণ-খালি আসিয়াছিল। সেদিনও মহারাজ ৺শশীকান্তের 'ইবি' নাম্নী হস্তিনী, ঐরূপ 'বাণ্ডা বাঁধা' অবস্থায় বর্ষার সুপ্রশস্ত মেঘনা নদ সাতরাইয়া আশুগঞ্জ হইতে ভৈরব আসিয়াছিল। অথচ এইরূপ পয়ঃপ্রণালী সদৃশ নদীতে এই প্রকার অসম্ভব ঘটনা চক্ষের সম্মুখে ঘটিয়া গেল। ইহাতেই মনে হয়, হাতীটীর সাতার দেওয়ার সময়, পায়ে কোনরূপ ক্র্যাম্প বা অন্য কোনরূপ ব্যারাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেই বেচারী আর উঠিতে পারে নাই। মাহুতগণ কিন্তু তাহা বিশ্বাস করে নাই। তাহাদের ধারণা "দেও" বা "ভূতে" উহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

এই দুর্ঘটনার পর, সেদিন আর আমাদের শিকার হইল না, সকলেই বিমর্ষ-চিত্তে ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন লোক পাঠাইয়া দেখা গেল, হাতীটী ডোবার কিছু ভাটিতে ফুলিয়া ভাসিতেছে।

এইরূপ আর একবার রাজা জগৎকিশোরের প্রায় ১১॥০ ফিট্ ঐরাবৎ সদৃশ বিশালকায় 'ভোলানাথ' নামক বড় আদরের মাকনা, জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা দিতে ঢাকার পথে 'কাওরাইদের' নিকটবর্ত্তী রক্তি নদী অপেক্ষাও, একটী ছোট খালে ঠিক ঐরূপেই ডুবিয়া গিয়াছিল। অথচ এই সব নদী 'নালা, গো মহিষ ত দূরের কথা, ছাগল ভেড়া পর্য্যন্ত অনায়াসে সাঁতরাইয়া পার হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত "হাতীডুবি" যদি স্বচক্ষে না দেখিতাম, তবে ভোলানাথের এই কাহিনী শুনিয়া নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতাম না।

এখন আবার বাঘের কথা বলি ঃ—

সব বাঘের স্বভাব, সকল সময় সমান দেখা যায় না। কোন কোন বাঘ জঙ্গলে হাতী ঢুকিলেই দূর হইতে শব্দ পাইয়া পলাইবার পথ দেখে; কোনটা আবার প্রাণান্ত পর্য্যন্ত যুঝিয়াও, জঙ্গল ত্যাগ করে না। যে সব বাঘ পূর্ব্বে তাড়া পাইয়াছে, তাহারাই খুব চালাক ও ফন্দীবাজ হয়। কোন দুই জঙ্গলের মধ্যে মাঠ বা নদী থাকিলে, জঙ্গলে পা দিতে না দিতেই, তাহারা নিঃশব্দে হঠাৎ মাঠে বাহির হইয়া অথবা নদী সাঁতরাইয়া পলাইয়া যায়। বাঘিনীর সঙ্গে বাচ্ছা থাকিলে, তাহারা বাচ্ছার মায়ায় জঙ্গল ত্যাগ করে না; কিন্তু পূর্ব্বে তাড়া-পাওয়া বাঘিনী, অনেক সময় বাচ্ছার মায়া কিছুমাত্র না করিয়া, উহাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কখন কখন আবার যে দিক দিয়া পলাইবার কোন সম্ভাবনা নাই মনে করিয়া সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় না, ইহারা সেই দিক দিয়াই শিকারীকে ফাঁকি দেয়। নদী পার হইবার সময় ইহারা খুব জোরে সাঁতরাইয়া পার হইয়া যায়। খুব স্রোতের মধ্যেও ইহারা জোরে সাঁতার দিতে পারে। সাঁতরাইবার সময় ইহাদের কেবল মাথাটিই দেখা যায়।

সাধারণতঃ প্রায় সকল বাঘই, প্রথমে পলাইবার চেষ্টা করিয়া, পরে আহত হইলে 'চার্জ্জ' করে। কিন্তু কতকগুলি এরূপ ভীরু প্রকৃতির হয় যে, সাংঘাতিক আহত হইয়াও, ক্রমাগত পলাইবার চেষ্টা করে। আবার কোন কোন বাঘের স্বভাব ইহার বিপরীত, জঙ্গলে ঢুকিতে না ঢুকিতেই তাহারা ক্রমাগত 'চার্জ্জ' করিতে আরম্ভ করে। এই সঙ্কল্প যেন তাহারা পূর্ব্ব হইতে ঠিক করিয়াই রাখে। একবার শিলেটের "শৈধার গাঁও" নামক স্থানে এইরূপ এক বাঘের পাল্লায় পড়িয়া আমরা বড়ই 'নাকাল' হইয়াছিলাম। জঙ্গলে ঢুকিতে

না ঢুকিতেই ক্রমাগত ১২।১৩টী হাতীকে 'চার্জ্জ' ও জখম করিবার পর অগত্যা তাহার নিকট অপদস্থ হইয়াই ফিরিতে হইয়াছিল।

অনেকের ধারণা, বাঘে চার্জ্জ করিয়া তাহাদের হাতী না ধরিলে, বুঝি বড় শিকারী হওয়া যায় না। খুব ভাল হাতী না হইলে, 'চার্জ্জ' করিয়া হাতীকে "ঘাল" করিবার সময়, কাহারও গুলি করা সম্ভবপর নহে। হাতীর ঝাকানিতে, তাহার তখন হাওদার শিক ধরিয়া কোনরূপে নিজেকে রক্ষা করিতেই বিব্রত থাকিতে হয়, তখন আর আক্রমণকারীর প্রতিরোধ করিবার সুযোগ থাকে না। তবে খুব শিক্ষিত হাতী হইলে স্বতন্ত্র কথা। এরূপ অবস্থায় অনেক সময়েই হাতীর ঝাকানিতে বাঘ পড়িয়া যায়, কোন কোন সময় সুবিধা হইলে, অপর শিকারী কর্ত্তৃক নিহতও হয়।

বাঘের চার্জ্জ-এর সময়েই তাহাকে মারা সুবিধা। চার্জ্জ-এর মুখে যদি উহাকে গুলি করিয়া ফিরান না যায়, তবে হয় হাতীর পা কামড়াইয়া ধরিবে, অথবা হাতীর উপর লাফাইয়া উঠিবে। একটু দূর হইতে চার্জ্জ করিলে, আরও নিকটে না আসিলে, গুলি লাগিবে না মনে করিয়া, গুলি না করা অত্যন্ত ভুল। অনেক সময় গুলি না লাগিলেও বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই, গুলির আঘাতে উহার সম্মুখের ধুলা মাটি উড়িতে ও বন্দুকের ধোঁয়া দেখিয়া ফিরিয়া যায়। কোন কারণে রাইফেল আওয়াজ করিয়া আবার গুলি ভরিবার অবসর না পাওয়া গেলে, হাওদায় ছর্‌রার বন্দুক থাকিলে তাহাই আওয়াজ করা উচিত। তখন বাঘকে ফিরাইয়া দেওয়াই কাজ। আমাকে বাঘে একবার এইরূপ একটু দূর হইতে চার্জ্জ করিলে, খুব কাছে আসিলে নিশ্চিত মারিতে পারিব মনে করিয়া আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম। বাঘ আর একটু নিকটে আসুক মনে করিতে করিতে হঠাৎ যেন অদৃশ্য হইয়া গেল। সম্মুখে একটি নালা ছিল, বাঘ সেই নালাতে নামিয়া পড়ায়, আমি আর দেখিতে

পাই নাই, কিন্তু যখন নালা হইতে উঠিল, দেখা গেল আমার হাতীর পা কামড়াইয়া ধরিয়াছে। আমার হাতী দাঁড়াইয়াছিল বটে, কিন্তু পা ঝাড়িতেছিল। বাঘটিকে মারিতে আমাকে একটুও বেগ পাইতে হয় নাই। যদি আমি উহাকে চার্জ্জ-এর সময় দূর হইতেই মারিতাম তাহা হইলে বোধ হয় উহাকে নিকটেই আসিতে হইত না। উহা আমার নির্ব্বুদ্ধিতারই ফল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, অন্যান্য শিকারের মত হাওদা শিকারে 'বেট' না বাঁধিলে, অর্দ্ধেক শিকারও হয় না। 'বেঁট' বাঁধিলে, অনেক সময় উহাকে মারিয়া, জঙ্গল একটু পাতলা হইলে, টানিয়া অনেক দূরেও লইয়া যায়। কিন্তু নিকটে ঘন আবরণ থাকিলে, অধিকাংশ সময়ই তাহাতে লইয়া রাখে; তখন আর দূরে যায় না। কিন্তু আবার নিকটে কি দূরে, যদি সুবিধা মত জঙ্গল না থাকে, তবে রাত্রেই যতদূর পারে খাইয়া চলিয়া যায়। কাজেই 'বেট' বাঁধিবার স্থান নির্ব্বাচন, একটু দক্ষতার কায। কোন বহুদূর বিস্তৃত ঘন জঙ্গলে বা একেবারেই ফাঁকা জঙ্গলে, কি কোন 'দাব' জঙ্গলের নিকটে 'বেট' বাঁধা বিধেয় নয়। তাহার ফল অনেক সময়েই নৈরাশ্যজনক হইয়া থাকে। 'বেট' বন্ধনকারীদের ইহা লক্ষ্য রাখা উচিত যে, মরি করিলে উহা এমন যায়গায় লইয়া না যাইতে পারে, যেখানে উহাকে পাওয়া অসম্ভব। বহুবার এইরূপ আনাড়ির হাতে কার্য্যভার দিয়া ঠকিতে হইয়াছে। আমাদের দেশে গ্রাম্য কথায় 'পিঁয়াজ পঁয়জার' যাহাকে বলে, আমাদেরও তাহাই হইয়াছে।

খুব ভাল জঙ্গলে ও সদা সর্ব্বদা চলাচলের স্থান দেখিয়া 'বেট' বাঁধিলেও কোন কোন সময় উহার আশ পাশ দিয়া বাঘকে ঘুরা ফিরা করিতে দেখা যায়, কিন্তু 'বেটের' দিকে কোন লোভ করে না। দুই একবার এমনও দেখিয়াছি যে 'বেটের' চতুর্দ্দিকেই সমস্তরাত্রি ব্যাঘ্রদম্পতী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। এক একবার কোন কোন স্থানে,

উহাদের বসিবার ও মাটীতে গড়াগড়ি দিবার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। উহাদের এই ব্যবহারকে আমরা কি বলিতে পারি? এই সব মাংসাশী, শিকারী পশুর পক্ষে, অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা, ডাক্তারের পক্ষে সম্ভব হইলেও আমি ইহার অন্য কারণই অনুমান করি। আমার মনে হয় এই 'বেট' বাঁধার মধ্যে এমন কিছু অস্বাভাবিকত্ব ছিল, যাহা আমাদের চক্ষে না পড়িলেও উহারা অনারাসে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এখানে লোভ করিলেই বিপদে পড়িতে হইবে।

• আবার এমনও দেখা গিয়াছে, খুব ভাল জঙ্গলে 'বেট' বাধিলেও, তাহাকে মারিয়া স্পর্শমাত্র না করিয়া একেবারেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! কখনও বা 'মরি' করিয়া অল্প একটু খাইয়াই চলিয়া গিয়াছে, দিনে আর তাহাকে সেই জঙ্গলেই পাওয়া যায় নাই। প্রতি রাত্রেই আসিয়া একটু একটু করিয়া পচা মাংসের সদ্ব্যবহার করিয়া যায়। ইহাদের এই সব ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, পূর্ব্বে পূর্ব্বেও ইহারা এইরূপ মরি করিয়া শিকারী কর্ত্তৃক "তাড়া" খাইয়া-ছিল, কাযেই এখন সতর্ক হইয়াছে।

একবার আশ্চর্য্য রকমে, একটী 'মরি' করা দেখিয়াছিলাম। কোন জঙ্গলে, একটী প্রাপ্তবয়স্ক ঘোটক শাবককে 'বেট' বাঁধা হইয়া-ছিল। স্থানটী আমাদের তাঁবু হইতে ৪।৫ মাইল দূরে হইবে। আমাদিগকে প্রাতে একটী লোক আসিয়া সংবাদ দিল, ঘোড়াকে বাঘে জখম করিয়াছে কিন্তু উহা একেবারে মরে নাই। আমরা এই সংবাদ পাইয়া গিয়া দেখিলাম, ঘোড়াটী পড়িয়া আছে, নড়িবার শক্তি নাই। ঘাড়ে বাঘের দাঁতের চিহ্নও দেখিলাম; বোধ হয় ঘাড়ের হাড় ভগ্ন বা কণ্ঠনালী একেবারে ছিন্ন হয় নাই। আমরা নিকটবর্ত্তী সমুদয় জঙ্গল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া, ব্যাঘ্রের সন্ধান না পাইয়া তাঁবুতে ফিরিবার সময়, একজন খুঁজিকে অতঃপর এই 'মরি' পুনঃ

আসিয়া খায় কি না, তাহা অনুসন্ধান করিতে রাখিয়া গেলাম। পর-দিন প্রাতে সংবাদ পাইলাম যে, 'মরি'টীকে স্থানান্তরিত করিয়াছে। আমরা পুনরায় গিয়া দেখিলাম, ঘোড়াটীকে পূর্ব্বস্থান হইতে ১০।১৫ হাত দূরে সরাইয়া নিয়াছে এবং উহার পিছনের একটা ঠ্যাং ছিঁড়িয়া নিয়াছে। সেই পা-খানা, আরও ১০।১৫ হাত দূরে একটা ঝোপের মধ্যে পড়িয়া আছে। পা খানা টানিয়া কি কামড়াইয়া ছিঁড়িয়াছে, তাহা ঠিক করা গেল না। ঘোড়াটা কিন্তু তখনও মরে নাই, হত-ভাগ্যের কি কঠিন প্রাণ! আমার হাতীর দারোগা আশ্রব আলী উহার কষ্টের অবসান করিয়া দিয়াছিল। আমি জীবনে এরূপ ঘটনা আর কখনও দেখি নাই; এই জাতীয় বীভৎস দৃশ্য দেখিতেও ইচ্ছা করি না।

ব্যাঘ্রাদির এই সমস্ত চরিত্র বৈচিত্র্য লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহারা অমুক কায করিতে পারে, বা অমুক কায করিতে পারে না, এই সব কথা মনে করিয়া, শিকারীদের কোন উপেক্ষার ভাব মনে আনা উচিত নয়।

ঘুপি শিকার

'ঘুপি' শিকার সচরাচর আমাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীর শিকারী-রাই করিয়া থাকে। যাহাদের সর্ব্বদা হাতী চড়িয়া শিকার করিবার সুবিধা নাই, অথচ বনের নিকটেই বাড়ী, তাহারাই ঘুপি শিকার করে।

রাত্রে যে সব স্থানে হরিণ চরিবার জন্য বাহির হয়, দিনে তাহার নিকটবর্ত্তী সুবিধামত স্থানে, ঘুপি প্রস্তুত করিতে হয়। বনের কোন কোন ঝোপের বহিরাবরণ সম্পূর্ণ ঠিক রাখিয়া, ভিতরে দুই একজন বসিবার মত স্থান পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। ইহাতে বাহির

হইতে কোন জানোয়ার, উহার ভিতরকার শিকারীদের অস্তিত্ব একেবারেই বুঝিতে পারে না।

সন্ধ্যার পর হইতেই, এই সব ঘুপিতে এক কি দুইজন শিকারী যাইয়া বসিয়া থাকে। ঘুপির মধ্যে তামাক ইত্যাদি খাওয়া বা 'কাণাকাণি' করিয়া বেশী কথাবার্ত্তা বলাও উচিত নয়। জ্যোৎস্না রাত্রি ছাড়া এ প্রণালীতে শিকার করা চলে না। খুব পরিষ্কার জ্যোৎস্না না হইলে শিকার ভালরূপ দেখা যায় না; যেন কালো একটা ঢিপির মত মনে হয়।

এই সব ঘুপির নিকটে কোন্ সময় শিকার আসিবে ঠিক নাই, কাযেই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অনেক সময় সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি মশকদংশনের সুখ উপভোগ করিয়া বিফল হইয়াও বাড়ী ফিরিতে হয়। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে, কোন কোন স্থানে আবার সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই হরিণ বাহির হইয়া আইসে, কখনও বা শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত হরিণের অপেক্ষায় থাকিতে হয়। খুব চুপ করিয়া থাকিলে ইহারা চরিতে চরিতে এত নিকটে আইসে যে, প্রায় বন্দুকের নল গায়ে ঠেকাইয়া মারা যায়। দূর হইতে দেখা গেলে তাড়াতাড়ি করিয়া মারা ঠিক্ নয়, খুব নিকটে নিশ্চিতের মধ্যে আসিলে মারা উচিত। একে রাত্রে ইহাদিগকে কালো ঢিপির মত দেখায়, তারপর আবার এক চক্ষু বুজিয়া রীতিমত নিশানা করিয়া মারিলে অনেক সময়ই গুলি 'মিস্' হয়, এই সব কারণে দূর হইতে মারা ঠিক নয়, বরং দুই চোখ চাহিয়া বন্দুক সোজা করিয়া মারিলে গুলি ঠিক্ লাগে। আমি প্রথম প্রথম এক চক্ষু বুজিয়া কয়েকদিন ঠকিয়াছি, পরে স্থানীয় আমজাদ আলী মুন্সী নামক একজন খুঁজি ও শিকারী, আমাকে এই কৌশলটী শিখাইয়া দেয়। তাহার পর হইতে আমি এই উপায়ে খুব ভাল ফল পাইয়াছি।

গারো পাহাড়ের নীচে ও সিলেটে সচরাচর যে সব স্থানে আমরা

শিকার করিয়া থাকি, উহাতে গাছ বড় কম, কাযেই অধিকাংশ স্থানে মাটীতে ঘুপি করিয়া শিকার করিতে হয়; কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে গাছড়া জঙ্গলে মাচা তৈয়ারী করিয়া শিকার করাই সুবিধা।

আজকাল রাত্রে শিকার করিবার জন্য, বন্দুকের মাছিতে রেডিয়ম প্রভৃতি লাগাইয়া, নানারকম 'নাইট সাইট' করা হইয়াছে, পূর্ব্বে এ সব ছিল না। আমি কোন কোন সময় বন্দুকের মাছিতে চুণের ফোটা দিয়া, কখনও বা আটা দিয়া জোনাকী পোকা লাগাইয়া 'নাইট সাইট' করিয়া লইয়াছি, ইহাতেও বেশ কায হয়। জ্যোৎস্না রাত্রে রেডিয়ম অপেক্ষা জোনাকী পোকায় ভাল দেখা যায়। পূর্ব্বে যখন আমার বঁড়শী শিকারের বড় বাতিক ছিল, তখন বঁড়শীর 'ফাৎনার' উপর জোনাকী পোকা লাগাইয়া রাত্রে মাছ ধরিয়াছি।

অনেকদিন আমি একজন মাত্র লোক সঙ্গে লইয়া রাত্রির পর রাত্রি ঘুপিতে কাটাইয়া, শিকার করিয়াছি; তবে অধিকাংশ সময়েই বিফল হইতে হইয়াছে।

অনেক দিনই গভীর রাত্রে ঘুপিতে বসিয়া এক অনির্ব্বচনীয় বিরাট্ ভাব উপলব্ধি করিতাম। দিগন্ত বিস্তৃত অরণ্যে যখন কেবল নৈশ-বায়ু-সঞ্চালিত বৃক্ষপত্রের সন্ সন্ শব্দ ব্যতীত ক্বচিৎ নিশাচর পক্ষীদিগের বিকট কর্কশ রব ও দূর গ্রাম্য কুক্কুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ স্তব্ধ প্রকৃতিকে আলোড়িত করিয়া তুলিত, তখন অরণ্যানীর বিশালতা উপলব্ধি করিয়া পরম কারুণিক জগৎপিতার রচনা কৌশলে চক্ষু আপনা আপনি সজল হইয়া উঠিত। বনচারী পশুদের জন্যও তিনি সমস্তই অপূর্ব্ব কৌশলে যেখানে যেটী দরকার, পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেনঃ—

"এই বিশ্বমাঝে, যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি, সাজায়ে রেখেছ।"

অনেক সময় ঘুপিতে হরিণের উদ্দেশে বসিয়া থাকিলেও, বাঘ

কি মহিষ আসিয়াও উপস্থিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহিষগুলি বাঘ অপেক্ষা হিংস্র ; ইহারা বনে মানুষের গন্ধ পাইলেই, মাথা উচু করিয়া শুঁকিতে শুঁকিতে আন্দাজে আন্দাজে সেই দিকে আসিতে থাকে। সেই সময় উপযুক্ত অস্ত্রের অভাব ঘটিলে বিপদ অনিবার্য্য। এইরূপ বিশালকায় কোপন-স্বভাব পশুকে, বিশেষতঃ রাত্রে বিপদের সময় প্রতিরোধ করা অত্যন্ত কঠিন।

একবার গারো হিলের নীচে মহিষখোলার নিকটবর্ত্তী গোলাপ-পুরের জঙ্গলে একজন স্থানীয় মুসলমান শিকারী, এইরূপে একটী মহিষ কর্ত্তৃক অতি শোচনীয় ভাবে নিহত হইয়াছিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই, আমরা তথায় শিকার করিতে গিয়া একপাল মহিষ পাইয়া, একদিনে ৫।৬টা শিকার করিয়াছিলাম। এই প্রসঙ্গে একটী হাস্যকর গল্প বলিতেছি ;—

আমাদের শিকার পার্টিতে এ পর্য্যন্ত বহুস্থানে বহু মহিষ শিকার করা হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ ঘটনা আর কখনও ঘটে নাই। আমাদের ময়মনসিংহ জেলার ভাঁটি অঞ্চলে ও শ্রীহট্টে, মুসলমানদিগের মহিষ খাওয়ার লোভ এত প্রবল যে, উহারা মহিষ পাইলে যেন আর কিছুই চাহে না। আমরা কোন স্থানে মহিষ শিকার করিলেই ইহারা দলে দলে, জঙ্গল যতই দুর্গম হউক না কেন, প্রত্যেকে এক একটী বড় বারছুঁচ বা লোহার কাঁটা ও একগাছি সরু গুণ এবং এক এক-খানা বড় ছুরি হস্তে আসিয়া হাজির হইবেই। মহিষ মারা পড়িলেই একদিকে যেমন উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন উড়িতে থাকে, তেমনি নীচেও দলে দলে ইহারা মৃত মহিষের চামড়া খুলিয়া ছুরি দ্বারা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া মাংস কাটিয়া, ঐ বড় বড় ছুঁচ দিয়া ফুড়িয়া, গুণের মধ্যে মালা গাঁথার মত গাঁথিতে থাকে। তখন শকুনের সাধ্য কি যে, এই সব নরশকুনের ত্রিসীমানায় ঘেঁসে। উহারা চলিয়া গেলে উহাদের পরিত্যক্ত যে নাড়ীভুঁড়িগুলি থাকে, তাহা খাইয়াই শকুন

বেচারাদের পরিতুষ্ট হইতে হয়। কিন্তু ইহার পর আবার গারো আসিয়া জুটিলে, নাড়ীভুঁড়ি গুলি পর্য্যন্তও উহাদের পক্ষে দুর্ল্লভ হইয়া উঠে। ইহারা মাংস লইয়া যেরূপ মারামারি কাটাকাটি করে, শকুনের পক্ষেও তাহা অসাধ্য। অনেক সময় দুই দল হইয়া লাঠালাঠি মারামারি করিয়া জখম পর্য্যন্ত হয়; ইহাই ইহাদের চিরন্তন প্রথা। ঐ দৃশ্য যে স্বচক্ষে না দেখিয়াছে তাহার উপলব্ধি করিবার সাধ্য নাই।

সেদিনকার শিকারে, ৫।৬টী মহিষ মারা হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বয়ার (মদ্দা) এবং অন্যগুলি কাকিনী (মাদি) ছিল। এদিনও যখন ইহারা পূর্ব্বোক্তরূপে ছুরি চালাইয়া মাংসের টুকরাগুলি গুণে গাঁথিতেছিল, তখন আমরা মহিষের কর্ত্তিত মস্তক-গুলি হাতীতে তুলিবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম। হঠাৎ 'মাংস চুরি করে, মাংস চুরি করে' বলিয়া একটা সোর গোল উঠিল। বাস্তবিকই দেখা গেল যে, একজনের গুণে গাঁথা মাংস, অপর একজন চুরি করিয়া তাহার গুণ পূর্ণ করিতেছে। যাহার মাংস চুরি হইতেছিল, সে নিমেষের মধ্যে ঘুরিয়া চোরের ডান কাণ ধরিয়া ছুরির একটানেই আমূল ছেদন করিয়া ফেলিল। আমরা ত একেবারে অবাক্! এত শীঘ্র এই ঘটনা ঘটিল যে, কাহারও প্রতিরোধ করা দূরে থাকুক, কথাটী বলারও অবসর হইল না। ইহার পরই উহারা দুই দল হইয়া, বিষম দাঙ্গা হাঙ্গামার সূচনা করিয়া তুলিল। তখন আমরা নানা প্রকার ভয় দেখাইয়া দুই দলকে পৃথক করিয়া দিলাম। কাণকাটা বেচারার পক্ষে "লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং" প্রবাদটী ফলিয়া গেল।

ইহার পর হইতে, আর আমরা ইহাদিগকে মহিষ ছুলিতে দিতাম না। আমরা মাথা ও চামড়া নিয়া আসিলে পর যাহা হয় হইত। ঘুপি শিকার প্রসঙ্গে আমাদের হাওদা শিকার উপলক্ষে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার গল্পটী বলিলাম। এখন ঘুপিতে বসিয়া, আমি যেরূপে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম, তাহা লিখিতেছি।

হাতী খেদা উপলক্ষে একবার আগরতলার পাহাড়ে আমি কিছুদিন অবস্থান করি। একদিন পাহাড়ের উপর কোন একটী 'খলা'তে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে প্রায়ই হরিণ চরিতে আইসে জানিতে পারিয়া, ঐ খলার নিকটে একটি ঘুপি প্রস্তুত করিয়া বসি। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বেই, আমাদের সম্মুখে বনের অপর দিক হইতে যেন অতি গম্ভীর ভাবে রাজকীয় চরণবিন্যাসে, বনাধিপতি এক বৃহৎ ব্যাঘ্র সস্ত্রীক আসিয়া আমাদিগের নিকট হইতে ২।২॥ শত গজ দূরে বেশ আরাম করিয়া বসিল। আমার সঙ্গে একটি মাত্র ছর্‌রার বন্দুক ও কয়েকটি Buck shot cartridge এবং দুইটি মাত্র গুলি ছিল। ছোট হরিণের খবরে আসিয়াছিলাম বলিয়াই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, কিন্তু পরে এ জন্য যথেষ্ট অনুশোচনা করিতে হইয়াছিল।

ব্যাঘ্র দম্পতীর স্বাধীনভাবে বিচরণ ও ক্রিয়াকলাপে এত অভিভূত হইয়াছিলাম যে, আমার কেবলই মনে হইতেছিল, একটী 'কোডাক্' ক্যামেরা সঙ্গে থাকিলে এই প্রণয়ী যুগলের স্বাভাবিক অবস্থার ছবিখানি তুলিতে পারিতাম। অবশেষে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়া হাতী আনাইয়া তবে ক্যাম্পে ফিরিয়া যাই।

এই ক্যাম্প হইতেই, আর একদিন অন্য এক পাহাড়ে, এক আমড়া গাছের নীচে প্রায়ই আমড়া খাইতে হরিণ আইসে খবর পাইয়া, নিকটস্থ একটী প্রকাণ্ড উই ঢিপির উপর আমরা বসি। বলা বাহুল্য, গাছের ডালপালা কাটিয়া উহার চতুর্দ্দিকে আড়াল করিয়া কৃত্রিম বন করিয়া লইয়াছিলাম। তখনও পশ্চিমাকাশে অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রক্তিমচ্ছটা মিলিয়া যায় নাই, বন্য কুক্কুটের দল গাছের নীচে নীচে পাহাড়ের গায়ে ছুটাছুটি করিতেছে। হঠাৎ একটী ছোট হরিণকে আমাদের সম্মুখ দিয়া চকিতের মধ্যে দৌড়াইয়া যাইতে দেখিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই বনস্থলী কম্পিত করিয়া বামদিকে ভীষণ

গর্জ্জন উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ইহার প্রতিধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতেই, দক্ষিণ দিক হইতে আর একটি গম্ভীর ধ্বনি দ্বারা ইহার প্রত্যুত্তর শোনা গেল। তখন আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম যে, ব্যাঘ্রদম্পতী আমাদের উভয় দিক হইতে পরস্পরকে প্রণয় সম্ভাষণ করিতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গভীর অন্ধকারে বনস্থলী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, ব্যাপারও ক্রমেই যেন গুরুতর হইতে চলিল। এক একবার দুই দিক হইতে দুইটি বাঘই ডাকিতে ডাকিতে প্রায় আমাদের উই ঢিপির নিকট আসিয়া, আবার দূরে চলিয়া যায়। আবার আসে, আবার যায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর্য্যন্ত, এই অভিনয় চলিতে লাগিল। তখনও কিন্তু জ্যোৎস্না উঠিবার বিলম্ব ছিল। যাহা হউক, একবার যখন বুঝিলাম উহারা দূরে সরিয়া গিয়াছে, তখনই আমরা তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া, পাহাড়ের নীচেই হাতী ছিল, তাহাতে উঠিয়া প্রস্থান করিলাম।

ঘুপিতে ছোট শিকারের উদ্দেশ্যে গেলেও, যে কোন বিপদ উপস্থিত হইতে পারে মনে করিয়া, প্রস্তুত হইয়া যাওয়া উচিত।

হাঁটাশিকার

যাঁহারা হাটিয়া শিকার করেন, তাঁহাদের হাওদা-শিকারী অপেক্ষা ধৈর্য্যশীল ও কষ্টসহিষ্ণু হওয়া দরকার। হাওদা শিকারে অনেক সময় নিস্ফল হইলেও সফলতার সংখ্যাই অধিক; কিন্তু ইহাতে তাহার বিপরীত। হাঁটা শিকারীকে, পাহাড়ে বা সমতল ভূমির যে জঙ্গলেই শিকার করিতে হয়, খুব নিরাপদ অথচ জানোয়ার আসিবার সম্ভাবনা আছে, এইরূপ স্থান নির্ব্বাচন করিয়া বৃক্ষ বা প্রস্তরের অন্তরালে চুপ করিয়া দাঁড়াইতে হয়। বন বা পাহাড়ের অপর দিক হইতে কুলী দ্বারা হাঁকোয়া (drive) করিতে হয়।

অপর দিক হইতে তাড়া পাইয়া জানোয়ার প্রায়ই শিকারীর দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়; কোন কোন সময় জঙ্গল একটু পাত্‌লা হইলে দৌড়াইয়াও আইসে। সেই সময় খুব ধৈর্য্য সহকারে গুলি করিলে প্রায়ই লক্ষ্য ব্যর্থ হয় না ও একাধিক গুলিরও বড় প্রয়োজন হয় না।

স্থান নির্ব্বাচনের দোষে, শিকারীকে অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। জানোয়ার বাহির হইয়াই যদি শিকারীকে দেখিতে পায়, এরূপ স্থানে বসিলে বিপদের সম্ভাবনাই অনেক সময় থাকে। কিন্তু কোন কোন সময় জঙ্গলের অবস্থানুসারে এইরূপ না করিয়াও উপায় নাই; কাযেই শিকার করিতে ইচ্ছা হইলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই দায়িত্ব তাঁহাদের নিতেই হইবে। কিন্তু সর্ব্বত্র এই অবস্থা ঘটে না। যাঁহারা নূতন শিকারী, তাঁহাদের এইরূপ ব্যবস্থা এড়াইয়া চলাই ভাল।

জানোয়ার চলিয়া যাইবার পাশে (sideএ) স্থান নির্ব্বাচন করাই কর্ত্তব্য। এই জাতীয় শিকারে ২।৪ হাতের মধ্যেও জানোয়ার দেখা যাইতে পারে, ইহা মনে করিয়া প্রস্তুত হইয়া যাওয়াই উচিত। যাহাদের মনে এ সাহস নাই, তাহাদের এ ভাবে শিকার করিতে যাওয়াই মূর্খতা। হাঁটা শিকারীদের একটু উপস্থিত বুদ্ধি থাকাও দরকার, হঠাৎ কোন সময় বিপদগ্রস্ত হইয়া উত্তেজিত বা 'নার্ভাস' হইয়া পড়িলে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে।

স্থান নির্ব্বাচনের দোষে আমি একবার অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম। ২৪ পরগণার শ্রীনগর নামক স্থানে, আমি ও স্বর্গীয় মনুবাবু একবার শিকার করিতে যাইয়া, দুইজন দুই স্থানে বসিয়া হাতী ও লোক দিয়া জঙ্গল drive করাইতেছিলাম। আমি একটা শুক্‌না পুকুরের মধ্যে, ফাঁকা স্থানে বসিয়াছিলাম। পুকুরের পাড়ে drive করান হইতেছিল, হঠাৎ এক প্রকাণ্ড চিতাবাঘ বাহির

হইয়া, আমাকে ফাঁকায় দেখিয়াই একেবারে চার্জ্জ করিয়া, আমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। এত তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়িল যে, আমি অতি কষ্টে এক গুলিতেই উহাকে হীনবীর্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমার সম্মুখে তিন হাতের মধ্যে আসিয়া পড়িলে, আমি উহাকে আঘাত (hit) করি; কিন্তু দৌড়ের (charge) ঝোঁকে সে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়ে, আমিও ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া উল্টাইয়া পড়িয়া যাই। উহার বুক হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত বাহির হইতেছিল; আমারও বুট ও প্যাণ্ট ইত্যাদি রক্তে ভিজিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, তাড়াতাড়ি উঠিয়াই বন্দুকের দ্বিতীয় নলের সদ্ব্যবহার করি,—কিন্তু তাহার দরকার ছিল না। যদি আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইত বা 'মিস্‌ফায়ার' হইত, তাহা হইলে হয়ত আজ আমার এখানে বসিয়া গল্প লেখার অবসর হইত না।

এইরূপ হাঁটিয়া শিকারের আর এক রকম নূতন পদ্ধতি কৃষ্ণনগর, সোনাডাঙ্গা, মুড়াগাছা প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিয়াছি। ইহা আমার নিকট আরও সুবিধা ও আমোদজনক বলিয়া মনে হয়। ঐ সব স্থানের মধ্যবিত্ত সৌখীন শিকারিগণ, কেহ একটী কেহ বা ২।৩টী করিয়া কুকুর পোষেন। সাধারণতঃ 'টেরিয়ার' 'স্প্যানিয়েল' কুকুরই বেশী; দুই একটী 'বুল টেরিয়ার'ও দেখা যায়।

গ্রামের মধ্যে বা গ্রামান্তরে কোন বাঘের সংবাদ পাইলে ৪।৫টী, কখনও কখনও ৬।৭টী কুকুর লইয়া ২।৪ জন শিকারী যাইয়া জঙ্গলে কুকুর ছাড়িয়া দিয়া, নিজেরা জঙ্গলের অবস্থা বুঝিয়া, যে সব স্থান দিয়া বাঘ যাইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই সব স্থানে এক বা দুইজন করিয়া দাঁড়ান। কুকুরগুলিও একত্র শিকার করিতে অভ্যস্ত থাকায় আর নিজেরা নিজেরা ঝগড়া করে না। ছাড়িয়া দিলেই জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িয়া, যাহার যে দিকে ইচ্ছা শুঁকিতে শুঁকিতে যায়, বাঘ না পাইলে কতক্ষণ ঘোরাফেরা করিয়া বাহির হইয়া আসে।

যদি বাঘডাসা, গো-সাপ, শেয়াল কি অন্য কোন জন্তু দেখে, তবে ঘেউ ঘেউ করিয়া ২।১ বার ডাক দিয়াই ক্ষান্ত হয়; কিন্তু হঠাৎ বাঘ দেখিতে পাইলে ভয়ানক জোরে ডাকিতে আরম্ভ করে, সে ডাকের আর বিরাম নাই। একটা বা দুইটা কুকুর প্রথমে বাঘ খোঁজ করিলে পরে অবশিষ্টগুলিও যাইয়া উহার চারিদিক ঘিরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় বাঘ এত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে যে প্রায় নড়িবার শক্তি থাকে না। কোন গাছ বা ঝোপের দিকে পিছন করিয়া "কোণ ঠাসা" হইয়া বসিয়া সেও ক্রমাগত ডাকিতে থাকে। তখন বাঘের ও কুকুরের ডাক মিলিয়া এক বিকট ধ্বনি উত্থিত হয়। বাঘ এক একবার চার্জ্জ করিয়া, কোন কুকুরের দিকে ছুটিয়া যাইতেই, কুকুরটী দৌড় দেয়। অমনি পিছন দিক হইতে অন্য কুকুর গিয়া বাঘের পিছে ডাকিতে থাকে বা কামড়াইয়া ধরে। ইহাতে অগ্রগামী কুকুরকে ছাড়িয়া দিয়া, পিছনের দিকে ফিরিতেই, আবার আর একদিক হইতে আর একটি আসিয়া ঐরূপ ডাকিতে থাকে বা কামড়াইয়া ধরে। এইরূপ দুই চারিবার করার পরই বাঘ নিজকে অত্যন্ত বিব্রত মনে করিয়া, কোন গাছ বা ঝোপের আশ্রয় লইয়া, আবার 'কোণ ঠাসা' হইয়া বসিয়া ডাকিতে থাকে। অনেক সময় গাছে উঠিয়াও আত্মরক্ষা করে। তখন কুকুরগুলিও নীচে দাঁড়াইয়া, উপর দিকে তাকাইয়া ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে। কখনও কখনও বাঘ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ছুটিয়া বাহির হইয়া, আর এক জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় লয়, কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই; কুকুর পাছে লাগিয়া আছেই। কোন কোন সময় চার্জ্জ করিয়া, ২।১টা কুকুরকে ধরিয়া জখম করিয়াও দেয়। কিন্তু অন্য কুকুরগুলি তাহাতে ভীত না হইয়া, সমভাবেই পূর্ব্ববৎ বিরক্ত করিতে থাকে। আবার কখনও বা খপ্ করিয়া এক একটা কুকুর ধরিয়া, বুকের নীচে চাপিয়া রাখিয়া ডাকিতে থাকে। অন্য কুকুরের উৎপাতে,

যখন উহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়, তখন দেখা যায়, উহার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে নাই! মুক্ত হইবা মাত্রই আবার ক্ষুদ্র প্রাণী দলে মিশিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে। বাস্তবিক ছোট ছোট এই কুকুর গুলির সাহস দেখিয়া, আমি অবাক্ হইয়া যাইতাম।

এইরূপে বাঘ সন্ধান হইলে, শিকারীরা আসিয়া একটু দূরে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ফেলে। কোন কোন সময় কুকুরকে তাড়া না করিয়া, শিকারীকে চার্জ্জ করিয়া আইসে, তখন সেই চার্জ্জের মুখেই মারিতে হয়। কাযেই এই সব শিকারে, দুইজন করিয়া এক এক স্থানে থাকাই নিয়ম; হঠাৎ এক জনের গুলি মিস হইলে অপর জন যেন রক্ষা করিতে পারে। আমি ২।৪ বার এই প্রণালীতে শিকার করিয়াছি। হাঁটিয়া আত্মগোপন করিয়া শিকার করা অপেক্ষা ইহাতে অনেক বেশী সাহসের দরকার, আমোদও খুব বেশী। সৌভাগ্যক্রমে এই ভাবে আমি একবারও বিপদগ্রস্ত হই নাই। স্থানীয় ভদ্রলোক শিকারীদের মধ্যে ২।১ জনের শরীরে বাঘের জখমও দেখিয়াছি। একবার একটি বাঘ, কুকুরের উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া এক কুলগাছে উঠিয়া পড়িয়াছিল; সেই অবস্থাতেই আমরা উহাকে শিকার করিয়াছিলাম। কুকুর ও বাঘ যখন এক সঙ্গে গোল করিতে থাকে, তখন শিকার করা এক কঠিন ব্যাপার—বাঘ মারি কি কুকুর মারি। এই অবস্থায় কুকুরের গায়ে গুলি লাগিবার আশঙ্কা থাকে বলিয়া, খুব সাবধানে গুলি চালাইতে হয়।

কুকুরগুলিকে এইভাবে শিকারী করিয়া তুলিতে তাঁহাদের বিশেষ কিছু বেগ পাইতে হয় না। কয়েকবার জঙ্গলে লইয়া গেলে, নিজেরাই আপনা আপনি শিকারী হইয়া উঠে, নূতন কুকুরও পুরাতন কুকুরের সঙ্গে মিলিয়া, দুই একবারেই অভ্যস্ত হইয়া যায়। ইহাতে খরচও কম, আমোদও অত্যন্ত বেশী। চিতাবাঘ শিকারই আমি এই

প্রণালীতে দেখিয়াছি এবং মুড়াগাছা, সোনাডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে নিজেও করিয়াছি। অন্য শিকার এই উপায়ে করা যাইতে পারে কি না বলিতে পারি না। গ্রাম্য গাছড়া জঙ্গলে এই শ্রেণীর শিকার করা চলে, কিন্তু নল, খাগড় প্রভৃতি জঙ্গলে ইহা একেবারেই সম্ভবপর নয়। এই প্রণালীতে শিকার করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক, জানোয়ারের চার্জ্জের জন্য প্রস্তুত হইয়াই, তাঁহাদের এই কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে।

মাচা শিকার

সর্ব্বপ্রকার শিকারের মধ্যে 'মাচ'ায় বসিয়া শিকারই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ বলিয়া আমার বিশ্বাস। কোন স্থানে 'মরি'র (kill) খবর পাইলে, তাহার নিকটবর্ত্তী কোন সুবিধাজনক গাছে 'মাচা' বাঁধিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। 'মরি'র নিকট গাছ না থাকিলে মরিটাকে এক আধটুকু সরাইয়া, সুবিধাজনক স্থানে আনিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কোন কোন স্থানে বাঘের চলাফেরা আছে অথচ 'মরি' করিতেছে না, এরূপ অবস্থা হইলে 'মাচা' করিয়া 'বেট' বাঁধিয়া বসিতে হয়। নহবত খানার মত প্রকাণ্ড ও মজবুত করিয়া অস্বাভাবিক রকমের মাচা করিলে, তাহার কাছ দিয়াও কোন জানোয়ার ঘেঁসে না। ছোট করিয়া যতদূর সম্ভব, স্বাভাবিক রকমের 'মাচা' করা উচিত। অনেকে আত্মগোপনের জন্য 'মাচা'র সম্মুখে, কতকগুলি ডাল পালা দিয়া বেড়ার মত করিয়া আবরণ দেন; তাহার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। সম্মুখে অতি সাধারণ রকমের ২।১টা ডাল দিয়া আবরণ দিলেই চলিতে পারে।

জানোয়ারগুলি চলিবার সময় প্রায়ই উপরের দিকে তাকায় না;

ভারতের নীলগাই

সম্মুখে ও ডাইনে বাঁয়ে দেখিতে দেখিতে চলে। পিছনে তাড়া পাইলে খানিক আসিয়া আবার পিছনের দিকে তাকায়, আবার চলিতে থাকে।

'বেট' বাঁধিয়া 'মাচা' করিতে হইলে ভাল স্থান দেখিয়া, ৫।৭ কি ১০ দিন পূর্ব্বেই 'মাচা' করিয়া রাখা উচিত। ইহাতে পূর্ব্ব হইতেই জানোয়ারেরা উহা দেখিয়া অভ্যস্ত হইয়া যায়। আনাড়ি দ্বারা 'মাচা' বাঁধাইলে সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড হয়।

কুলি দিয়া পাহাড় বা জঙ্গল 'বীট' করাইয়াও 'মাচা'য় বসা যায়। খুব শান্ত হইয়া বসিয়া না থাকিতে পারিলে, মাচা শিকারের আশা বৃথা। আমাদের সঙ্গী কোন শিকারী, আমার সঙ্গে দুই একবার ভিন্ন মাচাতে বসিয়া কিছু পরেই অধীর হইয়া, হয় ছুরী দিয়া গাছের ডাল কাটিতেন কি মাথার পাগড়ী খুলিয়া তাহাতে কতকগুলি cartridge বাঁধিয়া মাচার উচ্চতা পরিমাপ করিতেন! ইহার ফল সহজেই অনুমেয়। কেহ বা মাচায় বসিয়া অন্য কোন সঙ্গী থাকিলে তাহার সঙ্গে যত দুনিয়ার গল্প ফাঁদিয়া বসিতেন। যাঁহাদের ২।৪ ঘণ্টা ধীরভাবে বসিয়া থাকিবার অভ্যাস নাই, তাঁহাদের মাচায় না বসাই ভাল।

অনেকের বিশ্বাস 'মাচা' খুব উচ্চ না হইলে, বিপদের আশঙ্কা অধিক; বাস্তবিক তাহা ভুল। সাধারণতঃ মাচা ১০ হইতে ১২ ফিট উচ্চ হইলেই যথেষ্ট। কোন কোন সময় মাচা হইতে, কোন শিকারকে এক গুলিতে রাখিতে না পারিলে, সে জখম হইয়া চলিয়া যায়; তখন শিকারীকে মাচা হইতে নামিয়া রক্তের দাগ ধরিয়া অনুসরণ করিতে হয়। ব্যাঘ্রাদি একে ভীষণ প্রকৃতির, তাহাতে আবার জখম হইলে ভীষণতর হইয়া উঠে; এই অবস্থায় খুব বিবেচনার সহিত উহাদের পশ্চাদ্ধাবন না করিলে বিপদ অনিবার্য্য। যাহারা পাহাড়ে জঙ্গলে হাটিতে অনভ্যস্ত, তাহাদের

পক্ষে এই ভাবে রক্তের দাগ ধরিয়া অনুসরণ করা অসম্ভব। জানোয়ারের পিছনে পিছনে হুড়মুড় করিয়া গেলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। অতি সন্তর্পণে চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে হয়। শিকারের 'ধ্যান' করিয়া যাইবার সময় পায়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিলে অনেক সময় পায়ের নীচে আল্‌গা পাথরের টুক্‌রা পড়িয়া গড়াইয়া অথবা হুচোট খাইয়া, বন্দুক সমেত পড়িয়া যাইতে হয়।

যে সব জঙ্গলে হাতীতে শিকার করা একেবারেই সম্ভব নয়, অথচ মাটিতে বসিয়া শিকার করিবারও সুবিধাজনক স্থান পাওয়া যায় না, সেই সব স্থানে মাচা শিকার করিতে হয়। সাধারণতঃ পাহাড়েই ইহা হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ বাঘ শিকার মাচাতেই করা উচিত।

আমি হাজারিবাগ অঞ্চলে বহুবার মাচা শিকার করিলেও অধিকাংশ সময়ই ইহা আমার বিশিষ্ট বন্ধু, কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামখ্যাত ব্যারিষ্টার, সুদক্ষ শিকারী মিঃ কে, এন, চৌধুরীর সহিত উড়িষ্যার করদ রাজ্য বামড়া ও নাগপুর প্রভৃতি স্থানে করিয়াছি। ইঁহার সহিত ২০।২৫ বৎসর হইতে পরিচিত হইয়া শিকার উপলক্ষে নানা স্থানে ও কলিকাতায় বহু সময় একত্র থাকায় আত্মীয়তা ও ভালবাসার বন্ধনে এতদূর জড়িত হইয়া পড়িয়াছি যে, উহার গ্রন্থি আর শিথিল হইবার নহে।

এ ক্ষেত্রে একটা কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সমব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেক সময় ব্যবসাগত ঈর্ষা (Professional Jealousy) যেরূপ দেখা যায়, এই সখের ব্যাধ-বৃত্তিতেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। আমাদের কোন কোন বন্ধুদের মধ্যেও ইহার প্রভাব দেখিতে পাইয়াছি। ভগবানের ইচ্ছায় নিজেকে এ পর্য্যন্ত উহা হইতে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছি। আর যে কয়দিন

আছি, এই সব বন্ধু বান্ধবের স্নেহ ভালবাসা সমভাবে বজায় রাখিয়া যাইতে পারিলেই নিজকে ধন্য মনে করিব।

মিঃ চৌধুরীর সহিত এই মাচা শিকারে পূর্ব্বেও ২।৩ বার আমাদের দেশে ও সিলেট অঞ্চলে একত্রে হাওদা শিকার করিয়াছি।

পাহাড় অঞ্চলে কোন কোন সময় দুই একটা বড় পাথরের আড়ালে মাটীতে বসিয়াও শিকার করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তাহাতে সুবিধা হয় না; কাযেই মাচাতেই বসিতে হয়।

অনেকে গাছের ডাল কাটিয়া টংএর মত করিয়া মাচা বাঁধিয়া বসেন। উহা দেখিতে অত্যন্ত অস্বাভাবিক হয় বলিয়া দূর হইতেই জানোয়ার গণ টের পায়। যদি এই জাতীয় মাচাতেই কাহারও বসিতে হয়, তবে তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে বাঁধিয়া রাখাই উচিত, যেন জানোয়ারগণ দেখিয়া দেখিয়া অভ্যস্ত হইতে পারে। কিন্তু যে শিকারীদল বর্গীর মত এক এক পাহাড় বাঁট করিয়া তোলপাড় করিয়া তুলেন, তাহাদের পক্ষে উহা সম্ভবপর হয় না। এক একখানা 'চারপায়া', (খাটলি) গাছের ডালে বাঁধিয়া বসিয়া যাওয়াই সুবিধা; আবশ্যক হইলে ২।১টা সরু ডাল কাটিয়া 'ঠেকা' দিয়াও লওয়া যায়। ইহাতে ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই এক একটা মাচা তৈয়ার হইয়া যায়; গাছও বেশী কাটা পড়ে না। কাযেই দূর হইতে জানোয়ারগণ কোনরূপ সন্দেহ করে না। আমরা এই প্রণালীতেই মাচা বাঁধিয়া শিকার করিয়াছি। গ্রাম হইতে 'চারপায়া' সংগ্রহ করাও কঠিন নয়।

এই প্রকারের মাচায় বসিয়া শিকার করিতে করিতে এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে, জানোয়ার একটু বেশী ডান বা বাঁ দিয়া সরিয়া গেলে, ইহা হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া মারা অত্যন্ত অসুবিধা; বিশেষতঃ আমার মত লোকের পক্ষে। এই সব অসুবিধা দূরীকরণ জন্য আমি ঠিক্ হাওদার প্রণালীতে অথচ খুলিয়া নিয়া ১০ মিনিটের মধ্যেই যায়গা

মত fit করা যায়, মাত্র একমণ ওজনের, দুইটা বন্দুক সহ দুইজন লোক বসিবার উপযোগী করিয়া চারপায়া অপেক্ষা ছোট একরকম মাচা আবিষ্কার করিয়াছি। ইহাতে বসিয়া, দাঁড়াইয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, যে কোন রকমেই শিকার করার অসুবিধা হয় না।

একবার অত্যন্ত জব্দ হইয়া, তবে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহা প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আমরা বামড়া রাজ্যের কোন পাহাড়ে এক পাল বাইসন এর সংবাদ পাইয়া (ঐ প্রদেশে Bisonকে 'গয়েল' বলে) শিকার করিতে যাইয়া মাচা করিয়া বসি। দুই, আড়াই শত কুলি প্রায় এক, দেড় মাইল দূর হইতে ইহাদের drive করিয়া আনায়, আমার সম্মুখেই ইহারা পাল ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের সংখ্যাও সাত আটটার কম ছিল না। যদি আমি ইতস্ততঃ না করিয়া, প্রথমে আমার সম্মুখে যে দুটী ছিল তাহাদিগকে মারিতাম, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, দুই গুলিতেই দুইটাকে মারিতে পারিতাম, কিন্তু ইহাদের বিশালকায় দলপতিকে পশ্চাতে দেখিয়া, সম্মুখস্থ ২টাকে গুলি না করিয়া উহাকেই মারিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরে একটু সুযোগ মিলিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, ঢিলা খাটুলার মধ্যে আমি যেন একটা গর্ত্তে বসিয়াছিলাম, কাযেই উহাকে মারার আর সুবিধা হইল না। একটু নড়া চড়া করিলেই উহা পলাইয়া যাইবে মনে করিয়া, নড়িতেও পারিতেছিলাম না। তখন উহাদের পিছন হইতে হঠাৎ beater কুলীদের চীৎকারে উহারা নক্ষত্রবেগে দৌড় দিল। তথাপি যতদূর সম্ভব তৎপরতার সহিত, আমার উদ্দিষ্ট বাইসন্‌কে একগুলি করিলাম; গুলিও ঠিক স্কন্ধে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দূরতানিবন্ধন এক গুলিতে উহাকে রাখিতে পারিলাম না; অত্যন্ত জখম হইয়া অন্য এক দূর পাহাড়ে চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ আমার বন্ধু শিকারী মিঃ চৌধুরী, তাঁহার মাচা হইতে নামিয়া, পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন

না। পরে উহাকে অন্য এক পাহাড়ে মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। যদি আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া গুলি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে প্রথম সুযোগ নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কিছুতেই উহাকে হারাইতাম না। ইহার পরই আমি, এই প্রণালীর 'হাওদা মাচা' তৈয়ারী করিয়াছিলাম।

বাম্‌ড়া রাজ্যের কোন এক পাহাড়ে 'হাঁকোয়া' করিয়া একবার আমি এত জব্দ হইয়াছিলাম যে, তাহা লিখিতে লজ্জাবোধ হয়। আমি এক মাচায় ছিলাম, সেদিন বাঘের কোন খবর ছিল না; হরিণের জন্য পাহাড় হাঁকানো হইতেছিল। খানিকক্ষণের মধ্যেই এক শুকনা নালা দিয়া, সস্ত্রীক একটী বাঘ আমার দিকে আসিয়া পড়িল। নালা দিয়া আসিবার সময়ই গুলি করিলে, অন্ততঃ একটীকে রাখিতে পারিতাম, কিন্তু আরও কাছে আসিলে গুলি করার সুবিধা হইবে মনে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। বাঘিনীটী ঠিক আমার মাচার নীচে আসিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। একবার হঠাৎ উপরে আমার দিকে দৃষ্টি পড়ায়, সমস্ত গুলি দাঁত বাহির করিয়া যেন মুখ ভ্যাংচাইল। ইচ্ছা করিলে তখন অনায়াসেই এক গুলিতে শেষ করিতে পারিতাম, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ শৃগালের মত মৎস্য-মাংস দুইই হারাইতে হইল। বড় বাঘটা একটু দূরে ঠিক আমার সম্মুখে সমসূত্রে দাড়াইয়া ছিল বলিয়া, পাশ ফিরিলে উহাকেই মারিব, এই সুযোগ খুঁজিতেছিলাম। কিন্তু এক্ষেত্রেও বাইসনের মত দুইটীকেই হারাইতে হইল।

মাচায় যদি খব শান্ত হইয়া বসিয়া থাকা যায়, তবে হরিণ, বাইসন প্রভৃতি যে কোন জানোয়ার মাচার এত নিকটে আইসে যে, তখন উহাদিগকে ঢিল ছুড়িলেও লাগান যায়। উহাদের তখনকার ঘন ঘন পশ্চাদ্দৃষ্টি ও ভীত চকিত ভাব একটি উপভোগের বিষয়। আমি কোন কোন সময় আমার মাচার নীচে দুই একটী হরিণকে গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া ছুড়িয়াও মারিয়াছি। উহা অপেক্ষা বৃহৎ

শিকারের প্রত্যাশায়ই এইরূপ করিয়াছি। এই সব পাহাড় অঞ্চলে শিকার করিবার পূর্ব্বে আমি কখনও বাইসন মারি নাই। মহিষের মত যদিও ইহারা তত বড় না হউক, তথাপি এই সব বিশালকায় জানোয়ার যেরূপ উচু নীচু পাহাড়ের ভীষণ জঙ্গলে, খাল নালার মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া যায়, তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়।

একবার আমরা বামড়ায় জমনক্ষিরার পাহাড়ে এক পাল বাইসনের সন্ধান পাইয়া কয়েকদিনের উপর্য্যুপরি চেষ্টা সত্ত্বেও কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। একদিন সৌভাগ্যক্রমে, পাহাড় drive করাইতে করাইতে দল শুদ্ধই আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্মুখেই ঢালু পাহাড় ক্রমে যাইয়া সমতল ভূমির সহিত মিশিয়াছে, কাযেই ইহারা আর অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছিল না। পিছনের beater কুলিগণ তখনও আসিয়া পৌঁছে নাই; সেই জন্যই ইহারা কতকটা শান্তভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু পশ্চাৎ দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিল। আমি আর তখন সময় ক্ষেপণ না করিয়া সেটাকে সুবিধা পাইলাম তাহার উপরেই আমার রাইফ্‌লের দক্ষিণ নল প্রয়োগ করিলাম। উহাতে steel cored গুলি ছিল। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই ঢালু পাহাড়ে গড়াইয়া নীচে উত্থান শক্তি রহিত হইয়া পড়িল। বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে অপরগুলিও ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেদিকে পারিল ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আমি অপর একটিকে ফায়ার করিলাম, এইটিও সঙ্গে সঙ্গে নীচে গড়াইয়া পড়িল। যদি তখন আমার নিকট আর একটি বন্দুক থাকিত, তবে নিশ্চয়ই অন্ততঃ আর একটিকে মারিতে পারিতাম। আমার কার্ত্তুজ যদি ধূমশূন্য (smokeless) বারুদের না হইত, তবে এ ভাবে নিমেষের মধ্যে দক্ষিণে ও বামে এরূপ প্রকাণ্ড দুইটি জানোয়ারকে মারিতে পারিতাম না। অনেক শিকারীরই এরূপ সৌভাগ্য হয় না।

সেবার আমি কলিকাতা হইতে হঠাৎ বামড়া শিকারে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম বলিয়া, বাড়ী হইতে বন্দুক আনাইবার সুবিধা হয় নাই। Manton Co হইতে একটি 577 hired express rifle ও মাত্র ৫০টী গুলি লইয়া যাই। কিন্তু শিকার হইতে কলিকাতা আসিয়া ২৩টি গুলি সহ বন্দুকটি দোকানে ফিরাইয়া দিয়াছিলাম! সেবার কার শিকারে আমি ২৭টি আওয়াজ করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ২৩টি শিকার করিয়াছিলাম ইহার তিনটি গুলি আবার পূর্ব্বোক্ত বাইসন দুইটির অন্তিম যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল; মাত্র একটি গুলিই 'মিস্' হইয়াছিল! আমার জীবনে আর কখনও এরূপ সফলতা লাভ করি নাই। এই জন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই জাতীয় শিকারে সাহস ও ধৈর্য্য সহকারে মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে পারিলে বিফলতার সম্ভাবনা প্রায়ই থাকে না। নচেৎ আমি এইরূপ অনভ্যস্ত বন্দুক দিয়া এতটা কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না।

ডালা শিকার।

আমাদের এতদঞ্চলের মধুপুর ও ভাওয়ালের জঙ্গলে, নিম্নশ্রেণীর গ্রাম্য শিকারীগণ আর এক অভিনব প্রণালীতে শিকার করে; তাহাকে ডালা শিকার বলে।

একজন লোক প্রকাণ্ড একটি ডালা বা ডালি মাথায় উপুড় করিয়া দিয়া, তাহার উপর মাটির সরাতে মোটা শলিতায় একটি প্রদীপ জ্বালিয়া আগে আগে এবং ঠিক তাহার পিছনে বন্দুক সহ শিকারী যাইতে থাকে। আলোটি মাথার 'থাকার দরুণ নীচে চতুর্দ্দিক গাঢ় অন্ধকারের একটি বৃত্ত হয়। ইহারা আস্তে আস্তে বনে বনে ঘুরিতে

থাকে। অনেক সময় হরিণ কিংবা যে কোন জন্তু উজ্জ্বল আলোটির দিকে স্থিরভাবে চাহিয়া থাকে ; কাযেই ছায়ায় ঢাকা লোক দুটিকে দেখিতে পায় না। ইহাকে আমরা Torch light shooting বলিলেও বলিতে পারি। এইভাবে নিকটস্থ হইয়াই শিকারী পিছন হইতে গুলি করে, কিন্তু যদি দৈবাৎ কোন হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হয়, তখনই ঐ আলোটি পট করিয়া মাথা হইতে নামাইয়া ডালা চাপা দিয়া আস্তে আস্তে পিছন দিকে সরিয়া পড়ে। শুনিয়াছি সুন্দরবন অঞ্চলেও স্থানীয় লোকেরা অনেক সময় এইভাবে শিকার করে।

ছোটনাগপুরে ও সাঁওতালীদের মধ্যে এই প্রণালীর শিকারের প্রচলন আছে। তাহাদের মধ্যে নাকি আলো লইয়া আগে আগে যাইবার সময় সানাই বা বাঁশী বাজাইবার প্রথাও আছে। ইহাতে নাকি আরও সুবিধা এই হয় যে, দূর হইতে হরিণ বা যে কোন জানোয়ারই স্বর শ্রবণে মুগ্ধ ও তীব্র আলোকে আকৃষ্ট হইয়া অনেক সময় আলোর দিকে তাকাইয়া যেন hypnotised হইয়া আস্তে আস্তে নিকটে চলিয়া আসিতে থাকে। তখন শিকারীদের অতি সাবধানে থাকিতে হয়। যদি কোন কারণে ইহাদের এই ভাবের আবেশ ভাঙ্গিয়া যায়, তবে হিংস্র জন্তু হইলে বিপদ অনিবার্য্য।

এই প্রণালীতে শিকার করিতে আমি কখনও দেখি নাই। তবে আমি হাজারীবাগ থাকা কালে, পরীক্ষা করিবার জন্য দুই তিন দিন রাত্রে সাঁওতাল কুলিদিগকে এইরূপে শিকার করিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা বিশেষ কিছু ফল করিয়া আসিতে পারে নাই। কেবল একদিন গোটা দুই খরগোস মারিয়া আনিয়াছিল মাত্র।

আমাদের দেশে জগা পালোয়ান নামক একজন মান্দাই শিকারী ছিল। (এই মান্দাইদিগকে আমাদের দেশে মান্দাই, কোঁচ, হদী,

হাজং প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করিয়া থাকে)। সে চিরজীবন এই প্রণালীতেই শিকার করিত। এক রাত্রে সে তাহার সহকারীকে সঙ্গে লইয়া ভাওয়ালের জঙ্গলে হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে যায়। হঠাৎ সম্মুখে এক ভালুক পড়ায় তাহার সঙ্গী অত্যন্ত ভয় পাইয়া আলো লইয়াই প্রস্থানের উদ্যোগ করে। জগাও নিরুপায় হইয়া তৎক্ষণাৎ ভালুককে গুলি করে, কিন্তু নিয়তি প্রেরিত ভালুক তাহার গুলি উপেক্ষা করিয়া আসিয়া জগার ডান হাত কামড়াইয়া ধরে ও সমস্ত হাতটার অস্থিমাংস চূর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। পরদিন উহাকে ডুলি করিয়া ময়মনসিংহ হাসপাতালে লইয়া আসা হয়। সেখানে স্কন্ধদেশের নিকট হাতখানা amputation করার কয়দিন পরেই হাসপাতালেই তাহার মৃত্যু হয়। উল্লিখিত গল্পটি হাসপাতালে তাহার নিজ উক্তি অবলম্বনে লিখিত হইল।

ইহা দ্বারাও বুঝা যায়, এই জাতীয় শিকারের চেষ্টা কোন সৌখীন ভদ্র শিকারীর করা উচিত নয়।

হাতী ধরা

যাবতীয় বনচারী পশুদের মধ্যে হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহারা অতি প্রাচীন কাল হইতে ধৃত ও পালিত হইয়া, মানবের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট আছে।

আমাদের হিন্দু শাস্ত্রেও মহর্ষি পালকাপ্য প্রণীত গজায়ুর্ব্বেদ-সংহিতায় দেখিতে পাই, সর্ব্বপ্রথমে বিভিন্ন নাম ও গুণযুক্ত সস্ত্রীক আটটি হস্তী, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া, প্রজাপতির আদেশে অষ্ট দিকপাল রূপে ধরণীর রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হয়। তখন ইহারা পক্ষযুক্ত ও ত্রিভুবনে যদৃচ্ছ বিচরণক্ষম ছিল। কালক্রমে ইহাদের বংশধরগণ ব্রহ্মশাপে পক্ষচ্যুত ও মনুষ্যের বশীভূত হইয়া পড়ে।

অঙ্গরাজ রোমপাদ দেবাদিষ্ট হইয়া, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদের উপত্যকার বিশাল অরণ্যে ইহাদিগকে বন্ধন উপযোগী পাশ অর্থাৎ রজ্জু দ্বারা ধৃত করিয়া, স্বদেশে আনয়ন করেন। করিণী-গর্ভসম্ভূত মহর্ষি 'পালকাপ্য' ইহাতে ব্যথিত হইয়া, হস্তীযূথের পদচিহ্ন অনুসরণ করতঃ অঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। অঙ্গরাজের সাদর অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া, মুনিবর হস্তীদিগের শ্রেণী বিভাগ, ইহাদিগকে ধৃত করিবার উপায় ও চিকিৎসা প্রণালী এবং ইহাদের দ্বারা রাষ্ট্রের ও মনুষ্য-সমাজের কি উপকার সাধিত হইতে পারে, তদ্বিবরণ যথাযথ-ভাবে বর্ণনা করেন।

বর্ত্তমান যুগে যে সব প্রণালীতে হাতী ধরা হয়, তখনও তাহাই প্রচলিত ছিল; এবং উহাদিগকে 'বারিবন্ধ', 'বশাবন্ধ', 'অনুগত-বন্ধ', 'আপাত-বন্ধ' ও 'অবপাতবন্ধ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইত।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে, ইহা পৌরাণিক গল্প বলিয়া বিবেচিত

হইলেও, হস্তিগণকে ধরিবার কোন অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রণালী এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই। কাজেই গল্পাংশ বাদ দিলেও, হস্তী জাতি যে স্মরণাতীতকাল হইতেই মানবের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট ও তাহাদের কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এবং ইহাদের ধরিবার প্রণালীও যে প্রায় অভিন্ন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে ইহারা রাজভোগ্য উপকরণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া, রাষ্ট্র-রক্ষা কার্য্যে নিয়োজিত থাকিত ও রাজ্যের গৌরব বর্দ্ধন করিত। সম্প্রতি রাষ্ট্র-রক্ষার জন্য তত প্রয়োজন না থাকিলেও, অন্যান্য কার্য্যে ইহাদের সমাদরের সম্পূর্ণ লাঘব হয় নাই।

হস্তী পালিত অবস্থায় যেমন সাহসী ও বুদ্ধিমান হয়, বনে ঠিক্ আবার তেমনি ভীরু ও আহাম্মক থাকে। সচরাচর হাতী এত ভীরু ও বোকা বলিয়াই, ইহাদিগকে এত সহজে ধরা যায়। এই জন্যই বোধ হয়, 'হস্তী-মূর্খ' বলিয়া একটা কথা চলিত হইয়া আসিতেছে। তবে কোন কোন হাতী বনেও অত্যন্ত ধূর্ত্ত ও দুর্দ্দান্ত থাকে।

আজকালকার দিনের যাবতীয় sportsএর মধ্যে, হাতী ধরাও একটী শ্রেষ্ঠ sport বলিয়া আমার বিশ্বাস। সাধারণতঃ চারি উপায়ে হাতী ধরা হইয়া থাকে। কোট বা খেদা, ফাঁসি, পরতালা ও ফাঁদ। মহিশূর প্রভৃতি স্থানে আর এক প্রণালীতে হাতী ধরিয়া থাকে, তাহা গর্ত্তে ফেলিয়া (pit fall)। হাতী যেমন বৃহৎ জানোয়ার, ইহাদের ধরিবার আয়োজনও তেমনি বিরাট্।

সাধারণতঃ কার্ত্তিক মাস হইতে পৌষ মাঘ পর্য্যন্ত হাতী ধরিবার প্রশস্ত সময়। তবে ফাল্গুন চৈত্র মাস পর্য্যন্তও যে ধরা না যায়, তাহা নহে। কার্ত্তিক মাসে ধান পাকিতে আরম্ভ করিলে, ইহারা সুদূর পাহাড় হইতে ধানের লোভে দলে দলে নামিয়া আইসে; এবং স্থূলচর্ম্মা জানোয়ার বলিয়া শীতকালে বেশ শান্ত ভাবে

লোকালয়ের আশে পাশে বিচরণ করিয়া, গ্রীষ্মের প্রারম্ভে নিজ বাসস্থানাভিমুখে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। সাধারণতঃ হেমন্ত ও শীত ঋতুতেই মদ্দা হাতীগুলির 'মস্তি' (মদক্ষরণ—হস্তীর গণ্ড স্থলের উপরিভাগ হইতে উগ্রগন্ধযুক্ত রস নিঃসরণ) হইয়া থাকে। কখনও কখনও মাদী হাতীগুলিরও মস্তি হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা পুং-হস্তীদের মত অত অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয় না।

আজকাল কেহ কেহ হাতী খেদা সম্বন্ধে সময়ে সময়ে নানা কথা লেখেন বটে, কিন্তু তাহা কতক জানিয়া, কতক বা লোক মুখে শুনিয়া। সেই সব প্রবন্ধে ভাষার পারিপাট্য থাকিতে পারে বটে, কিন্তু ঘটনার সত্যতা, অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন, অন্ধকারেই থাকিয়া যায়।

আমি নিজে দুইবার খেদায়, স্বাধীন ত্রিপুরার ও চেলার দুর্গম পাহাড়ের নানা স্থানে কুলিদের সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া, এমন কি জঙ্গলী হাতী যে সব স্থানে বিচরণ করে, তাহাদের গতি বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য, সেই সব স্থানে গিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই যতদূর সম্ভব লিখিতে প্রয়াস পাইব।

সচরাচর হাতী পাহাড়ে দলবদ্ধাবস্থায় থাকে। ৫।৭টা হইতে আরম্ভ করিয়া ১০০।১৫০ পর্য্যন্তও এক এক দলে দেখা যায়। প্রত্যেক দলেই এক একটা করিয়া যূথপতি অর্থাৎ দলাধিপতি থাকে। ইহারা নর বা মাক্না হয়। [দাঁতলা (Tusker) নর এবং দন্তবিহীন পুং-হস্তীকে (male without tusk) মাক্না বলে।] পালের মধ্যে প্রধান হওয়া সত্ত্বেও ইহারা ও দলস্থ সকলে, সর্ব্বদাই দলপতির প্রধানা বেগমের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু কখনও অন্য কোন দলের সহিত বিগ্রহ উপস্থিত হইলে, যূথপতিদের তখন প্রাধান্য দেখাইবার সময় উপস্থিত হয়। আরও মজা এই যে, ইহারা পাহাড়ে চরিবার সময় বা তাড়া পাইয়া পলাইবার সময়,

দলবদ্ধাবস্থায় গড্ডলিকা প্রবাহের মত, একের পশ্চাতে অন্যগুলি চলিতে থাকে; কিন্তু চলিতে চলিতে দৈবাধীন কোন হস্তী-শাবক (calf) হঠাৎ পশ্চাতে পড়িয়া গিয়া চীৎকার করিলে, উক্ত শাবকের মাতা তে. দূরের কথা, দলস্থ সকল হাতীই যে কোন বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া, সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইবেই। ইহা উহাদের জাতিগত বিশেষত্ব; এবং অত্যধিক স্বজাতি ও সন্তান-বাৎসল্যের জন্যই তাহারা এরূপ করিয়া থাকে।

আমার পালিতা হস্তিনীর মধ্যে অনেকে অনেকবার প্রসব করিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, মাতা ব্যতীত অন্যান্য হাতীও বাচ্ছাগুলিকে অত্যন্ত ভালবাসিত। আরও আশ্চর্য্য এই যে, যে সব হস্তিনীর সন্তান হয় নাই, তাহাদের মধ্যেও কোন কোনটী বাচ্ছাকে মাতার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া, নিজেই মাতৃস্থান অধিকার করিত। এমনও দেখিয়াছি যে, শাবকগুলি উহাদের এই শ্রেণীর ধাতৃ-মাতার শুষ্ক স্তন্য চুষিতে চুষিতে, তাহাদের বক্ষ হইতে জলবৎ দুগ্ধধারা নিঃসরণ করিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চারি উপায়ে হাতী ধরা হয়। তন্মধ্যে দলবদ্ধ হাতীকে কোট (Stocket)করিয়া ধরা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ইহাকেই খেদা বলে। বোধ হয় লোক দিয়া খেদাইয়া (Drive) আনিয়া হাতীগুলিকে কোটে ফেলা হয় বলিয়া, ইহা খেদা নামে অভিহিত হইয়াছে। এই উপায়ে হাতী ধরা ও তদানুষঙ্গিক যাবতীয় কার্য্যকে খেদা Operation বলে।

অল্পবয়স্ক সাত ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হাতীকে, স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে ম্যানী ও ম্যানা বলে। ফাঁসি দিয়া ওই জাতীয় হাতীকে সাধারণতঃ ধরা হয়। ইহা অপেক্ষা বড় হাতীকে, ফাঁসি দিয়া ধরা অপেক্ষাকৃত কঠিন। পালিত হাতী দ্বারা দৌড়াইয়া (chase), বড় বড় মোটা দড়ির ফাঁস (ইহাকে দোমা বলে) গলায় ফেলিয়া, ইহাদিগকে ধরা হয়।

বড় বড় নর গুণ্ডার ‘মস্তি’ হইলে উহাদের মত্ততা জন্মে, ও উহারা হস্তিনীর উপর আসক্ত হইয়া পড়ে। তখন উহাদের প্রকৃতিও ভীষণ হইয়া উঠে। পালিত অবস্থায় সর্ব্বদাই এরূপ দেখা যায়। মস্তি হইলে অনেক সময়, কোন কোন পালিতা হস্তিনীর উপর আসক্ত হইয়া এত উন্মত্ত হইয়া উঠে যে, তখন ইহারা বন ছাড়িয়া, লোকালয় বা পিলখানায়ও আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সময় ঐ হস্তিনীর সাহায্যে ইহাদের পায়ে কাছি বাঁধিয়া, গাছের সঙ্গে আটকাইতে হয়। ইহাকে ‘পরতালা’ বলে।

যে সব মদ্দা গুণ্ডা হাতী অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হয়, তাহাদিগকে মোটা মোটা দড়ির ফাঁদ তৈয়ার করিয়া, পায়ে আটকাইতে হয়। ফাঁসি পরতলা ও ফাঁদের বিস্তৃত বিবরণ খেদার পরে লিখিত হইবে।

গারো হিলের নানাস্থানে, খাসিয়া, জন্তিয়া এবং চট্টগ্রামের ও স্বাধীন ত্রিপুরার বিভিন্ন পাহাড়ে, হাতী খেদা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মহিশূর রাজ্যে, ব্রহ্মদেশে এবং উড়িষ্যার কোন কোন করদ রাজ্যেও, প্রায় একই প্রণালীতে খেদা করিয়া হাতী ধরা হয়। বৃটিশ শাসনাধীন স্থানে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া খেদা করিলে, হাতী প্রতি ছোট বড় নির্ব্বিশেষে ১০০৲ টাকা হিসাবে Royalty দিতে হয়। মাতার সহিত শিশু শাবক থাকিলে, ঐ শাবকের জন্য কোন কর দিতে হয় না; বাচ্চা একটু বড় হইলেই কর দিতে হয়। কোন হস্তিনী ধৃত হওয়ার পর প্রসব করিলে, সেই সাবকের জন্য কর দিতে হয় না। এই সব বন্দোবস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের সহিত করিতে হয়।

স্বাধীন ত্রিপুরার ধৃত হস্তীর বিক্রয়-মূল্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ করস্বরূপ ধার্য্য হয়। খেদা বন্দোবস্ত উপলক্ষে বিভিন্ন লোকে ডাক করিয়া সর্ব্বোচ্চ ডাকে (highest bid) ঐ royalty স্থির করিয়া লয়। দোয়ালের তারতম্যানুসারে ডাকের তারতম্য হইয়া থাকে;

যথা, কোন দোয়ালে বিক্রয় মূল্যের উপর চারি আনা, কোনটা পাঁচ আনা, কোনটা বা ছয় আনা ইত্যাদি। ইহার উপর আবার একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক টাকা আমানত রাখিতে হয়; খেদা হইয়া গেলে ঐ টাকা ফেরত পাওয়া যায়। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, কেহ বন্দোবস্ত লইয়া খেদা না করিলে বা স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটিতে খেদা সম্পূর্ণ করিতে না পারিলে ঐ টাকা বাজেয়াপ্ত হয়।

গারো পাহাড় পূর্ব্বে সুসঙ্গের মহারাজাদের অধিকারে তাঁহাদেরই সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত ছিল। তাঁহারা ঐ পাহাড়ে যদৃচ্ছাক্রমে কোট, ফাঁসি প্রভৃতি দ্বারা হাতী ধরিতেন। কিন্তু কিছু কাল হইল, গবর্ণমেণ্ট দয়াপরবশ হইয়া এই অযথা কষ্টকর ব্যাপার হইতে তাঁহাদের মুক্তি দিবার জন্য নাম মাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়া পাহাড়টি খাস করিয়া, তাঁহাদিগকে সেই ঝঞ্ঝাট হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

বহুদিন হইতেই খেদা করিয়া হাতী ধরিবার সখ আমার ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় ও আমি একযোগে, স্বাধীন ত্রিপুরারাজ্য হইতে মনু ও দেওগাং নামক দুইটী হাতীর দোয়াল বন্দোবস্ত করিয়া লই। তৎপূর্ব্বেও আর একবার, স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী একত্রে চেলা পাহাড়ে খেদা করিয়াছিলেন। উভয় বারই আমি উপস্থিত থাকিয়া, খেদার যাবতীয় কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করার সুবিধা পাইয়াছিলাম। আমাদের নিজেদের খেদার সময় কুলিদের সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া, নিজে খেদার কার্য্য তত্ত্বাবধান করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহা কখনও অন্য কোন শিকারে পাই নাই।

পাহাড়ে হাতী দলবদ্ধ হইয়া যে সব স্থানে বিচরণ করে ও যে যে স্থান দিয়া সমভূমিতে নামিয়া আইসে, তাহাকে 'দোয়াল'

বলে। স্থানের বা নদীর নামানুসারে এই সকল দোয়ালের নামকরণ হয়; যথা, অমর সাগর, বিলনিয়া, দেওগাং ও মনু ইত্যাদি। এই সব দোয়ালের পূর্ব্ব হইতেই সীমা নির্দ্দিষ্ট করা আছে ও তাহাই বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

খেদা সাধারণতঃ দুই উপায়ে করা যায়। কেহ কেহ নিজেদের তত্ত্বাবধানে কুলি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াও করিতে পারেন। যাঁহারা ঐ সব হাঙ্গামায় যাইতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা contract দিয়াও করাইতে পারেন। এই সব কাজের জন্য এই জাতীয় contractorএর অভাবও হয় না। contractorগণ আবার, subcontract দিয়াও খেদার কোন কোন বিভাগের কাজ করাইয়া থাকেন।

গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে, ভূতপূর্ব্ব খেদা-superintendent Sanderson সাহেবের প্রণালীতে খেদা করিতে হইলে, অন্ততঃ ৩।৪ শত লোকের কমে সঙ্কুলান হয় না। কিন্তু আর এক প্রণালীতে কম লোক দিয়াও খেদা করা যায়, তাহাকে 'বাংরি খেদা' বলে।

খেদা করণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে প্রথমে 'দোয়াল' বন্দোবস্ত লইয়া, কুলি ঠিক করিতে হয়। ৩।৪ শত কুলি দ্বারা খেদা করিতে হইলে, প্রত্যেক দশজন কুলির উপর একজন করিয়া 'সর্দ্দার' থাকে, তাহাদিগকে 'মাঝি' বলে। খেদা কার্য্যের জন্য চট্টগ্রামের হাট্‌হাজারী, পটিয়া, সাতকানিয়া প্রভৃতি অনেক স্থানে মাঝি ও কুলি পাওয়া যায়। মাঝিদিগকে সংবাদ দিলেই, তাহারা নিজ নিজ অধীনস্থ কুলি ঠিক করিয়া লয়। contractor দ্বারাই হউক অথবা নিজেরাই হইক, মাঝিদিগের নিকট হইতে কুলির জন্য agreement লইতে হয়। তাহারাই নিজ নিজ কুলির জন্য দায়ী থাকে।

কুলি সংগ্রহের সময় সর্ব্বাগ্রে আর এক শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন হয়, তাহাদিগকে পাঞ্জালী বলে। প্রথমেই অবস্থানুসারে, ইহাদের ১৫।২০ জনকে নিযুক্ত করিয়া দোয়ালে পাঠাইয়া দিতে

হয়। ইহারা ৩।৪ দলে বিভক্ত হইয়া দোয়ালের বিভিন্ন স্থানে হাতীর অনুসন্ধানে চলিয়া যায়। সাধারণ কুলি হইতেই এই শ্রেণীর লোক তৈয়ার হয়। যে সব কুলি বা মাঝি খেদার কার্য্য করিতে করিতে ক্রমে দক্ষতা লাভ করে, তাহারাই পরে এই কার্য্যে উন্নীত হয়। ইহারা দোয়ালের নানা স্থান খুঁজিয়া হাতীর সন্ধান করে। একবার যদি ইহারা হাতীর খোঁজ পায়, তাহা হইলে হাতী আর কিছুতেই ইহাদের চক্ষু এড়াইতে পারে না। ইহারা এমন কৌশলী ও সুদক্ষ যে, হাতীর পায়ের দাগ ও 'লাদি' দৃষ্টে হাতীর উচ্চতা অনুমান করিতে পারে। এমন কি, ইহারা জঙ্গলে হাতীর ডাক শুনিয়াও, দলে কিরূপ উচ্চতার ও কি পরিমাণ হাতী আছে, তাহা আন্দাজ করিয়া লয়। কখনও বা ইহারা হাতীর অতি নিকটে যাইয়া কোন গাছে চড়িয়া দলের হাতীর সংখ্যা নিরূপণ ও গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করে।

অনেক সময় বন্দোবস্তকৃত স্থানের মধ্যে হাতীর দল না থাকিলে, পাঞ্জালীরা নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে বহুদূর হইতে ইহাদিগকে কৌশলে তাড়াইয়া, নিজেদের বাঞ্ছিত স্থানে লইয়া আইসে। বলা বাহুল্য, ইহা গোপনেই সংঘটিত হয়। এরূপ কার্য্য ধরা পড়িলে ইহাদের শাস্তি হয়। কোন কোন সময় ইহাতে বিপরীত ফলও হইয়া থাকে। কারণ, কখনও কখনও হাতী বন্দোবস্তের সীমার বাহিরে থাকিয়া নিকটেই ঘুরা ফেরা করে, কিন্তু সীমার মধ্যে আসে না; হয় তো তাড়া না পাইলে ৫।৭ দিনের মধ্যেই আসিয়া পড়িতেও পারে, কিন্তু তাড়া পাইয়া আরও দূরে সরিয়া যায়। কাজেই এই সব কার্য্য খুব সুচতুর পাঞ্জালী ছাড়া করিতে পারে না। তাহারা এরূপ কৌশলে 'টোকা' (ধীরে তাড়া দেওয়াকে 'টোকা' দেওয়া বলে) দেয় যে, তাহাতে হাতী দলশুদ্ধ নিজেদের অভীষ্ট স্থানে আসিয়া পড়ে। হাতী ভীত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিলে, অল্প

সময়ের মধ্যেই বহুদূর চলিয়া যায়। ইহাকেই চলিত কথায় বলে, 'হাতী একবার মুখ বন্ধ করিলে, অনেকদূর না গিয়া আর মুখ খোলে না।' অর্থাৎ খাওয়া বন্ধ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে, অনেক দূর না গিয়া পুনঃ খাওয়া সুরু করে না। একবার খাইতে সুরু করিলেও আবার তাড়াতাড়ি চলে না।

পাঙ্গালীদিগকে পাঠাইয়া দিয়াই কুলি, মাঝি ও তাহাদের রসদ বা রেসান সহ জমাদার, পাহাড়ের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। পাঙ্গালীদের বিভিন্ন দলের মধ্যেও, পরস্পরের সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদান চলে।

কুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলেই পাঙ্গালীগণ হাতীর অবস্থান ও গতিবিধি সম্বন্ধে যে সমস্ত সন্ধান পায়, তৎক্ষণাৎ আসিয়া জমাদারকে জানায়। এইখানেই জমাদারের গুণপণা দেখাইবার সময় উপস্থিত হয়। জঙ্গলের যে স্থানে হাতী আছে, সেই স্থানের দুর্গমতা, হাতীর আহার্য্য ও পানীয়ের অবস্থা প্রভৃতি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া, সুবিধা ও সঙ্গত মনে করিলে, ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে ১ কি ১৷৷০ মাইল, কখনও বা ২ মাইল ব্যাস করিয়া, কুলি দ্বারা ঘিরিয়া ফেলে। এই সব কুলিরা এমন দক্ষ যে, সমস্ত বনটী ঘিরিয়া ফেলিতে ইহাদের এক দিনের বেশী সময় লাগে না। ১৫০।২০০ গজ কি আরও দূরে দূরে দুই জন করিয়া কুলি, এক একটী ছোট্ট ছাপরা অর্থাৎ একচালা বাঁধিয়া বসিয়া পড়ে। এইরূপে ঘিরিয়া ফেলা বা বেড় দেওয়াকে 'পাত বেড়' বলে। পাত বেড়ে কুলিরা বসিয়া গিয়াই, প্রত্যেকের সম্মুখে এক একটা আগুনের কুণ্ড করে। রাত্রে প্রতি চালায় দুই জন করিয়া জাগিয়া পাহারা দেয়। রাত্রে কোন সময় হাতী বেড়ের নিকটে আসিলে উহাদিগকে তাড়াইবার জন্য বাঁশের ঠক্‌ঠকি বাজাইতে হয়। এক পাঁখ বাঁশ দুই দিকের গিরা সমেত কাটিয়া, তাহার একদিক চিরিয়া ঠকঠকি

তৈয়ারী হয়। কোন কোন সময় ঠক্‌ঠকির শব্দে হাতী ভীত না হইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিলে, সকলে মিলিয়া হো হো করিয়া সোরগোল করে, বা আবশ্যক হইলে আগুন জ্বালাইয়া ভয় দেখায় এবং নেহাৎ ঠেকা হইলে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজও করে।

অনেক সময় হাতী ৮।১০ দিন পরেও, এই সব গোলযোগ ও বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া পাতবেড় ভাঙ্গিয়া চলিয়া যায়। তখন পুনঃ পাঞ্জালী দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়া, ঐ দলের খোঁজ পাওয়া গেলে উহাদের, নচেৎ অপর কোন দলকে বেড় দিতে হয়। প্রধানতঃ ৪টি কারণে হাতী বেড় ভাঙ্গিয়া যায় ;—(১) যদি কুলিরা অসতর্ক থাকে। (২) কোন দলে পূর্ব্বের বেড়-ভাঙ্গা ধূর্ত্ত হাতী থাকিলে, উহাদের সাহায্যেও এইরূপ হয়। (৩) বেড় যদি অনুপযুক্ত স্থানে দেওয়া হয়, যেমন যেস্থানে আহার্য্য আছে অথচ জলাভাব, অথবা আহার্য্য ও পানীয় উভয়েরই অভাব। সেই সব ক্ষেত্রে ২।৪ দিন কষ্ট সহ্য করিয়া শেষে এক দিন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া হাতীরা চলিয়া যায়। (৪) বেড় দিয়া যদি কোন কারণে কোট বাঁধিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেড়ের মধ্যে আহার্য্য ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলেও হাতী বেড় ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

কোন কোন সময় এরূপ স্থানে বেড় পড়ে যে, তাহার নিকটবর্ত্তী কোথাও কোট (stocket) তৈয়ার করিবার উপযোগী বৃক্ষাদি পাওয়া যায় না। এমন কি এক মাইল দূর হইতেও বহিয়া আনিতে হয়। ইহাতে কোট প্রস্তুত করিতে ১০।১২ দিন সময় লাগিয়া যায়। পাতবেড়ের নিকটে গাছ পাওয়া গেলে সচরাচর ৭।৮দিনের মধ্যে কোট তৈয়ার হইতে পারে।

রাত্রে কুলিয়া পাতবেড়ে ঠিকমত পাহারা দিতেছে কি না, তাহা জানার এক সুন্দর প্রণালী আছে। কোন মাঝির নিকট একখানা

চাদর, লাঠি বা অন্য কিছু দিলে, সে উহা তাহার অধীনস্থ এক কুলিকে দিবে। ঐ কুলি দৌড়াইয়া গিয়া তাহার পরবর্ত্তী চালার (পাতার) অপর এক কুলিকে দিবে। এইরূপে ক্রমাগত উহা মাঝির অধীনস্থ এক কুলির হাত হইতে অপরের হাত ঘুরিয়া, পূর্ব্ব স্থানে আসিতে আধ ঘণ্টা কি তিন কোয়ার্টার সময়ের অধিক দরকার হয় না। যদি কোন মাঝি বা কুলি অসতর্ক বা নিদ্রিত থাকে, তাহা হইলে সহজেই ধরা পড়িয়া যায় ও তাহার জন্য জমাদারের নিকট হইতে বিশেষ শাস্তি পায়। প্রতি রাত্রে এইরূপ ৩।৪ বার করিয়া, ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান লওয়ার নিয়ম। উহাকে 'ডাক পাঠান' বলে।

কুলিরা পাতবেড়ে বসিয়াই, তাহাদের সম্মুখে বেড়ের চতুর্দ্দিকের খানিক বন কাটিয়া ফেলে; তাহাতে পাতবেড়ের চারিদিকে ২০।২৫ হাত চওড়া একটী ফাঁকা স্থানের সৃষ্টি হয়। ভোর হইলেই মাঝিরা প্রতি চালা হইতে একজন করিয়া কুলি উঠাইয়া লইয়া, কোট তৈয়ারীর কার্য্যে নিয়োজিত করে। কোন কোন চালায় দিনে লোক রাখা অনাবশ্যক মনে করিলে, দুইজনকেও লইয়া যায়। আবার এমনও দেখা যায় যে, বেড়ের কোন স্থান নিরাপদ মনে করিলে, দুই তিন 'পাত্তার' মধ্যে মাত্র একজন লোক পাহারা রাখে। এই সব কুলীরাও কতক গাছ কাটে, কতক গাছ বহিয়া আনে; বা নিকটে নদী থাকিলে, কাটা গাছ জলে ভাসাইয়া দিয়া টানিয়া আনে। আবার কেহ বা গর্ত্ত করে এবং কোট বাঁধে। দিনের বেলায় এইরূপ ঠুক্‌ঠাক ও হৈ চৈ শব্দে হাতীগুলি দূরে বেশ ঠাণ্ডা হইয়া থাকে। কোটের নিকটও পাহারা দেওয়ার নিয়ম; কারণ, রাত্রে হাতী আসিয়া কোট দেখিয়া গেলে, আর তাড়া পাইয়াও উহাতে পড়িতে চায় না।

পাতবেড় দিয়া যত তাড়াতাড়ি কোট প্রস্তুত করা যায়, তত

কোটের জন্য কাঠ কাটা হইতেছে

অধিক সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে। বেড়ের মধ্যে কোটের স্থান নির্ব্বাচন করা একটী প্রধান কাজ। যেখানে সেখানে কোট করিলেই চলে না। খেদার জমাদার ও মাঝি প্রভৃতিরা এ সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষ।

ঘরের মোটা মোটা খুঁটির মত গাছ কাটিয়া, ঘন করিয়া বেড়া দিয়া, কোট প্রস্তুত করা হয়,—যেন খুঁটিগুলির ভিতর দিয়া হাতী শুঁড় প্রবেশ করাইতে না পারে। গাছগুলি মাটিতে ৩।৪ হাত পর্য্যন্ত পোঁতা হয় এবং মাটীর উপরেও ১০।১২ হাত উঁচু থাকে। এই সব খুঁটির সঙ্গে আবার অপেক্ষাকৃত সরু কাঠ দিয়া ৫।৬ সারি আড়া বাঁধিতে হয়। বাহির হইতে এই সব আড়ার সঙ্গে বেশ মোটা মোটা কাঠ দিয়া দুই সারি করিয়া 'প্যালা' (ঠেস) দেওয়া হয়, যেন হাতী ভিতর হইতে ধাক্কা দিলে, খুটিগুলি উল্‌টাইয়া না যায়। কোট বাঁধিতে দড়ির আবশ্যক হয় না। পাহাড়ে বড় বড় এক রকম লতা পাওয়া যায়, তাহা দ্বারাই কোট বাঁধার কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। বাঁশের তোয়াল বা বেতী তুলিয়াও বাঁধার কাজ চলে।

পাতবেড়ে হাতী পড়িলে, উহাদের সংখ্যা ও আকার অনুমান করিয়া, কোটের আয়তন স্থির করা হয়। অল্প সংখ্যক ও ছোট আকারের হাতী থাকিলে, কোট ছোট এবং অপেক্ষাকৃত সরু কাঠ দিয়া করিলেও চলে। অধিক সংখ্যক বৃহদাকারের হাতী থাকিলে বা 'নর' গুণ্ডার সংখ্যা বেশী হইলে, খুব বড় ও দৃঢ় করিয়া কোট করাই বিধেয়। স্থূল কথা কোট এইভাবে করা উচিত যে, উহাতে হাতী পড়িলে যেন খুব বেশী নড়াচড়া করিতে না পারে।

কোটের একটী দরজা থাকে, তাহাও মোটা মোটা কাঠ দিয়া তৈয়ারী করিতে হয়। ইহাতে কোটের ঝাঁপ এবং যে মাঝির তত্ত্বাবধানে ইহা রক্ষিত হয়, তাহাকে ঝাঁপ-মাঝি বলে। এই

ঝাঁপ, উপরের দিকে একটি লম্বা কাছি দ্বারা 'কপিকল' (পুলি) সহযোগে, ইন্দুরের কলের দরজার মত ঝুলান থাকে। এবং কাছির অপর প্রান্ত নিকটবর্ত্তী কোন গাছে বাঁধা থাকে। দরজার ভিতরের দিকেও অসংখ্য পেরেক মারিয়া দিতে হয়। পেরেকের একদিকের মাথা ২।২॥ ইঞ্চি করিয়া বাহির করা থাকে। হাতীগুলি দরজা দিয়া কোটে ঢুকে বলিয়া, ইহাদের যত আক্রোশ থাকে দরজার উপর। তাই দরজা কেবল মজবুত করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া পেরেক মারা হয়। হাতীগুলি ক্রমশঃ উহাতে ধাক্কা দেয়; এবং পিছনে হটিয়া ভেড়ার মত জোরে আসিয়া ঢুঁ মারে; কিন্তু পেরেক-গুলিতে ক্রমাগত আহত হইয়া পরে শান্তভাব ধারণ করে। অনেক সময় কোটের মধ্যে হাতীগুলি এত জোর করে যে ক্রমাগত ঢুঁ দিতে দিতে কোট ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করে। তখন 'ছর্‌রা' মারিয়া ইহাদিগকে ফিরাইতে হয়। হাতী কোট দাখিল হইলে অর্থাৎ কোটে পড়িলে, দিবারাত্রি উহার চতুর্দ্দিকে বন্দুক ও বল্লমসহ পাহারা দিতে হয়। রাত্রেই তাহারা বেশী জোর করে বলিয়া, দিন অপেক্ষা রাত্রিতেই বেশী সতর্ক থাকিতে হয়, এবং মশাল জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। কোটের অতি নিকটে কোন খাল নালা থাকিলে, তাহা হইতে ছোট নালা (drain) কাটিয়া কোটের ভিতর জলের বন্দো-বস্ত করিতে হয়। কোন কোন স্থানে খাল নালা বেড় দিয়াও কোট তৈয়ারী হইয়া থাকে। নচেৎ বড় বড় ডোঙ্গা নৌকা কোটের মধ্যে রাখিয়া উহাতে জল দিতে হয়। যদি ২।১ দিনের মধ্যেই কোট খালাস অর্থাৎ কোট হইতে হাতী বাহির করিবার সুবিধা থাকে তবে জলের বন্দোবস্ত না করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু কোট খালাস করিতে বিলম্ব হইলে, উপযুক্ত পানীয়ের অভাবে হাতীগুলি অত্যন্ত কাবেজ হইয়া পড়ে। ইহাকে 'তাও খাওয়া' বলে।

কোট তৈয়ার হইয়া গেলে, উহার দরজা হইতে কোটের বহির্ভাগে দুই দিকে ক্রমে প্রসার করিয়া মোটা মোটা খুটি পুতিয়া খানিকদূর পর্য্যন্ত দুইটা বেড়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাও বেশ মজবুত করা দরকার, তবে কোটের মত অত দৃঢ় না করিলেও চলে। এই wings দুইটিকে 'আন্নি' বলে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, হাতী তাড়াইয়া ঠিকমত কোটের দরজায় আনিয়া ফেলা যায় না বলিয়া, এই ক্রম-প্রসারিত 'আন্নির' ভিতরে আনিয়া একবার ঢুকাইতে পারিলে, পিছন হইতে ক্রমাগত তাড়া খাইয়া এবং দক্ষিণে ও বামে বাধা পাইয়া, ক্রমে সঙ্কীর্ণ পথে আসিয়া কোটের দ্বারে উপস্থিত হয়। দ্বারের নিকট হইতে 'আন্নি (wings) ক্রমে চওড়া করিয়া লইতে লইতে, উহার শেষ সীমা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কাজেই 'আন্নিতে' হাতী ঢুকানো খুব শক্ত নয়। আন্নির শেষ দুই প্রান্ত হইতে আবার কতকদূর পর্য্যন্ত সাদা 'মলমল' কাপড় টাঙ্গাইয়া, ঐ রূপে বর্দ্ধিত করিয়া দিতে হয়। আন্নি ও সাদা কাপড়ের বেড়ার বাহির দিকেও কতকগুলি জঙ্গল কাটাইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়। সাদা কাপড় ও বাহিরের দিকের ফাঁকা স্থান দেখিয়া, হাতীগুলি আন্নির ভিতরের জঙ্গল দিয়া ক্রমশঃ কোটের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইচ্ছা করিলে তখন উহারা অনায়াসেই বাহির হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহাদের জাতিগত ভীরুতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত অধিকাংশ সময়ই তাহা করে না। বলা বাহুল্য, কোট ও আন্নির ভিতর ঘন জঙ্গল থাকাই উচিত। যদি কোনস্থানে জঙ্গল কম থাকে, অথবা কোট তৈয়ার করিবার সময়, লোক চলাচলে উহা ভাঙ্গিয়া বা দলিত হইয়া যায়, তবে তথায় কৃত্রিম জঙ্গল করিয়া লইতে হয়।

পাতবেড় দিয়া কোট প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গে, অপর একটী গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়,—তাহা পোষা হাতী সংগ্রহ করা।

হাতী কোটে পড়িলে, যাহাতে অগৌণে কোট খালাস অর্থাৎ কোট হইতে হাতীগুলিকে বাহির করা যায়, তজ্জন্য, এবং ধৃত হস্তীগুলির চাড়া বা আহার্য্য যোগাইবার জন্যও, উপযুক্ত সংখ্যক পোষা হাতী প্রস্তুত রাখিতে হয়। খেদাকারকের নিজের শিক্ষিত হাতী না থাকিলে ঐরূপ হাতী ভাড়া করিয়া লইতে হয়। শ্রীহট্ট কুমিল্লা ও স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের নানা স্থানে, এই কার্য্যের উপযোগী বিস্তর হাতী ভাড়া পাওয়া যায়। এই সব স্থানের অনেক গৃহস্থ, নানা কার্য্যে ভাড়া দিবার জন্য হাতী পোষে। কোন কোন সময় ২।৪ জন মিলিয়াও একটী হাতী রাখে। স্বাধীন ত্রিপুরার অন্তর্গত কৈলাস সহরে, ১৭।১৮ জনে ভাগে একটী হাতী রাখিয়াছিল। এই সব হাতী খেদার কাজে এবং শোভাযাত্রাদিতে ভাড়া দেওয়া ছাড়া, প্রধানতঃ পাহাড় হইতে গাছ নামান কার্য্যেও ব্যবহৃত হয়। ঐ সব স্থানের লোকের ইহাই প্রধান ব্যবসা। এক একটি হাতী প্রতি বৎসর ৫।৭ শত হইতে, হাজার দেড় হাজার টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করে। যে হাতী যত লম্বা ও মোটা গাছ, পাহাড় হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারে, তাহার ভাড়াও তত অধিক। এই কার্য্যের জন্য ৮।১০ টাকা হইতে ২৫।৩০ টাকা পর্য্যন্ত দৈনিক ভাড়া স্থির হয়। এক দিন কাঠ টানিয়া হাতীগুলি আবার অবস্থানুসারে এক কি দুই দিন বিশ্রাম পায়।

আমি কৈলাস সহরে এইরূপ একটি 'ভাগী' হাতী দেখিয়াছিলাম। শুধু গাছটানা কার্য্যে সে তাহার প্রভুদের ৩৫।৩৬ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার শেষ জীবনে, একটী গাছ পড়িয়া তাহার একখানা পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আমি যখন উহাকে দেখিয়াছিলাম, তখন সে ভাল হইয়াছে, কিন্তু পা খানা খোঁড়া হইয়া গিয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও সে ছোট ছোট গাছ টানিয়া দৈনিক ৭।৮ টাকা উপার্জ্জন করিত।

ভাটীর আচার্য সংগ্রহ

বড় বড় গাছ কাটিয়া মাটিতে ফেলিলে উহা যত মুঠ উঁচু হইবে, হাতীর মালিক ভাড়াও সেই হিসাবে পাইবে। মোট কথা, বৃক্ষের ব্যাস অনুযায়ী ভাড়া নিরূপিত হইয়া থাকে। আমি নিজেও হাতী দিয়া এইরূপে গাছ টানাইয়া দেখিয়াছি। অতি সুকৌশলে ইহারা পাহাড়ের উঁচু নীচু স্থান ডিঙ্গাইয়া অসমান ভূমির উপর দিয়া এবং কোন খাল নালা থাকিলে তাহা পার করিয়া, বড় বড় গাছ টানিয়া বাহির করে। ইহাকে ঐ সব দেশে 'রুক্ টানা' বলে। বলা বাহুল্য, ঐ সব গাছের নীচে 'গড়িয়া' বা 'গড়া' দিয়া লইতে হয়। গাছের একপ্রান্তে ছিদ্র করিয়া, কাছি দিয়া হাতীর গলার সঙ্গে উহা বাঁধিয়া দিতে হয়। সুশিক্ষিত গাছ-টানা হাতী এমন কৌশলে আস্তে আস্তে কাঠ টানিয়া বাহির করে যে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যদি গাছের এক পাশ হইতে টানিয়া উহা নাড়াইতে না পারে, তবে অপর পাশে যাইয়া টান দেয়। এইরূপে একটু একটু করিয়া গাছ সরাইতে থাকে। কোন কোন সময় ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাথা দিয়া ঠেলিয়াও গাছ সরাইয়া ফেলে। এক একটী গাছ পড়িয়া থাকা অবস্থায়, ১৫।২০ মুট পর্য্যন্ত উহার ব্যাস হয় এবং উহার একদিকে দাঁড়াইলে হাতীর পিটের খানিক ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। যাঁহারা রেঙ্গুনে কাঠের কারখানায় (saw-mill) হাতীর কার্য্য দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, হাতীকে আবার শিক্ষা দিলে কেমন বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ জানোয়ার হয়। ঐসব কারখানার কোন কোন শিক্ষিত হাতীর ২৫।৩০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দাম হয়।

খেদা প্রসঙ্গে বিষয়ান্তরে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি। যাহা হউক, খেদার কার্য্যের জন্য গুণানুসারে প্রত্যেক হাতী পিছু ১০০৲ হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক ভাড়া দিতে হয়। যে সমস্ত হাতী কেবল নূতন হাতীর জন্য 'চাড়া' যোগায়, তাহাদের ভাড়া কম ; এবং যেগুলির সাহায্যে হাতী বাঁধা ও স্থানান্তরিত করা

হয়, তাহাদের ভাড়া বেশী। অবসর সময় ইহারাও 'চাড়া' যোগায়। যে হাতীর সাহায্যে বন্য হাতীর পায়ে 'জোড়ন' দিয়া বাঁধা অর্থাৎ 'বাণ্ডাভরা' হয়, তাহাকে 'সিঁড়ির কুন্‌কি' বলে। এই হাতীর পিঠের সঙ্গে একটী দড়ির সিঁড়ি বাঁধা থাকে। হাতীর পায়ে জোড়ন দেওয়ার সময় যদি কখনও কোন বিপদ ঘটিবার মত হয়, তবে ঐ সিঁড়ি দিয়া অতি দ্রুত হাতীর উপরে উঠা যায়। এই হাতীগুলি খুব শিক্ষিত বলিয়া, উহাদের ভাড়াও খুব বেশী।

যখন আমাদের খেদায়, পাতবেড়ে হাতী পড়িয়াছিল, ও এদিকে কোট প্রস্তুত হইতেছিল, তখন আমি পাতবেড়ের অতি নিকটেই তাঁবু ফেলিয়া কুলিদিগের কার্য্য-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতাম। অনেক সময়ে স্বর্গীয় মহেশ বাবু ও আমি, খেদার জমাদার আহাম্মদ মিঞাকে সঙ্গে লইয়া, পাতবেড়ের ভিতর বহুদূর পর্য্যন্ত, এমন কি যেখানে হাতীর দল থাকিত তাহার অতি নিকটেও যাইতাম। হাতীগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় বনে কিরূপ ভাবে চলা-ফেরা করে এবং পাত-বেড়ে হাতীর সংখ্যা কত, তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও নিরুপণ করিবার চেষ্টা করিতাম। বলা বাহুল্য, আমাদের মধ্যে অন্য কাহাকেও এই কার্য্যে ব্রতী করিতে পারি নাই। আমি চিরকালই কৌতূহলী বিধায় কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়াই যাইতাম। আমাদের আত্মরক্ষার জন্য ১০ ও ১২ নং তুইটী rifle সঙ্গে থাকিত। আহাম্মদ মিঞা যাইবার সময় পথে খুব লেক্‌চার দিয়া, তাহার অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় দিত বটে, কিন্তু দৈবাৎ কোন বিপদ ঘটিলে, পাশ ফিরিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ। একে বেত ও কাঁটালতা বেষ্টিত বনে, নিজের গুরু দেহভার বহন করাই আমার পক্ষে কষ্টকর; তার উপর হাতে আবার ৭।৮ সের ওজনের একটী বন্দুক। কেবল আমি যাতিকগ্রস্ত বলিয়াই ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল। আমরা এক এক সময় হাতীর দলের এত নিকটে

গিয়া পড়িয়াছি যে, উহাদের শাবকগুলিকে মাতার স্তন্য পান করিতে পর্য্যন্ত দেখিয়াছি! দুই একবার গিয়াই যেন সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। একবার একটা হাতী আমার এত নিকট দিয়া দৌড়াইয়া গিয়াছিল যে, শুঁড় বাড়াইলেই আমাকে ধরিতে পারিত। আমি একটা গাছের পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম; বোধ করি আমাকেও বৃক্ষবিশেষ মনে করিয়াই কিছু বলে নাই। পূর্ব্ব হইতে এইরূপ উপদিষ্ট না হইলে, হয়ত আমি উত্তেজনার বশে গুলি করিয়া বসিতাম। যদিও আমি এইরূপ করিয়াছিলাম, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার করিলে, কোন ভদ্রলোকের অনাবশ্যক এতটা risk না লওয়াই. ভাল।

কোট প্রস্তুত শেষ হওয়া মাত্রই, হাতী তাড়াইয়া কোটে ফেলিবার একটী দিন স্থির করা হয়। ইহাকে হাতী ডাকান (driving) বলে। হাতা ডাকাইবার দিন প্রাতে, অথবা তৎপূর্ব্ব দিন সমস্ত কুলি প্রভৃতি মিলিয়া খোদার সিন্নি দেয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একটী খেদা করিতে হইলে সর্ব্ব-সাকুল্যে ৩০০ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত লোকের আবশ্যক হয়। ইহার অর্দ্ধেক কি কিছু কম লোক, পূর্ব্ববৎ পাত-বেড়ে পাহারায় রাখিয়া, অবশিষ্ট সমস্ত লোক লইয়া জমাদার হাতী ডাকাইতে জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়ে। কোন কোন কোটে সৌভাগ্যক্রমে ২।৩ ঘণ্টার ভিতরই হাতী আসিয়া পড়ে, আবার কোন কোটে সমস্ত দিনও লাগিয়া যায়। কখনও বা হাতী এক দিনে কোটে পড়ে না, পুনঃ পরদিন চেষ্টা করিতে হয়। এমনও হইতে পারে যে, এইরূপ ৩।৪ দিনের চেষ্টায় হাতী কোট দাখিল হয়। বুদ্ধির দোষে উপযুক্ত স্থানে কোট না হইলে উহাতে হাতী পড়ে না; তখন ঐ কোট ভাঙ্গিয়া কোন সুবিধাজনক স্থানে আবার কোট করিতে হয়।

বনে ঢুকিয়াই হৈ চৈ করিয়া হাতী তাড়ান নিয়ম নয়।

অধিকাংশ কুলি দূরে থাকিয়া, প্রথমতঃ অল্প লোক ভিতরে প্রবেশ করে। পাতবেড়ের মধ্যে সমস্ত হাতী একত্র হইয়া থাকে না, বনময় ২।৪টা করিয়া ইচ্ছানুরূপ পৃথকভাবে চরিয়া বেড়ায়। প্রথমতঃ ঐ সব হাতীর পিছনে ৫।৭ জন গিয়া, অতি সাধারণভাবে তাড়া দিলেই, উহারা দৌড়াইয়া যাইয়া অন্যগুলির সহিত মিলিত হয়। এইরূপ তাড়া খাইতে খাইতে ক্রমে সবগুলি মিলিয়া একটি বড় দলের সৃষ্টি হয়। পাতবেড়ের সবগুলি হাতীকে এইভাবে একত্র করিয়া অন্যান্য দিক হইতে আন্নির মুখের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যায়। এই সময় সবগুলি হাতী একত্র হইলে দলও যেমন পুষ্ট হয়, তাড়াইতেও তেমনি বেশী লোকের আবশ্যক হয়। এইরূপে তাড়াইয়া হাতীগুলিকে আন্নির মুখ বরাবর করিয়াই, সকলে মিলিয়া পিছন ও উভয় পার্শ্ব হইতে ভয়ানক কোলাহল ও বন্দুকের দেওর করিতে থাকে; হাতীগুলি তখন অত্যন্ত ভীত হইয়া ক্রমাগত সম্মুখের দিকে দৌড়াইতে থাকে। হাতী এইরূপে আন্নিতে প্রবেশ করিলেই, পিছনে বন্দুক আওয়াজ করিয়া বাজি পোড়াইয়া এত জোরে হাকোয়া দেয় যে, তখন দুদিকের সাদা কাপড় ও তাহার পশ্চাতে ফাঁকা স্থান দেখিয়া, ঐ সব স্থানে জঙ্গল নাই মনে করিয়াই হউক, অথবা অন্য যে কারণেই হউক, ভয় পাইয়া সম্মুখের দিকে দৌড়ইাতে থাকে। এইরূপে আরও খানিক অগ্রসর হইয়া আন্নির বেড়ার মধ্যে প্রবেশ করিলে দুই পার্শ্বে বাধা পাইয়া ক্রমে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়।

পূর্ব্ব হইতেই আন্নির মধ্যে খানিক দূরে দূরে শুক্‌না জঙ্গল ও খড় দিয়া, দুই তিনটা fire লাইন করিয়া, মধ্যে মধ্যে ২।৩ আটি কাঁচা বাঁশ পুতিয়া তাহা খড় কুটা দিয়া ঢাকিয়া থাকে এবং প্রত্যেক লাইনের উভয় পার্শ্বে আন্নির বাহিরে, দুইজন করিয়া লোক দিয়াসলাই হাতে খুব সাবধানে নিঃশব্দে বসিয়া থাকে। হাতী তাহাদের লাইন

অতিক্রম করিলেই উভয় পার্শ্বে আগুন ধরাইয়া দেয়। একে হাতী-গুলি পিছনের তাড়ায় ভীত হইয়া দৌড়াইয়া আইসে, তাহার পর আবার পশ্চাৎ দিকে হঠাৎ এই অগ্নিকাণ্ডে ও কাঁচা বাঁশ ফুটার শব্দে, আরও ঊর্দ্ধশ্বাসে সম্মুখের দিকে দৌড়ায়। এইরূপে ক্রমে ২।৩টী fire লাইন হইতে তাড়া খাইয়া, একেবারে দরজার মুখে উপস্থিত হয় এবং ২।১টী করিয়া কোটে প্রবেশ করিতে থাকে। কোন কোন সময় আবার এত জোরে rush করে যে, কাহার গায়ে কে পড়ে তাহার ঠিক্ থাকে না।

কোটের দ্বারের নিকটবর্ত্তী কোন গাছে, অতি সঙ্গোপণে একজন, ও ঝাপের কাছি যে গাছে বাঁধা থাকে তথায় দা হাতে অপর একজন লোক বসিয়া থাকে। কোটে হাতী প্রবেশ করিবামাত্রই বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি হুইসিল দিয়া বা অন্যকোন রূপে ইঙ্গিত করিলেই অপর লোকটি কাছি কাটিয়া দেয়; সঙ্গে সঙ্গে দরজা বা ঝাঁপ পড়িয়া যায়। ঝাঁপ পড়িবামাত্র বহু লোক আসিয়া ঝাঁপের বাহিরের দিকে আরও কয়েকটী নূতন খুঁটী পুতিয়া দড়ি দিয়া বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলে এবং কোটেরও চতুর্দ্দিক অন্যান্য কুলিরা যতদূর সম্ভব তাড়া-তাড়ি আসিয়া ঘেরাও করে। হাতীগুলি কোটে পড়িয়াই ভিতরে জঙ্গল থাকায় অবরুদ্ধ হইল কি না প্রথম প্রথম বুঝিতে পারে না, ২।১ মিনিটের মধ্যে জঙ্গল দলিত হইয়া গেলেও চতুর্দ্দিকের বেড়ায় ক্রমাগত বাঁধা পাইয়া তখন নিজেদের শোচনীয় পরিণাম বুঝিতে পারে।

হাতী ডাকাইবার সময়, আমি কোটের নিকট গাছে মাচা বাঁধা-ইয়া ইহাদের গতিবিধি ও কিরূপে তাড়িত হইয়া আসিয়া কোটে পড়ে, তাহা ২।৩ বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যখন ইহারা ভীত চকিত ভাবে চতুর্দ্দিকে চাহিতে চাহিতে আসিতে থাকে এবং অনিচ্ছায় যাইতেছে বলিয়া, এক একবার হট্ করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া ফিরিয়া

দাঁড়ায় তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এত বাজি ও বন্দুকের শব্দ এবং লোকজনের সোরগোলের মধ্যেও যদি কোন শাবক পশ্চাতে পড়িয়া চীৎকার করে তবে ঐ সমস্ত বাঁধা বিঘ্ন হেলায় উপেক্ষা করিয়া সমস্তগুলিই ফিরিয়া যায়। তখন পুনরায় অতি সাবধানে তাড়াইয়া আনিতে হয়। এমনও হইতে পারে যে সেদিন আর হাতী কোটে আনা যায় না। হয়ত পরদিন কোটে পড়ে, কি অবস্থানুসারে ২।১ দিন বিলম্বও হয়।

কয়েকবার খেদার কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনার ফলে, আমার এই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে পাতবেড়ের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ-শীল হস্তীগুলিকে একত্রিত করিয়া আন্নিমুখা করাই সর্ব্বাপেক্ষা বাহাদুরীর কাজ। প্রধানতঃ পাঞ্জালীগণই এই কার্য্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। তৎপরেই fire line গুলির প্রান্তস্থিত লোকদিগের কার্য্যতৎপরতাও কম বাহাদুরীর বিষয় নহে। হাতী কোটে প্রবেশ করিলে ঝাঁপ কাটিবার ভার যাহার উপর ন্যাস্ত থাকে তাহার কার্য্যও যথেষ্ট প্রশংসনীয়। কারণ খেদানাট্যের শেষ অঙ্কের যবনিকা পতনের ভার তাহার কৃতিত্বের উপরই নির্ভর করে যেহেতু, দলে অনুমান কতকগুলি হাতী আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি কোটে প্রবেশ করিয়াছে, ও কতকগুলি বা বাহিরে আছে এবং বাহিরের গুলি কোটে ঢুকিতে ঢুকিতে ভিতরের গুলির কোটের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া গত্যন্তর অভাবে পুনঃ বাহির হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে কি না, প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া উহাকে উপযুক্ত সময়ে ঝাঁপ ফেলিবার ইঙ্গিত করিতে হয়।

কোটে পড়িয়া হাতীগুলি অবরুদ্ধ হইয়াছে টের পাইলেই ইহারা কোটের দরজার উপর ক্রমাগত তাল ঠুকিয়া গিয়া ধাক্কা মারে এবং বৃহৎ বৃহৎ পেরেগে আহত হইয়া ফিরিয়া আইসে ও ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে করিতে কোটের নানাস্থানে ধাক্কা মারিতে থাকে। হাতী-

গুলি কোটের উপর যত জোর করিতে থাকে, বাহিরের লোকদ্বারাও বল্লমের বা জ্যাঠার আঘাতে ততই জর্জ্জরিত হইতে থাকে। কোন সময় বেশী জোর করিলে উহাদিগকে আগুনের মশাল দেখাইয়া ও ছর্‌রা মারিয়া নিরস্ত করিতে হয়। সাধারণতঃ দিনে কতকটা ঠাণ্ডা হইয়া থাকিলেও রাত্রিতেই ইহারা বেশী জোর করে সেই সময় খুব সাবধানে থাকিতে হয়।

কোট দাখিলের পর, খুব সাবধানে কোট রক্ষা করিতে না পারিলে, কোট ভাঙ্গিয়া সমস্ত হাতী চলিয়া গিয়াছে এমনও শুনা যায়। দুই কারণেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কখনও যদি কোটে অতি প্রকাণ্ড দুর্দ্দমনীয় গুণ্ডা পড়ে, অথচ কোট অপেক্ষাকৃত কম মজবুৎ হয়, তবে ছর্‌রা প্রভৃতির কোন বাধাবিঘ্ন না মানিয়া জোর করিয়া কোট ভাঙ্গিয়া সমস্ত হাতীসহ বাহির হইয়া যায়। অপর কারণ, যদি দলের কোন গুণ্ডা কোটে না পড়িয়া বাহিরে থাকিয়া যায়, তাহা হইলে সেও আসিয়া বাহির হইতেই কোট ভাঙ্গিয়া দলস্থ অবরুদ্ধ হাতীগুলিকে মুক্ত করে। আমি এই উভয় অবস্থাই সংঘটিত হইতে দেখিয়াছি ; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কোন স্থানেই ইহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

চেলা পাহাড়ে স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্তের খেদায় হাতী কোটে পড়িলে, বাহির হইতে একটা প্রকাণ্ড গুণ্ডা আসিয়া, ভয়ানক উপদ্রব করিতেছিল ও কোট ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছিল। সৌভাগ্য যে সে পালিতা একটি হস্তিনীর উপর আসক্ত হইয়া পড়ায়, প্রথমতঃ তাহাকে 'পরতাল।' করিয়া ধরিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দেখা গেল গুণ্ডাটী উহার নব প্রণয়িনী ব্যতীত অন্য কোন হাতীকে নিকটে ঘেঁসিতে দেয় না। তখন আর এক ফন্দী করা হইল। খুব মজবুৎ ও ছোট করিয়া একটী কোট বাঁধিয়া ঐ হস্তিনীকে উহার ভিতর রাখা হইল। উহাতে বেশ সুফল ফলিল। খাণিকক্ষণ চারিদিকে

ঘুরাফেরা করিয়া কামান্ধ লম্পট স্বেচ্ছায় আসিয়া কোটে অবরুদ্ধ হইল। গুণ্ডাটি এতই বদমায়েস ছিল যে উহাকে সায়েস্তা করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল এবং পালিতাবস্থায়ও পরেও উহার বদমায়েসী দূর হয় নাই। এই ফন্দীতে ধরা না পড়িলে হয় কোট ভাঙ্গিয়া অপর হাতীগুলিকে বাহির করিয়া আনিত অথবা উহাকে মারিয়া ফেলিতে হইত।

এইরূপে আমাদের নিজেদের খেদায় ধৃত প্রকাণ্ড গুণ্ডাটিও যে ভাবে দুর্দ্দমনীয় হইয়া স্বেচ্ছায় আত্মবলি দিয়াছিল, তাহার বিবরণ পরে দিব।

হাতী কোট দাখিল হইয়া গেলেই পোষা হাতী বা কুলিদ্বারা উহাদের আহার্য্য সংগ্রহ করাইতে হয়। পানীয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কোট ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে বলিয়া এবং ক্রোধে ও ক্ষোভে, ইহারা কিছুকাল পানীয় বা আহার্য্য কিছুই স্পর্শ করে না। কোটের মধ্যে যে সকল বৃহদাকারের নরগুণ্ডা পড়ে তাহাদের মধ্যে ২।১টা এত বদ প্রকৃতির থাকে যে, তাহারা আহার ত করেই না, অধিকন্তু দলস্থিত যাহাকেই পায় তাহাকেই মারিতে থাকে।

একবার আমাদের খেদায় একটী 'ম্যানা' বাচ্ছাকে, ঐরূপ একটা গুণ্ডায় মারিতে মারিতে, একেবারে মারিয়াই ফেলিয়াছিল। তারপর একটী বড় কুন্‌কিকেও প্রায় অর্দ্ধমৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। কেন যে ইহাদের উপর গুণ্ডাটার এত আক্রোশ হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এই দুর্দ্ধর্ষ প্রকাণ্ড গুণ্ডাটীকে কিছুতেই বাঁধা যাইতেছিল না। যখন একেবারে অদম্য হইয়া উঠিল, তখন আর এক ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল।

আমরা তামাসা দেখিবার জন্য কোটের বাহিরের দিকে দুইটী মাচা প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। আমি যে মাচায় ছিলাম, গুণ্ডাটী

একবার তাহার সম্মুখে আসিয়া ক্রমাগত charge করিতে আরম্ভ করিল ও 'ম্যানাটীকে' দাঁত দিয়া তুলিয়া বার বার আমার দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অবশেষে উহার উপর দাঁড়াইয়া, সম্মুখের দুই পা কোটের আড়ার উপর তুলিয়া দিয়া, এত জোরে ধাক্কা মারিতে লাগিল যে, কোটের কাঠ মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া যায় দেখিয়া, আমি উহার মথায় ক্রমাগত ছর্‌রা মারিতেছিলাম কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত করিতে পারিতেছিলাম না। হাতীর শুঁড় ও আমার মধ্যে মাত্র ২।১ হাত ব্যবধান ছিল। তখন কোট ভাঙ্গিয়া গেলে, মুহূর্ত্ত মধ্যে হয়ত আমার অস্তিত্ব লোপ হইয়া যাইত। আমার যে এইরূপ Critical moment উপস্থিত হইয়াছে, উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া আমি তাহা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। হঠাৎ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া মনুবাবুর হস্তস্থিত ১০নং rifleএর এক সাংঘাতিক গুলি উহার গ্রীবাদেশ বিদ্ধ করিল ; সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডাটীও উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। হাতী যে এত সহজে এইভাবে উল্টাইয়া পড়িতে পারে, ইতিপূর্ব্বে তাহা আমার ধারণাই ছিল না। হাতীটা পড়িয়া গিয়াই অতিকষ্টে একবার উঠিয়া দাঁড়াইল। তখনই আবার ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেল। ইহার পর অন্যান্য হাতীগুলিকে বন্ধন করিতে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় নাই।

গুণ্ডাটীকে তখন না মারিলে, আমার বিপদ অনিবার্য্য ছিল ; তথাপি এই সুদর্শন ঐরাবত সদৃশ গুণ্ডাকে ধরিতে পারিলে, আমাদের সমস্ত কষ্ট সার্থকজ্ঞান করিতাম। ইহার মৃত্যুতে তখন সত্যই যেন নিজের বিপদ ভুলিয়া গিয়া অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার মনে তখন কেবল অধঃপতিত পরাধীন জাতির উপর অত্যন্ত ধিক্কার উপস্থিত হইতেছিল। বনের পশু হইয়া সসম্মানে

হেলায় মৃত্যুকে বরণ করিল তবু অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিল না। কবি যথার্থই গাহিয়াছেন :—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায়॥

ইহার পর কোট খালাস অর্থাৎ কোট হইতে হাতী বান্ধিয়া বাহির করিবার পালা। কোটের একদিকের ৫।৬টি খুঁটি কাটিয়া একটী হাতী অতি কষ্টে প্রবেশ করিতে পারে, এইরূপ ফাঁক করিতে হয়। তৎপর ঐ পথে একটির পর একটি করিয়া পোষাহাতী পিছাইতে পিছাইতে কোটে প্রবেশ করে ও নূতন হাতীরদিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়ায়, বোধ হয় উদ্দেশ্য এই যে যদি কোন বন্য হস্তী ইহাদিগকে আক্রমণ করে, তবে পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণ করিলে তত বিপদের আশঙ্কা থাকে না এবং মাহুতগণও একটু দূরে থাকে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে কোটে ঢুকিলে মাহুতও নূতন হাতীর ব্যবধান অত্যন্ত কম হওয়ায়, আশঙ্কাও বেশী থাকে। কখনও কখনও পালিত হস্তী অপেক্ষা বন্যহস্তীগুলিকে অধিকতর বলশালী মনে করিলে, কোটের বাহিরে আর একটি ছোট কোট তৈয়ার করিয়া, তাহাতে প্রথমত পোষাহাতী ঢুকাইয়া পরে বড় কোটের খুঁটি কাটিয়া, উহাতে পূর্ব্বোক্তরূপে হাতী প্রবেশ করান হয়। হাতীগুলি পিছন ফিরিয়া কোটে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইলেই মাহুতগণও পাছ ফিরিয়া জ্যাঠা বা বল্লম ধরিয়া রাখে, যেন কোন হাতী আক্রমণের চেষ্টা করিলেই তাহাকে বাধা দিতে পারে। কিন্তু আবার কোটের হাতী অপেক্ষা পোষা হাতী আকারে বড় ও বলিষ্ঠ হইলে পিছন ফিরিয়া প্রবেশ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। সোজাসুজি ঢুকিয়াই সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এই সব পোষা হাতীগুলিও এমন

শিক্ষিত যে চালকের ইঙ্গিত মাত্র নূতন হাতীকে আক্রমণ করে।

এইরূপে যদি ২।৪ ঘা মারিয়া ও তদুপরি মাহুতের বল্লমের আঘাতে ইহাদিগকে দমাইতে পারে, তবে সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। বড় বড় নরগুণ্ডা থাকিলে তাহাদিগকে না বাঁধা পর্য্যন্ত এইভাবে কাজ চলে না।

প্রত্যেক হাতী বাঁধিবার সময় দুইটি পোষা হাতী দিয়া উহাদের পার্শ্বদেশ চাপিয়া রাখিতে হয়। দুই চার বার কোটের কাজ করিলেই ইহারা এমন শিক্ষিত হইয়া উঠে যে, মাহুতের হাতের ও পায়ের টিপেই (ইঙ্গিতেই) কখনও পিছু হটিয়া, কখনও বা পার্শ্বে গিয়া তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করে। এইরূপে নূতন হাতীকে চাপিয়া রাখিয়া, সিঁড়ির কুন্‌কীর (যে হাতীতে দড়ির সিঁড়ি বাঁধা থাকে) উপর হইতে দাইদার নামিয়া আসিয়া উহার পিছনের পায়ে বাণ্ডা বা যোড়ন বাঁধিয়া ফেলে এবং তাহার সহিত মোটা মোটা ডোল অর্থাৎ কাছি লাগাইয়া গাছ বা কোটের খুটির সহিত বাঁধে। এইরূপে একটির পর একটি করিয়া হাতী বাঁধিতে থাকে। পোষা-হাতীর সংখ্যা বেশী থাকিলে একসঙ্গে ২।৩টিও বাঁধা হইতে থাকে। কিন্তু দাইদার প্রথমে একটি না বাঁধিলে অন্য কেহ বাঁধা সুরু করে না। ইহাই ইহাদের professional etiquette. সিঁড়ির কুন্‌কীগুলি এতই শিক্ষিত হয় যে, অনেক সময় ষ্টিমার পাড়ে ভিড়িবার মত, অন্য হাতীর সঙ্গে পাশে সরিয়া সরিয়া ভিড়িয়া যায়। কখনও বা পা তুলিয়া কি পা আড় করিয়া রাখিয়া, কখনও বা শুঁড় দিয়া দাইদার বা মাহুতকে নূতন হাতীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে।

দাইদারগণ খেদার সময় বন্যহস্তির বণ্ডা, পরতালা করে এবং অন্য সময় হাতীর চিকিৎসা করে বলিয়া মাতঙ্গশ্রেণীর মধ্যে ইহারা

বিশেষ সম্মানিত। মাহুৎদের কাজ হইতে ক্রমোন্নিত হইয়া ইহারা দাইদার হয়।

এইরূপে কোটের সমস্ত হাতী বাঁধা হইয়া গেলে, প্রত্যেক নূতন হাতীর অবস্থা বিবেচনায় কাহাকেও দুইটি, কাহাকেও বা তিন চারটি, আবার খুব বড় বড় নরগুণ্ডা হইলে ছয়টি হইতে আটটি পর্য্যন্ত পোষা হাতীর সঙ্গে বাঁধিয়া কোট হইতে বাহির করিতে হয়। বাহির করিবার সময় যে রাস্তাদিয়া হাতী কোটে প্রবেশ করে তাহার আরও কয়েকটি খুটি কাটিয়া রাস্তা প্রশস্ত করিয়া লইতে হয়।

এখানে বোধ হয় একটি কথা বলা অপ্রাসাঙ্গিক হইবে না যে, রুচি দ্বারাই মানুষের দেবত্ব ও প্রেতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের অন্যান্য কুলীদের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু খেদার কুলীরা এক একটি নরপ্রেত বিশেষ। ইহারা অতি কদর্য্য চাউলের ভাত ও ক্ষুদ্র চিংড়িমাছের স্থট্‌কী (dry fish) সম্মুখস্থিত অগ্নিকুণ্ডে অৰ্দ্ধদগ্ধ করিয়া নুন্ ও শুখ্‌না লঙ্কা সহযোগে অতি উপাদেয় আহার্য্য জ্ঞানে খাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করে। তখন উহাদের নিকট নাকে কাপড় না দিয়া যাওয়া কঠিন। যখন মাছগুলিকে দগ্ধ করিতে থাকে, তখন তাহার দুর্গন্ধে অৰ্দ্ধ মাইলের মধ্যেও তিষ্ঠান একরূপ দায় হইয়া উঠে।

আমাদের খেদায় আর একটি অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়াছি। হাতী কোট খালাস হইবার অব্যবহিত পরেই, কোথা হইতে দলে দলে টিপ্‌রা ও কুকী (পাৰ্ব্বত্য জাতিবিশেষ) আসিয়া পূর্ব্বোক্ত মৃত হস্তী দুইটিকে ঘণ্টা দুই তিনের মধ্যেই খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহাদের পৃষ্ঠস্থিত ঝুড়ি (Basket এই ঝুড়িকে ইহারা 'খারা' বলে। ইহা উহারা মাথার সঙ্গে আট্‌কাইয়া পিঠের উপর ঝুলাইয়া রাখে) ভরিয়া লইয়া গেল। ইহারা এত ত্রস্ত হইয়া এই কার্য্য শেষ করিল
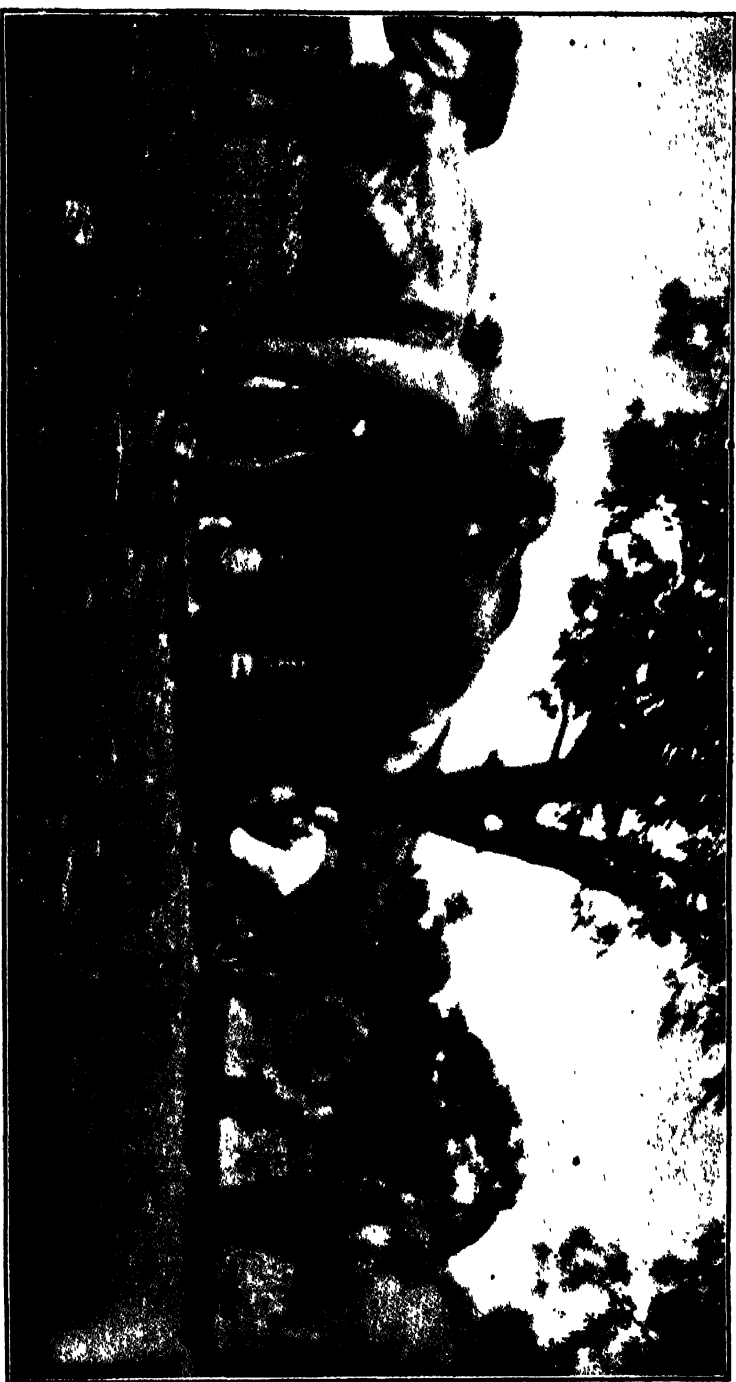
নূতন হাতীকে বাঁধখোল করা হইতেছে

যে আমাদের কুলীদ্বারা ইহা করাইতে হইলে দুই দিনের কমে হইত না। হাতীর মাংস নাকি ইহাদের অতি প্রিয় খাদ্য।

নূতন হাতীগুলিকে কোট হইতে বাহির করিবার সময় উহারা যেরূপ টানা হ্যাচড়া ও বিক্রম প্রকাশ করে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বুঝা কঠিন। কোন কোনটা কোট হইতে বাহির হইয়াই এক এক দিকে এমন গোঁ ধরে যে, ইহার সহিত জোড়ন দেওয়া পালিত হস্তি-গুলিকে যেন সঙ্গে সঙ্গে উড়াইয়া লইয়া চলে। কিছুক্ষণ পরে আবার পোষাহাতীগুলি মাহুতের সাহায্যে উহাকে টানিয়া ফিরাইয়া আনে। এইরূপে টানাটানি করিয়া কোন সুবিধাজনক স্থানে আনিয়া, দুইটি মোটা গাছের মাঝে দাঁড় করাইয়া আগা পাছা বাঁধিয়া ফেলে এবং পোষাহাতীগুলিকে তখন ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য গাছের সহিত এইরূপে বদ্ধাবস্থায়ও নূতন হাতীগুলি অবিশ্রান্ত টানাটানি করিতে থাকে। ইহারা এক একবার ঝুঁকিয়া এত জোরে টান দেয় যে, মনে হয় যেন কাছিগুলি তখনই ছিঁড়িয়া যাইবে। প্রথমদিন ইহাদিগকে ঐখানেই চারা দেওয়া হয়। পরদিন পুনরায় পোষাহাতীর সাহায্যে উহাদিগকে গাছ হইতে খুলিয়া, কোন খাল বা ডোবায় স্নান করাইয়া সম্ভবমত দূরে স্থানান্তরিত করা হয়। ইহাকে হাতীর 'বাঁধ-খোল' করা বলে। এইরূপে দুই তিন দিন বাঁধ-খোল করিবার পর হাতীগুলির গলায় ও পায়ে দড়ির টানে ঘা হইয়া উহারা এমন জব্দ হইয়া পড়ে যে, তখন কোন কোন সময় অবস্থা বিবেচনায় একটি পোষা হাতী দিয়া দুই পাশে দুইটি পর্য্যন্ত নূতন হাতীকে বাঁধিয়া নেওয়া চলে। তখন আর ইহারা বিশেষ কোন গোলমাল করে না।

ইহার পর এইরূপে ক্রমে ইহারা নিলামের স্থানে নীত হয়। তখন রাজকর্ম্মচারীগণ নূতন হাতীর 'আয়না' প্রস্তুত করেন অর্থাৎ প্রত্যেক হাতীর একএকটি নাম রাখিয়া উহারা কোন্ শ্রেণীর, কি

পরিমাপের এবং কি কি দোষগুণ বিশিষ্ট এইসকল বিবরণ লিষ্ট্ ভুক্ত করেন। আয়নাতে যেমন সমস্ত জিনিষের প্রতিবিম্ব পরিষ্কার দেখা যায়, এই লিষ্ট্ দৃষ্টেও হাতীর সমস্ত বিবরণ স্পষ্ট বুঝা যায়, এই জন্যই বোধ হয় এই কার্য্যের 'আয়না' নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর নিলামে হাতীগুলিকে সর্ব্বোচ্চ ডাকে বিক্রয় করা হয়।

বাংরি খেদা

পূর্ব্বে যে খেদার বিবরণ দেওয়া হইল, ইহার সহিত বাংরি খেদার পার্থক্য এই যে ইহাতে পাতবেড় দেওয়ার দরকার হয় না এবং এই জন্য লোকও খুব কম লাগে। অবস্থানুসারে পঞ্চাশ হইতে একশত কি একশত পঁচিশ জন লোক হইলেই চলিতে পারে।

পাঞ্জালা পাঠাইয়া হাতীর গতিবিধি স্থির করিয়া তাহার নিকটেই কোন মূল দোয়ালের (হাতী চলাফেরা করিবার রাস্তাকে দোয়াল বলে) উপর মোটা মোটা খুটি দিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে কোট প্রস্তুত করিতে হয়। মূল দোয়াল হইতে যে সব ছোট খাটদোয়াল (by-lanes) বাহির হয়, তাহার মুখগুলিও কোটের অনুরূপ মোটা মোটা কাঠের বেড়া দিয়া আটকাইয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক বেড়ায় নিকট দুই একজন করিয়া লোক গাছে উঠিয়া পাহারা দেয়। অবস্থা বিবেচনায় কোন কোন স্থানে বেড়া না দিলেও চলে।

কোট তৈয়ার হইয়া গেলেই অধিক সংখ্যক লোক হাতী হাকোয়া (drive) করিতে যায়। ইহাকে সিলেটীরা হাতী 'ডেকান' বলে। ইহাতে ৭।৮ কি ১০ মাইল দূর হইতেও হাতী হাকাইয়া আনিয়া কোটে ফেলিতে হয়। কোন কোন সময় ৪।৫ দিন কি

ধরা পড়িবার ৫।৬ দিন পরে দুইটি নূতন হাতীকে একটি পোষা হাতী দ্বারা টানিয়া লওয়া হইতেছে,

ততোধিক সময়ও লাগিয়া যায়। আবার কখন কখন ২।১ দিনেই কোট দাখিল হয়।

হাতীগুলিকে পিছন হইতে তাড়াকরিলে উহারা দোয়াল দিয়া ক্রমাগত সম্মুখের দিকে চলিতে থাকে। দক্ষিণে ও বামে যে সকল ছোট ছোট রাস্তা থাকে তাহাতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে, ঐ সমস্ত বেড়া ও পাহারার লোক দ্বারা বাঁধা পাইয়া মূল দোয়াল ধরিয়াই অগ্রসর হইতে থাকে। এইরূপে আন্নির ভিতর প্রবেশ করিলে, বহুলোক একত্র হইয়া তাড়াইয়া ইহাদিগকে কোট দাখিল করে।

ধর্ম্মকোট

উপরে যে কোটের বর্ণনা করিয়াছি, তাহা ছাড়া আর এক প্রণালীর কোট আছে তাহাকে 'ধর্ম্মকোট' বলে। ইহাতে ২৫।৩০ জন লোকের অধিক আবশ্যক হয় না এবং খরচও খুব কম। পাহাড়ের স্থানে স্থানে খোল অর্থাৎ গর্ত্তের মধ্যে লোনামাটি আছে, বন্য হস্তীরা নুণ খুব ভালবাসে বলিয়াও বটে এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও, অমাবস্যা পূর্ণিমাতে ঐ সব স্থানে লোনামাটি খাইতে যায়। সচরাচর বন্যহস্তীগণ দুই পাহাড়ের মধ্যস্থিত ফাঁকা স্থান দিয়া যাতায়াত করে এবং কোন শৃঙ্গ পার হইতে হইলে দোয়াল ধরিয়াই পার হয়। ইচ্ছা করিলেও যেদিক সেদিক দিয়া যাইতে পরে না এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত যাইতে ইচ্ছাও করে না।

ধর্ম্মকোট করিতে হইলে প্রথম পাঞ্জালী দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়া যে সব স্থানে হাতীগুলি নুণ খাইতে যায় তাহা স্থির করিতে হয়। ঐরূপ চলাফেরার রাস্তায় কোন দুইটী উচ্চপাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী নিম্ন

স্থানের দুই মুখে, রাস্তার পরিসর অনুরূপ দুইটী দরজা খুব মজবুত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। অবশ্য ইহার জন্য অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত স্থান নির্ব্বাচন করাই সঙ্গত, স্থূলকথা স্থানটী সঙ্কীর্ণ ও উহার উভয় পার্শ্বে খাড়া পাহাড় থাকা আবশ্যক, যেন উহার মধ্যে হাতী পড়িলে দুইদিকের পাহাড়ে উঠিতে না পারে। ঐ সঙ্কীর্ণ স্থানের দুই দিকের দরজা, দুইটী কুলীর সাহায্যে উপরে ঝুলাইয়া fit করিতে হয় এবং ২৪ ঘণ্টাই তথায় সতর্ক প্রহরী রাখিতে হয়। দৈবাৎ কপাল-গুণে হাতী দলবদ্ধ হইয়া উহার যে কোন রাস্তা দিয়া নুণ খাইতে যাইবার সময় ভিতরে প্রবেশ করিলেই উপর হইতে ঝুলান দরজার দড়ি কাটিয়া দিতে হয়। একদিকে দরজা পড়িলেই অপরদিকের দরজাও তখনই ফেলিয়া দেয়। ইহাতে ২।৪টী অথবা সময় সময় ১০।১৫টী হাতীও একেবারে পড়িতে পারে। যে কয়টিই পড়ুক, তাহাই পূর্ব্বলিখিত উপায়ে বাহির করিয়া পুনঃ দরজা মেরামত করিয়া উঠাইয়া রাখিতে হয়। এই প্রণালীতে বৎসরেয় মধ্যে দুই তিন বারও হাতী ধরা চলে। কিন্তু কোন কারণে লোকজনের ও দরজা ইত্যাদি প্রস্তুতের শব্দ টের পাইলে হাতী আর ঐ পথে বড় আসে না।

এই প্রণালীর খেদায় স্বেচ্ছামত হাতীর দলকে আটকান যায় না। কাযেই ইহার ফলও বড় অনিশ্চিত। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় বলিয়া ইহাকে ধর্ম্মকোট বলে।

ফাঁসি শিকার

সাধারণতঃ ৭ফিটের অধিক উচ্চ হাতীতে ফাঁসি দিয়া ধরা যায় না। গেলেও অত্যন্ত কঠিন। বন্যহস্তীগণ পাহাড়ের উপর সমভূমিতে (table land) বিচরণ করিবার সময় অথবা শস্যাদির

লোভে যখন নিম্নভূমিতে নামিয়া আইসে তখন দাইদার ও সুদক্ষ মাহুতগণ ৫।৭ কি ১০টি পোষা হাতী লইয়া উহাদিগকে তাড়া দেয়, তাড়া খাইয়া বিশৃঙ্খল অবস্থায় ইতস্ততঃ দৌড়াইবার সময় এক একটি হাতীকে লক্ষ্য করিয়া দুই দুইটি পোষা হাতী পশ্চাদ্ধাবিত হয়, এইসব হাতীগুলি খুব বলশালী ও দ্রুতগতিশীল হওয়া আবশ্যক। যেন জংলিহাতীগুলি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া উদ্ধশ্বাসে দৌড়াইবার সময় উহারাও যাইয়া দৌড়ের প্রতিযোগিতায় তাহা-দিগকে পরাস্ত করিতে পারে। পালিত হস্তী সাধারণতঃ বন্যহস্তীর মত অত বেগে দৌড়াইতে পারে না বলিয়া দাইদার ব্যতীত উহাদের কোমরের উপর এক একজন দোহার বসিয়া লোহাট নামক এক-প্রকার অস্ত্রদ্বারা ক্রমাগত প্রহার করিতে থাকে। লোহাট একপ্রকার বহু পেরেগ বিঁধান কাষ্ঠ খণ্ড। ক্রমাগত আঘাতে পোষা হাতীগুলি প্রাণপণে দৌড়াইয়া গিয়া বন্যহস্তীগুলিকে ধরিবার চেষ্টা করে। পালিত হস্তীদুইটি জংলী হাতীর দুইদিকে ঠিক পাশাপাশি ভিড়িয়া পড়িলেই উপরিস্থিত দাইদার একটি 'ডোল' বা 'দোমা' (মোটা কাছি) জংলীহাতীর মাথার উপর ফেলিয়া দেয়। দোমা মাথায় পড়িবামাত্রই হাতী শুঁড় গুটাইয়া নেয়। ইহাতে সহজেই উহার গলায় ফাঁস আটকাইয়া যায়। একহাতী হইতে ফাঁস লাগাইলে সঙ্গে সঙ্গে অপর হাতী হইতেও ঐরূপ আর একটি ফাঁস দিতে হয়। ইহাকে দোহারকী করা বলে। বলা বাহুল্য যে, দোমার অপর প্রান্ত পোষা হাতীর সঙ্গে বাঁধা থাকে। কোন কোন সময় দোমা মাথায় পড়িবামাত্রই বন্যহস্তী শুড় উল্টাইয়া উহা ঝাড়িয়া ফেলে। তখন চেষ্টা করিয়া পুনরায় দোমা লাগাইতে হয়; কিন্তু হাতীর স্বাভাবিক নিয়মই এই যে, মাথায় দোমা ফেলিলেই শুঁড় গুটাইয়া লয়, কদাচিত দুই একটি শুঁড় উল্টাইয়া দোমা ছিট্‌কাইয়া ফেলিয়া দেয়।

বন্যহস্তীগুলি আকারে ও সামর্থ্যে পোষা হাতীর সমান হইলে, গলায় ফাঁস পড়িবামাত্রই অনেক সময় ঘুরিয়া পোষা হাতীকে আক্রমণ করে, কোন সময় বা টানিয়া ছেঁচড়াইয়া লইয়া যায়। তখন উহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া পাল্টা আক্রমণ করিতে হয়, কাযেই এই সব পোষা হাতীগুলি খুব মা'রখুটে ও বলশালী হওয়া আবশ্যক। কোন কোন সময় দাইদারগণ দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া কোন বড় হাতীকে ফাঁস দিলে, অনেক সময় উহারা পোষাহাতীকে টানিয়া মাটিতে ফেলিয়া মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করে। তখন বাধ্য হইয়াই ফাঁসির দড়ি কাটিয়া দিতে হয়।

বন্যহস্তীর গলায় ফাঁস পরাইয়া দিয়াই সরু দড়ি দিয়া গিরা বাঁধিয়া দিতে হয়। ইহাকে ছরি বাঁধা বলে। অন্যথায় গলায় ফাঁস সাংঘাতিক ভাবে আটকাইয়া নূতন হাতী মরিয়া যায়।

ফাঁসি দিয়া এক একটি হাতী ধরিতে ২।৪ ঘণ্টা বা কখন কখন সমস্তদিনও লাগিয়া যায়। যাবতীয় প্রকারের হাতিধরার মধ্যে—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আমোদজনক।

পরতালা

অনেক সময় কোন নর বা মাকুনা বনেই দলভ্রষ্ট হইয়া বেড়ায়; ইহাদিগকে ফেটো হাতী (solitary elephant) বলে। ইহাদের মেজাজও সাধারণতঃ একটু রুক্ষ হয়। প্রথম প্রথম ইহারা দলেই থাকে, পরে কিন্তু বয়ঃবৃদ্ধির দরুণ দুর্ব্বলতা নিবন্ধন দলের অপর কোন বলবান্ প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দল হইতে বিতাড়িত হইলে, ইহারা ফেটো হইয়া পড়ে। তখন ইহারা আর

হাতী পবতালা করিয়া ধরা হইতেছে

দলে মিশে না, একাকী থাকিতে ভালবাসে। এই জন্যই ইহাদের মেজাজও রুক্ষ হয়।

কখন কখন এই সব নর বা মাক্‌নার মস্তি হইলে, কোন কোনটা পাহাড় ছাড়িয়া নিম্নে সমতল ভূমিতে লোকালয়ে চলিয়া আসিয়া পালিত হস্তিনীর উপর আসক্ত হয়। তখন আর ইহারা লোকজন বা অন্য কিছু গ্রাহ্য করে না। এই অবস্থায় ইহাদিগকে পরতালা করিয়া অর্থাৎ পিছনের পায়ে জোড়ন দিয়া ধরা হয়।

মহিষ ও গবাদি পশুর সহিত ইহাদের প্রাকৃতিক নিয়মের যে একটু বৈষম্য দেখা যায় তাহাই এইস্থানে বলিতেছি। ইহা আমরা বনে উপলব্ধি না করিলেও, আমাদের পালিত হস্তীর পিলখানায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাই।

আমাদের মদ্দা-মাদী সমস্ত হাতীই অবসর সময় হাওড়ে একত্র ছাড়া থাকে বলিয়া উভয়ের সংমিশ্রণে মাদী হাতীগুলি গর্ভবতী হয়। গো-মহিষাদি পশুর স্ত্রী ঋতুমতী হইলে, পুরুষগুলির সম্ভোগেচ্ছা হয়; কিন্তু হস্তী সম্বন্ধে যেন ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। হস্তীর মস্তি হইলে নিঃসৃত মদগন্ধে হস্তিনীরও উপভোগেচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। তখনই হস্তী আসক্ত হইয়া উহার সহিত মিলিত হয়। ইহা উহাদের স্বাভাবিক শক্তিতে বুঝিতে পারে।

বন্য মত্ত হস্তিগুলি কোন পালিত হস্তিনীর প্রতি আসক্ত হইয়া দুই একবার সম্ভোগে পরিতৃপ্ত হয় না। ক্রমাগত ৩।৪ দিন কি আরও দীর্ঘকাল ব্যাপি সম্ভোগে ব্যাপৃত থাকে। তৎপর হস্তিনী ঠাণ্ডা হইয়া গেলে, উহাকে ত্যাগ করিয়া আবার আর একটী গরম হইলে তাহার উপর আসক্ত হয়। এই অবস্থায় ইহার প্রিয়তমা যে দিকে যায়, মূর্খ লম্পটও অন্ধের মত তাহার পশ্চাদনুসরণ করে। তখন পালিত অন্য হস্তিনী দ্বারা উহার আসক্তাকে একটু দূরে সরাইয়া আনিয়া তাহার উপর একজন লোক উঠিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া

উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকে। আসক্ত হস্তী এতই বিভোর হইয়া পড়ে যে এই সকল লোকজন, কি অন্য কোন হাতী নিকটে গেলেও ভ্রূক্ষেপ করে না, কেবল তাহার ধ্যান জ্ঞান তখন ঐ একই হস্তিনীর উপর নিবদ্ধ থাকে। আসক্তা হস্তিনীর উপরও লোক উঠিয়াই এদিক ওদিক ঘুরাইতে থাকে। উদ্দেশ্য হস্তীটির সম্ভোগেচ্ছা বলবতী করা ও উহাকে এইরূপ ২।১ দিন ঘুরাইয়া বিনিদ্র রাখা। অবশ্য এই সময় ৫।৬ ঘণ্টা অন্তর অন্তর মাহুতও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বদলী হয়। ইহাতে হস্তিনীটির দুর্দ্দশাও বড় কম হয় না। এই অবস্থায় সময় সময় হস্তিটীও অতিরিক্ত উত্তেজনার বশে মাহুত উপরে থাকা সত্ত্বেও হস্তিনীতে উপগত হয়। কখন কখনও ইহার ব্যর্থ-স্খলিত বীর্য্যে মাহুতের গাত্র ধৌত হইয়া যায়।

এইরূপে ২।১ দিন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উহাকে বিনিদ্র রাখিতে পারিলে, তখন নিদ্রায় অলস হইয়া পড়ে। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, হস্তিনীর গাত্রে ঠেস দিয়া কি শুঁড় উঠাইয়া দিয়া অকাতরে নিদ্রা যায়। এই অবস্থায় উপনীত হইলে, মাহুত হস্তিনীর সাহায্যে উহাকে টহলাইয়া কোন মোটা গাছের নিকট লইয়া যায়। বলা বাহুল্য সেখানে যাইয়াও ঐরূপে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। ইত্যবসরে দুই পাশে দুইটী কুন্‌কী ও পশ্চাৎ হইতে সিঁড়ির কুন্‌কীতে পরতালা করিবার জন্য দাইদার আসিয়া ভিড়িয়া পড়ে। দাইদার নামিয়াই উহার পিছনের দুই পায়ে বাগুা অর্থাৎ জোড়ন দিয়া এক কি দুইটী ডোল অর্থাৎ কাছি দ্বারা গাছের সহিত বেশ করিয়া বাঁধিয়া ফেলে। যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি দাইদার বন্ধন কার্য্য শেষ করিয়া সিঁড়ির কুন্‌কীতে উঠিয়া ইঙ্গিত করিলেই মাহুতগণ সমস্ত হাতী সরাইয়া লইয়া যায়। মুহূর্ত্ত মধ্যে বায়োস্কোপের ছবির মত উহার সম্মুখ হইতে দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইবামাত্রই, তাহার সেই

নতুন ধরা হাতীকে তিনটি পোষা হাতী দিয়া বাঁধিয়া নিতেছে

মোহ ভাঙ্গিয়া যায়। তখন লাম্পট্যের পরিণাম বুঝিতে পারিয়া ভীষণ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠে। ইহার পর তাড়াতাড়ি করিয়া পায়ে ও গলায় আরও কয়েকটা মোটা কাছি লাগাইয়া দেয়। ইহা শুনিতে যতটা ভয়ানক মনে হয়, বাস্তবিক কার্য্যে তত নহে।

এই হাতী পোষ মানিয়াও তাহার পূর্ব্বের আসক্তা হস্তিনীকে সেম্‌সনের বিশ্বাসঘাতিনী পত্নী ডালিলার মত আর দেখিতে পারে না।

ফাঁদ শিকার

কোন কোন নর গুণ্ডা এত বদমায়েস হয় যে, ইহারা লোক-জন দেখিতে পারে না। মস্তি হইলে আরও ভয়ানক হইয়া উঠে। এক কথায় ইহারা rogue elephants, ইহাদের কাছে মাহুত ঘেঁসিতে পারে না বলিয়া চলা-ফেরা করিবার পথে, বড় বড় মোটা কাছির অনেকগুলি ফাঁদ পাতিয়া তাহা লতা-পাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখে। কাছির অপর প্রান্ত বড় বড় গাছের উপর বাঁধিয়া তথায় এক একজন লোক চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

কোন কোন সময় হাতী আপনা আপনি ঐ সব স্থান দিয়া আইসে। কখনও বা সে সম্ভাবনা না থাকিলে দূর হইতে একজন লোক উহাকে দেখা দিলেই তাহাকে তাড়া করে। লোকটীও তাড়াতাড়ি ঐ স্থানের কোন গাছে উঠিয়া পড়ে। এই ভাবে চলা-ফেরা বা তাড়া করিবার সময় দৈবাধীন কোন ফাঁদে পা দিবামাত্রই গাছের উপরিস্থিত লোক কাছি ধরিয়া টানিলেই উহার পায় ফাঁদ আটকাইয়া যায়; পরে পোষা হাতীর সাহায্যে উহার

গলায় দোমা লাগান হয়। অবশ্য এই প্রণালীতে হাতী খুব কমই ধরা হইয়া থাকে।

গর্ত্ত শিকার (Pit fall)

মহিশূর অঞ্চলে হাতী চলাচলের রাস্তায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত্ত করিয়া তাহার ভিতরে মাঝামাঝি একটা প্রকাণ্ড বিম্ দিয়া উপরে ঘাস ও জঙ্গল লাগাইয়া এমন স্বাভাবিক করিয়া রাখে যে হাতী ঐ সব স্থান দিয়া যাইবার সময় কিছুই টের পায় না। হাতীকে তাড়া করিলেই ঐ রাস্তা দিয়া যাইবার সময় দুই একটী গর্ত্তে পড়িয়া আবদ্ধ হয়। মধ্যে একটী বিম্ থাকার দরুণ খুব উচ্চ হইতে একেবারে না পড়িয়া প্রথম বিমে পড়িয়া পরে মাটিতে পড়ে। এই জন্য অনেক সময় এই প্রণালীতে ধৃত হস্তীর পাঁজরার ২।১ খানা হাড় ভাঙ্গা থাকে, ইহাকে pitfall বলে। আমাদের দেশে এই প্রণালীতে হাতী ধরা হয় না।

হাতী সায়েস্তা

নূতন হাতীকে দড়ি দড়া দিয়া বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া পুরাণ হাতীর সাহায্যে পোষমানানকে হাতী সায়েস্তা বা সারিস্তা করা বলে।

বন্য হস্তীকে যত শীঘ্র সম্ভব সাজে উঠাইয়া সায়েস্তা করা উচিত। বিলম্বে উহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তবে অত্যধিক গরম পড়িলে, একটু ঠাণ্ডা পড়িবার জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, কারণ ইহারা গরম সহ্য করিতে পারে না। একে সদ্য-ধৃত হইয়া নানারূপ জোর-জবরদস্তিতে নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহার উপর আবার অত্যধিক গরমে সায়েস্তার চাপ পড়িলে অনেক সময়ই ইহারা মরিয়া যায়।

ভাঙীর ঘাট

হাতী সায়েস্তার প্রাথমিক কার্য্যকে 'সাজে উঠান' বলে। নূতন হাতীর গলায় দুইটা মোটা কাছি লাগাইয়া উহার উভয় প্রান্ত দুইটি পুরান হাতীর সঙ্গে বাঁধিয়া দিতে হয় এবং উহার পিঠে কতকটা জালের মত করিয়া একটি দড়ির আবরণ আঁটিয়া দিতে হয়, উহাকে 'তামাল বাঁধা' বলে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে নূতন হাতীর শরীরে খুব সুড়সুড়ি থাকে বলিয়া মাহুত পিঠে উঠিলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কাযেই তামালের সাহায্য ভিন্ন মাহুতেরা উহার পিঠে থাকিতে পারে না।

মাহুত উপরে উঠিয়া বসিলেই দুই পাশের হাতী দুইটি, নূতন হাতীকে টানিয়া লইয়া চলে, সেই সময় উপর হইতে মাহুত বাঁশের কানার (পাচন) দিয়া উহার মাথায় খোঁচাইতে খোঁচাইতে 'আগে আগে' অর্থাৎ অগ্রসর হও এই বোল আওড়াইতে থাকে। আবার পুরাতন হাতী থামিলেই ইহাকে মাথায় এক বাড়ি দিয়া 'ধ্যাৎ ধ্যাৎ' অর্থাৎ দাঁড়াও দাঁড়াও, বলিতে থাকে। ডান কি বায়ে উহাকে মোড় ঘুরাইবার সময়—পুরাতন হাতী ঘুরিতেই উপর হইতে মাহুত কাণের পাশে খোঁচা দিয়া 'ছৈা, ছৈ্য' বলে। আবার কখনও পোষা হাতী পিছন হটাইলে উহাকে 'পিচ্ছে পিচ্ছে' বলিয়া শব্দ করে। এইরূপ ঘণ্টাখানেক করিয়া ৪।৫ দিন অভ্যাস করাইলেই, ইহাদের এই কয়েকটি বোল আয়ত্ত হইয়া উঠে। ইহাই ইহাদের বর্ণপরিচয়। গাছে বাঁধা থাকা অবস্থায় দুই বেলাই ১০।১৫ জন লোক নাচিয়া গাহিয়া, কেহ বাঁশ থেতো করিয়া, কেহ বা গাছের ডাল দিয়া উহাদের সর্ব্বাঙ্গে ঘোড়ার খড়রা মারার মত দূর হইতে ঘসিতে থাকে। ইহাকে সুড়সুড়ি ভাঙ্গান বলে। এই কার্য্যটিতে একটু সময় লাগে। ৫।৭ দিনে হাতী একটু সায়েস্তা হইয়া আসিলেও সুড়সুড়ি চট্‌করিয়া ভাঙ্গিতে চায় না, মাসখানেক সময়ের দরকার হয়।

এইরূপে কিছুদিন প্রাথমিক শিক্ষা অভ্যাস করাইয়া, হাতীকে বসান শিক্ষা করাইতে হয়। যে দিন প্রথম বসাইতে হইবে, তাহার দুই একদিন পূর্ব্ব হইতেই স্নান না করাইয়া খুব গরম রাখিতে হয়। বসাইবার দিন দুই প্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রে কোন জলাশয়ে নিয়া, চোখা কোন জিনিস দিয়া উহার পিঠের বাঁ দিকে খোঁচাইতে খোঁচাইতে ঘা করে এবং ক্রমাগত 'বইট বইট' বলিতে থাকে। ইহাতে ধপ্ করিয়া হাটু জলেই বসিয়া পড়ে। ২।৩ দিন জলে নিয়া এইরূপ অভ্যাস করাইবার পর শুক্না জায়গায় বসাইতে হয়। ক্রমাগত খোঁচা খাইয়া পিঠে একটা আধ্‌লির মত ঘা হয়। তখন উহাতে আঙ্গুল ঠেকাইয়া 'বইট বইট' করিলেই বসিয়া পড়ে। এইরূপে দ্বিতীয় ভাগ শিক্ষা হইয়া যায়।

হাতীর মেজাজ অনুসারে এইরূপে ২০।২৫ দিনে সমস্তগুলি 'বোল' আয়ত্ত হইয়া যায়। বোলগুলি খুব ভালরূপ অভ্যস্ত ও মাহুতের কতকটা বশীভূত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিলে, তখন দুইটী হাতীর পরিবর্ত্তে কেবল একটী হাতীর সঙ্গে বাঁধিয়া এরূপ অভ্যাস করাইতে হয়। এই অবস্থাকে (Stage) 'একছরা' বলে। একছরা অবস্থায় আরও ১০।১৫ দিন অভ্যাস করাইয়া পরে পাশের হাতী একেবারে খুলিয়া দিয়া কিছুদিন পুরান হাতীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইতে হয়। শুঁড় বা পা দিয়া মাহুতকে উঠান নামান কার্য্যগুলি একটু পুরান হইলে শিক্ষা দিতে হয়। নর হাতীকে দাঁত দিয়া তোলান শিখাইতে হয়।

হাতীকে সাজে উঠাইয়া স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া পর্য্যন্ত গড়ে মাস দেড়েক সময়ের আবশ্যক হয়। তবে কোন দুষ্ট প্রকৃতির হাতী আর একটু বেশী সময় নেয়। কোন্ হাতী যে কত সহজে পোষ মানিবে তাহা পূর্ব্বে বুঝা যায় না। কোটে যে হাতীকে খুব শান্ত শিষ্ট দেখা গিয়াছে, সাজে উঠাইলে হয়ত সে অত্যন্ত বদমাইসী করে। আবার কোন কোনটা ঠিক ইহার বিপরীত। আমার একটী নূতন ধৃত

গুণ্ডা হাতী কোটে পড়িয়া দিবারাত্র বদমায়েসী করিত এবং কোট ভাঙ্গিয়া পলাইবার সুযোগ খুঁজিত, কিন্তু উহাকে সাজে উঠানমাত্র অতি সহজে সুশীল-সুবোধ বালকের মত ১০।১৫ দিনেই পোষ মানিয়াছিল।

নূতন হাতী সায়েস্তা হইয়া গেলে, কিছুদিন খুব সাবধানে রাখিতে হয়। এইজন্যই চলিত কথায় ইহাকে 'জল সহা' বলে। তিন বর্ষা না গেলে নূতন হাতীর ভরসা করা যায় না। বন হইতে ধরিয়া আনিয়া পূর্ণ দুইটী বৎসর পালিতাবস্থায় রাখিতে পারিলে, হাতীকে একরূপ নির্ভয় করা যায়।

সাঁড মারা।

বাঙ্গালা ও আসামের বড়লোকদিগের মধ্যে বড় বড় নর গুণ্ডা-হস্তী পালন করিবার রেওয়াজ (চলন) খুব কম, কারণ বোধ হয় ইহারা মস্ত (মত্ত) হইলে, অনেক সময়, দুর্দ্দমনীয় হইয়া বৃক্ষ ও গৃহাদি ভগ্ন করে এবং মানুষ গরু যাহাকে পায় তাহাকেই মারিয়া ফেলে। অধিকন্তু এতদঞ্চলে ইহাদিগকে বশে রাখিবার উপযুক্ত মাহুতেরও অভাব। পক্ষান্তরে অন্য প্রদেশে বিশেষতঃ পশ্চিমাঞ্চলে ও রাজপুতনায় রাজারাজড়াদের মধ্যে বড় বড় নরগুণ্ডা পোষিবার সখ খুব বেশী। জয়পুর প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই ৬০।৭০ কি ততো-ধিক সংখ্যক পোষা হাতী আছে। ইহার মধ্যে মাদী হাতী মাত্র ৫।৭টি বাকী সবই নরগুণ্ডা। ঐ সমস্ত দেশে এই সব হাতীর দাঁত রূপা বা পিতল দিয়া বাঁধাইয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা করে। ইহাদের উপযুক্ত মাহুতও সেইসব স্থানে দুষ্প্রাপ্য নহে।

মস্তি হইয়া এই বিশালকায় হাতীগুলি কখন কখনও চেইন্ ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া সহরের ভিতর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে,

ইহাদিগকে এক শ্রেণীর লোক দিয়া ধরা হয়, তাহাদিগকে সাঁটমার বলে। সোটা বা সাটকে চাবুক বলে, এই চাবুক মারিয়া হাতীকে দমন করে বলিয়া ইহারা ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

কথনও কোন হাতী মস্তি হইয়া ছুটিয়া গিয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়া সহজে ধরা না দিলে, মাহুতেরা জ্যাঠা বা বল্লম দ্বারা ইহাকে সহজে নিরস্ত করিতে পারে না, তখন দুই তিন জন সাঁটমার সর্ব্বাঙ্গে তেল দিয়া পিছল করিয়া, ল্যাঙ্গট কি জাঙ্গিয়া পরিয়া, প্রত্যেকে এক এক গাছা বড় চাবুক হস্তে আগুলিয়া দাড়ায় ও বিকট চিৎকার করিয়া তাল ঠুকিতে থাকে।

হাতী উহাদিগকে দেখিয়া ভয়ঙ্কর বেগে চার্জ্জ করিবামাত্রই সম্মুখের লোকটী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দেয়; তাহাকে তাড়াইয়া যাইবার সময় অপর দুইজন পার্শ্ব কি পশ্চাৎ দিক হইতে অতি দক্ষতা ও ক্ষিপ্রকারীতার সহিত ভয়ানক জোরে পেটে কি পায়ে চাবুকের আঘাৎ করে। তখন সম্মুখের লোকটীকে ত্যাগ করিয়া ইহাদিগকে আক্রমণ করিবা মাত্রই, সম্মুখের লোকটি অতি সুকৌশলে ঘুরিয়া তাহার পশ্চাৎ দিকে চাবুক মারে। তখনই আবার ঐ দুইজনকে ছাড়িয়া সেই লোকটীকে আক্রমণ করিলে অপর দুইজন ঐ ভাবে দুইদিক হইতে চাবুক মারে। ইহারা এইরূপ পটু যে কখন কখনও হাতীর গলার নীচে বা পেটের তলায় প্রবেশ করিয়াও চাবুকের আঘাৎ করে। হাতী যতই চেষ্টা করুক না কেন কিছুতেই ইহাদিগকে ধরিতে পারেনা। সাঁটমারগণ সুদক্ষ পেচিয়াল পালোয়ানের মত নিমেষ মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া, সপাং সপাং করিয়া চাবুকের আঘাতে এক আধ ঘণ্টার মধ্যেই উহাকে এত জব্দ করিয়া ফেলে যে তখন হাতীটি মলমূত্র ত্যাগ ও চিৎকার করিয়া এক প্রকার নড়া চড়া শূন্য হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তখন কোথায় বা যায় তার মস্তি!

এই লোকগুলি অত্যন্ত সাহসী ও সুকৌশলী। সাধারণতঃ

ইহারা ২৫।৩০ টাকা হিসাবে মাসিক বেতন পায়। পশ্চিমের প্রায় প্রত্যেক রাজারাজড়াই ২।৩ জন করিয়া সাঁটমার রাখেন। ইহারা সারা বৎসর বসিয়া থাকিয়া দরকার মত কাজ করে।

অনেক স্থলেই হস্তিপালন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন ইহারা দীর্ঘায়ু হয় না। মহর্ষী পালকপ্য প্রণীত হস্ত্যায়ূর্ব্বেদে হস্তীর লক্ষণালক্ষণ, পালন ও চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে, বারান্তরে পাঠক মহাশয়দিগের নিকট তাহা উপস্থিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

আমাদের শিকারী-জীবনের যাবতীয় ঘটনাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি আর না ঘটাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলি পৃথক পৃথক প্রবন্ধে উপহার দিবার চেষ্টা করিব।